# ফাতাওয়া
# ও
# মাসাইল

# ফাতাওয়া ও মাসাইল

চতুর্থ খণ্ড

লেখক মণ্ডলী
সম্পাদনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ফাতাওয়া ও মাসাইল
(চতুর্থ খণ্ড)

লেখক মণ্ডলী
সম্পাদনা পরিষদ

ই ফা বা গবেষণা ঃ ৩৬
ই ফা বা প্রকাশনা ঃ ১৯৭৩
ই ফা বা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984—06—0550—0

প্রকাশ কাল
রবিউল আউয়াল ১৪২০
আষাঢ় ১৪০৬
জুন ১৯৯৯

গ্রন্থস্বত্ব
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মার্ক কম্পিউটার
ম-২৮, মেরুল-বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ ও বাধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত),
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস,
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১৪০.০০ (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

---

FATWA-O-MASAIL (4th Vol.) Composed by a group of Researchers and Compiled and Edited by Editorial Board and Published by Department of Research, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka 1000. June, 1999

Price : Tk 140.00, U S Dollar : 4

www.pathagar.com

# মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ইসলামের বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সফলতা ও কল্যাণ এ অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই নিহিত। ইসলামী পয়গামের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল পবিত্র কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ্। অতঃপর রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইজ্‌মা ও কিয়াস তথা ইজতিহাদের ধারা। বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ্, ইজ্‌মা ও কিয়াস এ চারটিই হল শরী'আতের মৌল বুনিয়াদ। ইসলামী ফিকহের যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত ফয়সালা ও দলিল এ চতুষ্টয়ের আলোকেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

মুসলমান হিসাবে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় মাসাইল জানা সকলের জন্যই আবশ্যক। তা ছাড়া কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে জীবন যাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু নতুন জিজ্ঞাসাও বর্তমান সমাজে উপস্থাপিত। সাধারণত ফিক্‌হবিদগণ যুগে যুগে এ ধরনের নতুন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে আসছেন। কিন্তু বাংলাভাষায় এ পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

এ প্রেক্ষিতেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও ফকীহ্‌গণের সমন্বয়ে এ প্রকল্প কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানের ফাতাওয়া ও মাসাইল চতুর্থ খণ্ড গ্রন্থটি সেই প্রকল্পের ফসল। আশা করি এটি দেশবাসী মুসলিম জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক গুণীজন, উলামা ও শিক্ষাবিদ তাঁদের মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের সবার প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

আল্লাহ্ আমাদের এ মেহনত কবুল করুন। আমীন!

মওলানা আবদুল আউয়াল<br>
মহাপরিচালক<br>
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সম্পাদকীয়

ফিকহ্ হচ্ছে ইসলামী আইন-কানূন, বিধি-বিধানের সুবিন্যস্ত বিজ্ঞানের পারিভাষিক নাম। মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ইসলামে সুস্পষ্ট আইন-কানূন, বিধি-বিধান রয়েছে। এই আইনের মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ বা হাদীস। এই দুই মূল উৎসের ভিত্তিতে কালপরিক্রমায় উদ্ভাবিত সমস্যাবলীর যে সমাধান ইজ্মা ও কিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে তাও ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হিসাবে স্বীকৃত।

ইলমে ফিকহ্-এর সর্ববাদী সম্মত প্রধান উৎস হচ্ছে চারটি। যথা ১. কুরআন, ২. সুন্নাহ্, ৩. ইজ্মা ও ৪. কিয়াস। মূলত আকাইদ, ইবাদত, মু'আমালাত অর্থাৎ বৈষয়িক লেন-দেন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, মু'আশারাত অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, উকূবাত অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি বিধান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং আদাব ও আখ্লাক ইত্যাদি ইলমে ফিকহ্-এর অন্তর্ভূক্ত।

হিজরী প্রথম শতকেই ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। যাঁদের মধ্যে প্রধানত ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম শাফিঈ (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সারা জীবনব্যাপী সাধনা করে মুসলিম জীবনের সকল দিকের জন্য ইসলামী শরী'আতের সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ আইন-কানূন ও বিধি-বিধান পেশ করেন। তাঁদের এই অবদান অনবদ্য ও অবিস্মরণীয়। এবং তাঁদের মাযহাব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও অনুসরণীয় হয়ে আসছে।

কালের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইসলামী ফিকহের উপর আরবী, ফার্সী এবং উর্দূ ভাষায় প্রণীত ও সঙ্কলিত হয়েছে বহু নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ শাস্ত্রের উপর আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় এ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য কোন কিতাব প্রণীত ও সংকলিত হয়নি। এ অভাব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' শিরোনামে বাংলাভাষায় পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ফিক্হ্ গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মোতাবেক দেশের বিশিষ্ট ফিক্হবিদ মুহাক্কিক আলিমের উপর এর পাণ্ডুলিপি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সে সকল পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পন করা হয় মুহাক্কিক ও প্রখ্যাত উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা বোর্ডের উপর।

www.pathagar.com

'ফাতাওয়া ও মাসাইল' এর চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদনা সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমরা শুক্‌রিয়া আদায় করছি। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কিতাবের সবগুলো খণ্ড সংকলিত ও প্রকাশিত হলে ইনশা আল্লাহ্‌ 'ফাতওয়া ও মাসাইল' হবে বাংলাভাষার যুগোপযোগী একখানা পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ফিকহের গ্রন্থ্‌। এবং তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটি অবিস্মরণীয় অবদান হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এই মহান খিদমতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এই কিতাবে ঈমান ও আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিরোধী মতবাদসমূহ্‌ দলিল ও যুক্তির ভিত্তিতে খণ্ডন করে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সত্যতা ও সঠিকতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাল পরিক্রমায় আধুনিক মতবাদ, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাবে যে সকল জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে তার সময়োপযোগী সমাধান পেশ করা হয়েছে। কোন কোন নব উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত দেশের প্রখ্যাত আলিমদের নিকট পাঠিয়ে সে সম্পর্কে তাঁদের অভিমত নেওয়া হয়েছে।

আমরা এই কিতাবের বিষয়গুলি পূর্বসূরী ফকীহ্‌গণের অনুসরণে সুবিন্যস্ত করেছি। যেহেতু বাংলাদেশের প্রায় সব মুসলমানই হানাফী মাযহাবের অনুসারী; তাই মাস'আলা সমূহের সমাধান হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পেশ করা হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও অন্যান্য ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরী'আতের পরিভাষা বহাল রাখা হয়েছে। তবে পরিচিত পরিভাষার ক্ষেত্রে বাংলা তরজমা ও বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই কিতাব সংকলনে আমাদের প্রধান অনুকরণীয় গ্রন্থ্‌ ছিল ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, শামী, হিদায়া, বাদায়ে, বাহ্‌রুর রাইক প্রভৃতি ফিকহের বিশ্ববিখ্যাত কিতাবসমূহ। এছাড়া অন্যান্য যে সকল নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হ ও মাসাইল গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মাসাইলের শেষে সে সবের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য ও সহজ সরল করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেহেতু এটি এ ধরনের প্রথম কাজ তাই এতে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল পরিদৃষ্ট হলে তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের ফরিয়াদ, তিনি এই গ্রন্থ্‌কে কবুল এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে - খাইর দান করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক, চেয়ারম্যান
২. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস্ সালাম, সদস্য
৩. হাফেয মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন, সদস্য
৪. মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন খান, সদস্য
৫. হাফেয মাওলানা রফিক আহ্মাদ, সদস্য
৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, সদস্য
৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক, সদস্য

লেখকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
২. মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের
৩. মাওলানা জসিম উদ্দীন খান পাঠান
৪. মাওলানা যুবায়ের আহ্মদ আশরাফ
৫. মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন
৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবূ মূসা
৭. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
৮. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৯. মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক
১০. মাওলানা মুফ্তী এনামুল হক
১১. মাওলানা মোহাম্মদ আলী
১২. মাওলানা মুহাম্মদ মামূনুর রশীদ
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ মাহ্ফুজুর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

মানব জীবনে ফাতাওয়া ও মাসাইলের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মুসলমান হিসেবে জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান মুতাবিক সম্পাদন করা আবশ্যক। বস্তুত ইসলামী জীবন যাত্রার সর্বোচ্চ সফলতা এখানেই। জীবনের কাজগুলো শরী'আতের বিধানের আলোকে বিশুদ্ধরূপে সম্পাদন করতে চাইলে শরী'আতের ফাতাওয়া ও মাসাইল জানা থাকা একান্ত জরুরী।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে তিনি নিজেই বিভিন্ন বিষয়ের বিধান বর্ণনা করতেন। বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে ফাতাওয়া তথা সমাধান পেশ করতেন। কালক্রমে সাহাবা ও তাবিয়ীনের যুগে শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদিত হত। অতঃপর আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষত ইমাম আযম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (রহ.), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ.), ইমাম শাফিঈ (রহ.) ও ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধানকে সুপরিকল্পিতভাবে সুবিন্যস্ত করেন। তাঁদের এই অনন্য সাধারণ ইজতিহাদ কর্ম মুসলিম উম্মাহ্র নিকট ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং যে কোন মুসলমান তাঁর জীবনের যে কোন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার শরী'আত সম্মত সদুত্তর পাওয়ার সুযোগ পায়।

শরী'আতের এ বিধি-বিধান মাসাইলের আকারে ফিকহ্ গ্রন্থে এবং ফাতাওয়া আকারে ফাতাওয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সে সব গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই আরবী ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে মাসাইল সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও ফাতাওয়া শিরোনামে সুবৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ মানের কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশ হয়নি। অথচ মুসলমানদের জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে ফাতাওয়া গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অসামান্য।

এ প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং দেশ বরেণ্য আলিমগণের সমন্বয়ে একটি 'সম্পাদনা পরিষদ' গঠন করে। পরিষদ এ কাজের পদ্ধতি ও রূপরেখা তৈরী করে তার আলোকে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের লক্ষ্য মোতাবেক ইতিপূর্বে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হল। আল্লাহ্ রহমতে বর্তমানে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

ফাতাওয়া ও মাসাইল প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে একত্রে প্রকাশিত প্রথম হয়েছে। এতে ছিল ইলমে ফিকহ্-এর পরিচিতি, ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎস, উৎপত্তি ও বিকাশ, রাসমুল মুফ্তী এবং মাসায়ালা ও ফাতাওয়ায় ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ, বিপদগামী ফিরকাসমূহ, মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইমাম মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরাম, উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুফ্তীগণের

www.pathagar.com

পরিচিতি এবং অবদান, মুজতাহিগণের শ্রেণী বিন্যাস, হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন স্তর, শ্রেণীবিন্যাস ও পরিচিতি, ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের মতপার্থক্য, ফিকহ্ শাস্ত্রের গ্রহনযোগ্য ও অগ্রহনযোগ্য গ্রন্থসমূহ, ফাতাওয়ার সংজ্ঞা ও ক্রমবিকাশ, তাক্লীদ ও তাক্লীদে শাখ্সী।

দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল—ঈমান পরিচিতি, নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান, ফিরিশ্তাগণের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাক্দীরের প্রতি ঈমান, কিয়ামত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান, মৃত্যুর পর ঘটিতব্য বিষয়ের প্রতি ঈমান, ঈমানের শাখা-প্রশাখা, ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস, শিরক্ ও কুফর, বিদ্'আত ও কুসংস্কার ইত্যাদি।

ফাতাওয়া ও মাসাইল তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে ঃ পবিত্রতার বিবরণ, মিস্ওয়াক, ওযূ ও গোসলের বিবরণ, জানাবাতের বিবরণ, তায়াম্মুম, মোজার উপর মাসেহ্, হায়িয, ইস্তেহাযা ও নিফাস, নাজাসাতের প্রকারভেদ, নামাজের বিবরণ, নামাজের সময়, আযান ও ইকামত, নামাজের শর্তাবলী, নামাজ আদায়ের বিবরণ, জামা'আতে নামাজ আদায়, ইমামতের বিবরণ, মসজিদের বিবরণ, জুমু'আর নামাজ, মুসাফিরের নামাজ, যানবাহনে নামাজ, সালাতুল খাওফ, অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ, কাযা নামাজ, মৃত্যু সম্পর্কীত মাসাইল, জানাযার নামাজ, মাইয়্যেতের দাফন, শহীদের বিবরণ, ওয়াজিব নামাজের বিবরণ, সুন্নাত ও মুস্তাহাব নামাজ সমূহ।

যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী ফিক্হের অনুসারী। সেহেতু এ গ্রন্থে হানাফী ফিক্হের অভিমতকেই প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ গ্রন্থের কোন রায় অন্য ফিকহের অনুসারীদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষ প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ ধরনের মাসাইলের ক্ষেত্রে পাঠকগণের প্রতি নিজ ফিকহের নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে সকল উলামা ও ফুকাহা মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের শুক্রিয়া। তাঁদের এ মহত কাজের স্বীকৃতি হিসাবে লেখক মণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণের নাম পত্রস্থ করা হল। প্রকল্প মেয়াদে গ্রন্থটির প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজ ত্বরান্বিত করতে গিয়ে কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। অনুগ্রহপূর্বক জানালে তা পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জন ও সংশোধন করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে আরয যে, তিনি যেন আমাদের এ শ্রমকে কবুল এবং এর উসীলায় আমাদের সকলকে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

# অধ্যায় ঃ রোযা

## প্রথম পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| রোযা | ১-২৪ |
| রোযার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি | ৩ |
| রোযা ও রামাযান মাস সম্পর্কীয় পরিভাষা | ৮ |
| রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য | ৯ |
| রোযার ফযীলত ও উপকারিতা | ১১ |
| রোযার সময় | ১৩ |
| ভৌগলিক ও মৌসুমগত কারণে দিন ছোটবড় হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান | ১৩ |
| বিমানে ভ্রমণ কালে দিন ছোটবড় হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান | ১৪ |
| রোযা ফরয হওয়ার শর্ত | ১৪ |
| রোযা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত | ১৪ |
| রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্ত | ১৪ |
| রোযার নিয়্যত সম্পর্কীয় মাসাইল | ১৫ |
| রোযার ফরয | ১৬ |
| রোযার সুন্নাত ও আদাব | ১৬ |
| রোযার প্রকারভেদ | ১৬ |
| ফরয রোযা | ১৬ |
| ওয়াজিব রোযা | ১৭ |
| মানত রোযা | ১৭ |
| নফল রোযা | ১৯ |
| আশুরার রোযা | ২০ |
| শা'বানের রোযা | ২১ |
| আরাফা দিনের রোযা | ২২ |
| আইয়্যামে বীযের রোযা | ২২ |
| সাওমে দাঊদী | ২২ |
| সাওমে বিসাল | ২৩ |
| রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিনসমূহ | ২৩ |
| মাকরূহ্ রোযা | ২৪ |


www.pathagar.com

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ


রোযা ভঙ্গের কারণ এবং কাযা ও কাফ্ফারা ২৫-৪৩

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় ২৫

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় ২৮

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না ২৯

রোযা অবস্থায় যে সব কাজ মাকরূহ্ ৩০

রোযা অবস্থায় যে সব কাজ মাকরূহ্ নয় ৩১

যে সব ওযরে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয ৩১

যে সব কারণে রোযা না রাখা জায়িয ৩২

'ইয়াওমুশ্ শক্' -এ রোযা রাখার হুকুম ৩৪

কাযা রোযা ৩৫

রোযার কাফ্ফারা সম্পর্কীত মাসাইল ৩৬

ফিদ্য়ার মাসাইল ৩৭

মুসাফিরের রোযা ৩৯

রুগ্ন ব্যক্তির রোযা ৩৯

মাযূর ব্যক্তির রোযা ৪০

অতি বৃদ্ধের রোযা ৪০

গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারিনী মহিলার রোযা ৪১

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ও ড্রুস গ্রহণ ৪১

রোযা অবস্থায় মাজন বা পেষ্ট ব্যবহার করা ৪১

রোযা অবস্থায় রক্ত দান অথবা রক্ত গ্রহণ ৪১

রোযা অবস্থায় অপারেশন ৪২

রোযা অবস্থায় ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার ৪২

রোযা অবস্থায় দাঁত সংযোজন এবং ঔষধ ব্যবহার ৪৩

কতিপয় জরুরী মাসাইল ৪৩


## তৃতীয় পরিচ্ছেদ


চাঁদ দেখা ৪৪-৫৫

চাঁদ দেখার গুরুত্ব ৪৪

রোযা ও ঈদের চাঁদ দেখা ৪৪

চাঁদ দেখার উপর রোযা ও ঈদের নির্ভরশীলতা ৪৫

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া ৪৫

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় রামাযানের চাঁদ দেখার বিধান ৪৬

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকা অবস্থায় রামাযানের চাঁদ দেখার বিধান ৪৭

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান ৪৮


www.pathagar.com

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান ৪৯
ঈদুল আযহা ও অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বিধান ৪৯
কারো চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের প্রত্যয়নে সাক্ষ্য প্রদান ৫০
চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হলে ৫১
চাঁদ দেখার খবর ঘোষণা এবং এ জন্য আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার ৫২
চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান ৫২
চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান ৫২
আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক চাঁদের ফয়সালা প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান ৫২
ইখ্‌তিলাফে মাতালি' -এর হুকুম ৫৪
সারা বিশ্বে একই দিন রোযা রাখা ও ঈদ উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে ৫৪
অমুসলিম দেশ থেকে প্রাপ্ত চাঁদ দেখার খবর ৫৫
জ্যোতির্বিদ ও আবহাওয়াবিদদের হিসাবে চন্দ্রোদয় নির্ণয় ৫৫
বিভিন্ন দেশে সফর করার ফলে রোযা ত্রিশ দিনের অধিক বা উনত্রিশ দিনের
কম হওয়া প্রসঙ্গে ৫৫
যেখানে চাঁদ কখনো দেখা যায় না সেখানে রোযার হুকুম ৫৫

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ
## সাহ্‌রী ও ইফ্‌তার ৫৬-৬১

সাহ্‌রীর ফযীলত ৫৬
সাহ্‌রীর সময় ও আদাব ৫৬
সাহ্‌রী সম্পর্কিত মাসাইল ৫৭
ইফ্‌তারের ফযীলত ৫৮
ইফ্‌তারের সময় ৫৯
ইফ্‌তারের আদাব ৫৯
ইফ্‌তারের দু'আ ৬০
ইফ্‌তার করানোর ফযীলত ৬০
ইফ্‌তার সম্পর্কিত মাসাইল ৬০
ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইফ্‌তার করা ৬১
বিলম্বে ইফ্‌তার করা ৬১

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ
## ই'তিকাফ ৬২-৭৪

ই'তিকাফের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও স্থান ৬২
ই'তিকাফের ফযীলত ও উপকারিতা ৬৩
রামাযানে ই'তিকাফের ফযীলত ও গুরুত্ব ৬৩

www.pathagar.com

ই'তিকাফের প্রকারভেদ ও হুকুম ৬৪
ই'তিকাফের শর্তাবলী ৬৫
ই'তিকাফের নিয়ম ৬৫
ই'তিকাফের আদাবসমূহ ৬৭
যে যে কারণে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয় ৬৭
ই'তিকাফকারীর জন্য জায়িয কাজসমূহ ৬৮
ই'তিকাফকারীর জন্য না-জায়িয কাজসমূহ ৬৮
ই'তিকাফকারীর জন্য জুমু'আর সালাতে অংশগ্রহণ ৬৯
ই'তিকাফকারীর জন্য জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ ৬৯
যে সব কারণে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারেন ৬৯
ই'তিকাফ ফাসিদ হলে তার হুকুম ৭০
লাইলাতুল কাদ্‌রের ফযীলত ও তাৎপর্য ৭১
লাইলাতুল কাদ্‌রের আমল ৭৩

# অধ্যায় ঃ যাকাত

## প্রথম পরিচ্ছেদ

যাকাত ৭৫-৮৩
যাকাতের সংজ্ঞা ও পরিভাষা ৭৭
যাকাত ফরয হওয়ার দলিল ৭৭
যাকাত ফরয হওয়ার হিক্‌মত ও উপকারিতা ৭৮
যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ ৭৯
যাকাত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ৮০
যে সব সম্পদে যাকাত ফরয হয় না ৮২
অগ্রিম যাকাত দেওয়া ৮২
যাকাত আদায় করার নিয়ম ৮৩

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাতের নিসাব ৮৪-৯০
যাকাতের নিসাব ৮৪
স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত ৮৪
স্বর্ণ-রৌপ্যের সাথে অন্য ধাতব পদার্থ মিশ্রিত হলে তার হুকুম ৮৫
অলংকারের যাকাত ৮৫
আসবাবপত্রের যাকাত ৮৫

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| খনিজ ও ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের যাকাত | ৮৬ |
| ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত | ৮৬ |
| পশুর যাকাত | ৮৭ |
| গরু-মহিষের যাকাত | ৮৭ |
| উটের যাকাত | ৮৮ |
| ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাত | ৮৮ |
| ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার যাকাত | ৮৯ |
| মালের মূল্য দ্বারা যাকাত প্রদান | ৮৯ |
| বিভিন্ন দ্রব্য একত্রে হিসাব করে যাকাতের নিসাব নির্ণয় | ৮৯ |
| নিসাবের উর্ধ্বে কিছু পরিমাণ মাল থাকলে তার যাকাতের বিধান | ৮৯ |
| বছরের মাঝখানে বর্ধিত মালের যাকাত | ৯০ |


## তৃতীয় পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| **যৌথ মালিকানা সম্পত্তির যাকাত** | **৯১-৯৭** |
| প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং সরকারী শিল্প, ব্যবসা কোম্পানীর মালের যাকাত | ৯১ |
| শেয়ার -এর যাকাত | ৯১ |
| বণ্ডের যাকাত | ৯২ |
| পোলট্রি ফার্ম ও মৎস্য প্রকল্পের যাকাত | ৯২ |
| ভাড়া দেওয়া বাড়ী ও আসবাব পত্রের যাকাত | ৯৩ |
| ঋণের উপর যাকাত | ৯৩ |
| প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যাকাত | ৯৩ |
| ব্যাংকে গচ্ছিত, রক্ষিত ও জমাকৃত মালের যাকাত | ৯৪ |
| ব্যাংক বা সরকারী তহবিল থেকে প্রদত্ত ঋণের হুকুম | ৯৪ |
| ব্যাংক ও ইস্যুরেন্স ট্রাষ্টের যাকাত | ৯৫ |
| মেশিনারী সম্পদের যাকাত | ৯৫ |
| যাকাত এবং ট্যাক্স | ৯৬ |
| হজ্জ, বিবাহ-শাদী, লেখাপড়া ইত্যাদি কাজের জন্য জমাকৃত অর্থের যাকাত | ৯৬ |
| বেনামী সম্পদের যাকাত | ৯৬ |
| সিকিউরিটি মানি বা যামানতের টাকার উপর যাকাত | ৯৬ |
| হারাম মালের যাকাত | ৯৬ |
| নোট-চেক ইত্যাদি দ্বারা যাকাত প্রদান | ৯৭ |
| মানিঅর্ডার যোগে যাকাত প্রেরণ | ৯৭ |


www.pathagar.com

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| **যাকাত প্রদানের মাসরাফ (খাত)** | **৯৮-১০৫** |
| যাকাতের খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা | ৯৮ |
| যাকাত প্রদানের খাত সীমিত হওয়ার দলীল | ৯৯ |
| মাসরাফের প্রত্যেক প্রকারের লোককে যাকাত প্রদান করা ফরয কি না? | ১০০ |
| মাসরাফের বাইরে যাকাত প্রদান করা | ১০০ |
| যারা যাকাত পাওয়ার অধিক হক্‌দার | ১০০ |
| এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ যাকাত দেওয়া জায়িয ? | ১০১ |
| জনকল্যাণমূলক কোন কাজে যাকাতের অর্থব্যয় | ১০১ |
| যাকাত আদায়কারীকে পারিশ্রমিক প্রদানের বিধান | ১০১ |
| কমিশনের ভিত্তিতে যাকাত উসূল করা | ১০২ |
| যাকাত আদায় ও উহার নিয়মাবলী | ১০২ |
| উসূলকৃত যাকাতের বন্টননীতি | ১০২ |
| এক এলাকার যাকাতের টাকা অন্য এলাকায় বন্টন | ১০৩ |
| অমুসলিমকে যাকাত প্রদান | ১০৩ |
| যাকাত না দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন | ১০৩ |
| যাকাতের ফরযিয়াত অস্বীকার করার শাস্তি | ১০৩ |
| সরকারকে প্রদত্ত টেক্স যাকাতে গণ্য হবে কি ? | ১০৪ |
| যাকাত আদায় না করে মারা গেলে | ১০৪ |
| সংগৃহীত যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং কাউকে ঋণ দেওয়া | ১০৪ |
| যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়িয নয় | ১০৪ |


## পঞ্চম পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| **উশ্‌র ও খারাজ** | **১০৬-১১০** |
| উশ্‌র কি ? | ১০৬ |
| উশরী যমীনের পরিচিতি | ১০৬ |
| উশর ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী | ১০৭ |
| খারাজ | ১০৭ |
| খারাজি পানি | ১০৮ |
| বাংলাদেশের জমির হুকুম | ১০৮ |
| ফল ও ফসলের যাকাত | ১০৮ |
| মধুর যাকাত | ১০৯ |
| শাক-সব্জি ইত্যাদির যাকাত | ১০৯ |
| ইজারা দেওয়া জমির ফসলের যাকাত | ১০৯ |
| খারাজি জমির ফসলের যাকাত | ১০৯ |
| ওয়াক্‌ফকৃত ভূমির ফসলের যাকাত | ১১০ |


www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাদাকাতুল ফিত্‌র ১১১-১১৪

সাদাকাতুল ফিত্‌র -এর পরিচিতি ১১১
যাদের উপর সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব ১১১
যাদের ফিত্‌রা আদায় করা ওয়ালীর উপর ওয়াজিব ১১২
সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সময় ১১৩
সাদাকাতুল ফিত্‌র ঈদের নামাযের আগে বা পরে দেওয়ার হুকুম ১১৩
সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার নিসাব ও পরিমাণ ১১৩
সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায়ের মুস্তাহাব তরীকা ১১৪
অমুসলিমকে সাদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান ১১৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নফল সাদাকাত ১১৫-১২২

নফল সাদাকাতের পরিচিতি ১১৫
রামাযান মাসে দান খয়রাতের বিশেষ ফযীলত ১১৬
সমস্ত মাল সাদাকা করা ১১৬
দান করার উত্তম পদ্ধতি ১১৭
যে সব কারণে দানের ফযীলত নষ্ট হয়ে যায় ১১৯
সৎলোকদেরকে দান করা ১২১
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দান সাদাকা ১২২
হারাম মাল থেকে দান করা ১২২

অধ্যায় ঃ হজ্জ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্জ ১২৩-১৫২

হজ্জের সংজ্ঞা ১২৫
হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ১২৫
হজ্জ কখন ফরয হয়েছিল? ১২৭
হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল ১২৮
হজ্জের ফযীলত ১২৯
হজ্জের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ১৩০
হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ১৩২
হজ্জ সম্পর্কিত পরিভাষা ১৩৩
হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী ১৪০


www.pathagar.com

হজ্জ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী ১৪৩
হজ্জ আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ ১৪৬
হজ্জ ফরয হওয়ার পর গরীব হয়ে গেলে ১৪৭
হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায়ে বিলম্ব করা ১৪৭
হজ্জের ফরয ১৪৮
হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ১৪৮
হজ্জের সুন্নাত ১৪৯
হজ্জের আদাব ও মুস্তাহাব ১৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হজ্জের প্রকারভেদ ১৫৩-১৭২
হজ্জ তিন প্রকার ১৫৩
হজ্জে ইফরাদ ১৫৩
এক নযরে হজ্জে ইফরাদ ১৬৩
হজ্জে তামাত্তু ১৬৩
হজ্জে তামাত্তুর শর্তসমূহ ১৬৪
হজ্জে তামাত্তু আদায়কারীর প্রকারভেদ ১৬৫
হজ্জে তামাত্তুর মাসাইল ১৬৫
এক নযরে হজ্জে তামাত্তু (যদি দমে-তামাত্তু সাথে না থাকে) ১৬৬
হজ্জে কিরান ১৬৭
হজ্জে কিরানের শর্তসমূহ ১৬৮
হজ্জে কিরানের মাসাইল . ১৬৯
দমে-কিরান আদায় করতে অক্ষম হলে ১৭০
এক নযরে হজ্জে কিরান ১৭১
দু'আ কবূলের স্থানসমূহ ১৭২
মক্কা শরীফের পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত ১৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মীকাত ও ইহ্রাম ১৭৪-১৯০
হিল্লী ও হরমী লোকদের হজ্জ ও উমরার মীকাত ১৭৪
আফাকী লোকদের মীকাত ১৭৪
বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম ১৭৫
হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাতভুক্ত
এলাকা অথবা হরমভুক্ত কোন এলাকায় প্রবেশ ১৭৭
ইহ্রাম ১৭৭

| | |
|---|---|
| ইহ্‌রামের পূর্বে করণীয় কাজ | ১৭৭ |
| ইহ্‌রামের প্রকারভেদ | ১৭৭ |
| ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম ও মাসনূন তরীকা | ১৭৮ |
| ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য উত্তম স্থান | ১৭৯ |
| বিমান ও সামুদ্রিক জাহাজে ইহ্‌রাম বাঁধা | ১৭৯ |
| ইহ্‌রাম সহীহ্ হওয়ার শর্ত | ১৮০ |
| ইহ্‌রামের সুন্নাত ও মুস্তাহাব | ১৮০ |
| ইহ্‌রামের হুকুম | ১৮০ |
| অসুস্থ ব্যক্তির ইহ্‌রাম | ১৮১ |
| অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের ইহ্‌রাম | ১৮২ |
| মহিলাদের ইহ্‌রাম | ১৮২ |
| নপংশুকদের ইহ্‌রাম | ১৮৩ |
| পুরুষ ও মহিলার ইহ্‌রামে পার্থক্য | ১৮৩ |
| ইহ্‌রাম অবস্থায় যে সকল কাজ নিষেধ | ১৮৩ |
| ইহ্‌রাম অবস্থায় যে সকল কাজ মাকরূহ | ১৮৪ |
| ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সকল কাজ জায়িয | ১৮৫ |
| ইহ্‌রামের অবস্থায় বিবাহ্ করা ও বিবাহ্ করান | ১৮৫ |
| ইহ্‌রামের মাসাইল | ১৮৬ |
| তালবিয়ার মাসাইল | ১৮৬ |
| বিবিধ মাসাইল | ১৮৭ |
| মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রবেশের আদাব ও দু'আ | ১৮৭ |
| মসজিদুল হারামে প্রবেশের আদাব ও দু'আ | ১৮৮ |
| হরমের সীমানা এবং সেখানে নিষিদ্ধ কাজসমূহ | ১৮৯ |
| মসজিদুল হারামে নামায আদায়ের ফযীলত | ১৯০ |


## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## তাওয়াফ ও সাঈ ১৯১-২০৭


| | |
|---|---|
| তাওয়াফের নিয়ম, নিয়্যত ও দু'আ | ১৯১ |
| তাওয়াফের রুক্ন | ১৯২ |
| তাওয়াফ সহীহ্ হওয়ার শর্ত | ১৯২ |
| তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ | ১৯৩ |
| তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ | ১৯৩ |
| তাওয়াফের মুস্তাহাবসমূহ | ১৯৩ |
| তাওয়াফের মুবাহ্ কাজসমূহ | ১৯৪ |
| তাওয়াফের হারাম বিষয়সমূহ | ১৯৪ |


www.pathagar.com

তাওয়াফের মাকরূহ্ বিষয়সমূহ ১৯৫
তাওয়াফের প্রকারভেদ ১৯৫
রমল ও ইযতিবা ১৯৬
হাজরে আসওয়াদের বিবরণ ও তার ইসতিলাম (চুম্বন) ১৯৭
মুলতাযামের ইসতিলাম ও দু'আ ১৯৮
রুকনে ইরাকী, রুকনে শামী, রুকনে ইয়ামানী, হাতীমে কা'বা ও মীযাবে
রহমতের দু'আ ১৯৯
যমযমের কূপ ও তার পানি পানের দু'আ ২০০
তাওয়াফ কুদূমের মাসাইল ২০১
তাওয়াফের মাসাইল ও দু'আ ২০২
সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করার হুকুম ও নিয়ম ২০৩
সাঈ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী ২০৪
সাঈর ওয়াজিবসমূহ ২০৫
সাঈর সুন্নাতসমূহ ২০৫
সাঈর মুস্তাহাবসমূহ ২০৫
সাঈর মুবাহ্ কাজসমূহ ২০৬
সাঈর মাকরূহ্ সমূহ ২০৬
সাঈর মাসাইল ২০৭
মাথা মুণ্ডান ও চুল ছাটার মাসাইল ২০৭

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মক্কা থেকে মিনা, মিনা থেকে আরাফা, আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা হওয়ার সময় ও করণীয় ২০৮-২২০

মক্কা থেকে মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় ও করণীয় ২০৮
মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানার ও করণীয় ২০৮
আরাফার ময়দান ও আরাফা দিবসের ফযীলত ২০৯
আরাফার ময়দানে উকূফের (অবস্থানের) হুকুম ও সময় ২১০
উকূফ আরাফার শর্ত ২১০
উকূফের সুন্নাতসমূহ ২১১
উকূফের মুস্তাহাবসমূহ ২১১
উকূফের মাকরূহ কাজসমূহ ২১২
উকূফে আরাফার বিভিন্ন মাসাইল ২১২
আরাফার ময়দানে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করা ২১৩
যুহর ও আসর একত্রে আদায় করার শর্ত ২১৪

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| উকূফে আরাফার মাসনূন তরীকা | ২১৪ |
| আরাফা থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা | ২১৬ |
| মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় | ২১৭ |
| মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করার শর্তসমূহ | ২১৭ |
| মুযদালিফায় রাত্রি যাপন এবং সেখানে করণীয় কাজ | ২১৮ |
| উকূফে মুযদালিফার হুকুম ও সময় | ২১৮ |
| মাশ'আরুল হারামে যিক্‌র ও দু'আ | ২১৯ |
| কংকর সংগ্রহ | ২২০ |

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

| | |
|---|---|
| মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা | ২২১-২৩৩ |
| ১০ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত করণীয় কাজসমূহ | ২২১ |
| জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ | ২২১ |
| কুরবানী ও দম | ২২২ |
| হাদীর মাসাইল | ২২৩ |
| হলক্ বা কসর | ২২৫ |
| তাওয়াফে যিয়ারত | ২২৭ |
| তাওয়াফে যিয়ারত সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ | ২২৮ |
| তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিবসমুহ | ২২৮ |
| ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জে রমী করার মাসাইল | ২২৯ |
| মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন | ২৩১ |
| তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ | ২৩১ |

সপ্তম পরিচ্ছেদ

| | |
|---|---|
| উমরা | ২৩৪-২৩৯ |
| উমরার পরিচিতি | ২৩৪ |
| উমরা ও হজ্জের মধ্যে পার্থক্য | ২৩৫ |
| উমরার ফরয | ২৩৫ |
| উমরার ওয়াজিব | ২৩৬ |
| উমরার সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ | ২৩৬ |
| উমরার বিভিন্ন মাসাইল | ২৩৬ |
| উমরা আদায় করার নিয়ম | ২৩৭ |
| উমরা পালনের সময় | ২৩৮ |
| এক নযরে উমরা | ২৩৯ |


www.pathagar.com

## অষ্টম পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| **বদলী হজ্জ** | ২৪০-২৪৮ |
| বদলী হজ্জের পরিচিতি | ২৪০ |
| বদলী হজ্জের শর্ত | ২৪১ |
| বদলী হজ্জ আদায়ের উত্তম ব্যক্তি | ২৪৪ |
| বদলী হজ্জের ব্যয় নির্বাহ | ২৪৪ |
| বদলী হজ্জের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহন করা | ২৪৫ |
| মানত হজ্জ | ২৪৫ |
| হজ্জের অসিয়্যত | ২৪৬ |


## নবম পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| **জিনায়াত (ইহ্‌রাম ও হরমে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ও তার ক্ষতিপূরণ)** | ২৪৯-২৬৫ |
| ইহ্‌রামের পর নিষিদ্ধ কাজ আটটি | ২৪৯ |
| হরমে নিষিদ্ধ কাজ দু'টি | ২৪৯ |
| দম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ | ২৫০ |
| সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল ব্যবহার করা | ২৫০ |
| সেলাই যুক্ত কাপড় ব্যবহার করা | ২৫৩ |
| চুল বা পশম মুণ্ডন করা বা ছাঁটা | ২৫৪ |
| নখ কর্তন করা | ২৫৫ |
| স্ত্রী সহবাস করা | ২৫৬ |
| হজ্জের ওয়াজিবসমূহ থেকে কোন্ ওয়াজিব তরক করা | ২৫৭ |
| স্থলজ প্রাণী শিকার করা এবং একে কষ্ট দেওয়া | ২৫৯ |
| শিকারের ক্ষতিপূরণ | ২৬০ |
| উকুন এবং টিড্ডি মারা | ২৬১ |
| হরমে শিকার | ২৬৩ |
| শিকার ধরা এবং তা ছেড়ে দেওয়া | ২৬৩ |
| হরমের বৃক্ষ এবং উদ্ভিদ কর্তন | ২৬৩ |
| কাফ্‌ফারার শর্তসমূহ | ২৬৪ |
| দম আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ | ২৬৪ |
| সাদাকা সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ | ২৬৫ |
| রোযার শর্তসমূহ | ২৬৫ |


www.pathagar.com

## দশম পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| **ইহ্সার বা হজ্জ আদায়ে প্রতিবন্ধকতা** | **২৬৬-২৬৯** |
| বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম | ২৬৬ |
| প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয় | ২৬৭ |
| হাদী পাঠানোর পর প্রতিবন্ধকতা দূর হলে | ২৬৭ |
| একের পর এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে | ২৬৮ |
| হাদী পাঠাতে অক্ষম হলে | ২৬৮ |
| ইহ্রামের পর হজ্জ আদায়ে ব্যর্থ হলে | ২৬৯ |
| যে সকল কারণে হজ্জের কাযা ওয়াজিব হয় | ২৬৯ |


## একাদশ পরিচ্ছেদ


| | |
|---|---|
| **মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত** | **২৭০-২৮০** |
| মদীনা মুনাওয়ারার পরিচিতি | ২৭০ |
| মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত | ২৭০ |
| মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের আদাব ও নিয়মাবলী | ২৭১ |
| মসজিদে নববীর পরিচিতি | ২৭১ |
| মসজিদে নববীর ফযীলত | ২৭১ |
| মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার আদাব ও নিয়মাবলী | ২৭২ |
| মসজিদে নববীতে প্রবেশের পর করণীয় | ২৭৩ |
| রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর রওযা মুবারক যিয়ারতের নিয়মাবলী | ২৭৩ |
| রিয়াযুল জান্নাহ্ ও তার ফযীলত | ২৭৫ |
| কুবা মসজিদ যিয়ারতের ফযীলত | ২৭৫ |
| জান্নাতুল বাকী যিয়ারতের গুরুত্ব ও ফযীলত | ২৭৬ |
| উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত | ২৭৭ |
| মদীনা মুনাওয়ারার অন্যান্য মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থানের যিয়ারত | ২৭৭ |
| মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিদায়ের নিয়ম | ২৭৮ |


www.pathagar.com

www.pathagar.com

# রোযা অধ্যায়

# كِتَابُ الصَّوْمِ

www.pathagar.com

## প্রথম পরিচ্ছেদ

# রোযা

### রোযার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

'রোযা' শব্দটি ফার্সী। এর আরবী শব্দ হল 'সাওম'। 'সাওম' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়াতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যত সহকারে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোযা বলা হয় (আলমগীরী ও কাওয়াইদুল ফিকহ্)।

বস্তুত রোযা রাখার বিধান সর্বযুগে ছিল। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আখিরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণের যুগেই রোযার বিধান ছিল। এদিকে ইংগিত করেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববতীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়া হাসিল করতে পার। (২ ঃ ১৮৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ 'রূহুল মাআনী'তে উল্লেখ করেছেন যে এখানে 'مِنْ قَبْلِكُمْ' শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) এর যুগ পর্যন্ত সকল যুগের মানুষকে বুঝানো হয়েছে। এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রোযা কেবল আমাদের উপরই ফরয করা হয়নি বরং হযরত আদম (আ.) -এর যুগ হতেই চলে এসেছে।

অন্যান্য তাফসীর বিশারদগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

"রোযার হুকুম হযরত আদম (আ.) -এর যুগ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে" (ফাওয়াইদে উসমানী)।

তবে হযরত আদম (আ.) -এর রোযার ধরন কেমন ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার বিধান ছিল। পরে রামাযানের রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে যায়। হযরত

www.pathagar.com

মু'আয, ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, আতা, কাতাদা এবং যাহ্‌হাক (রা.) -এর মতে মাসে তিন দিন রোযা রাখার বিধান হযরত নূহ্ (আ.) -এর যুগ হতে শুরু করে নবী করীম (সা.) -এর যামানা পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরে আল্লাহ্ তা'আলা রামাযানের রোযা ফরয করে ঐ বিধান রহিত করে দেন।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে ঃ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

'যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল' বলে যে তুলনা করা হয়েছে তা শুধু ফরয হওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। যদিও নিয়ম এবং সময়ের দিক থেকে তাদের এবং তোমাদের রোযার মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। অথবা নিয়ম এবং সময়ের দিক থেকেও এ তুলনা প্রযোজ্য হতে পারে। তাই বলা হয় যে, কিতাবীদের উপরও রামাযানের রোযা ফরয ছিল। তারা তা বর্জন করে বছরে ঐ একদিন উপবাসব্রত পালন করে যে দিন ফির'আউন নীলনদে নিমজ্জিত হয়েছিল। এরপর খৃস্টান সম্প্রদায়ও উক্ত দিনে রোযা রাখে। অবশ্য তারা এর সাথে আগে-পিছে আরো দুইদিন সংযোজন করে নেয়। এভাবে বাড়াতে বাড়াতে তারা রোযার সংখ্যা পঞ্চাশের কোটায় পৌছায়ে দেয়। গরমের দিন এ রোযা তাদের জন্য দুঃসাধ্য হলে তারা তা পরিবর্তন করে শীতের মৌসুমে নিয়ে আসে।

মুগাফ্‌ফাল ইব্‌ন হানযালা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ খৃস্টান সম্প্রদায়ের উপর রামাযানের একমাস রোযা ফরয করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের জনৈক বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা এ মর্মে মানত করে যে, আল্লাহ্ তাঁকে রোগমুক্ত করলে রোযার মেয়াদ আরো দশ দিন আমরা বাড়িয়ে দেব। এরপর পরবর্তী বাদশাহর আমলে গোশত খাওয়ার কারণে বাদশাহর মুখে রোগব্যধি দেখা দিলে তারা আবারো মানত করে যে, আল্লাহ্ যদি তাকে সুস্থ করে দেন তবে আমরা অতিরিক্ত আরো সাতদিন রোযা রাখব। তারপর আরেক বাদশাহ সিংহাসনে সমাসীন হয়ে তিনি বললেন, তিন দিন আর ছাড়বো কেন? এবং তিনি এ-ও বললেন যে, এ রোযাগুলো আমরা বসন্তকালে পালন করব। এভাবে রোযা ত্রিশের সংখ্যা অতিক্রম করে পঞ্চাশের কৌটায় পৌছে যায় (রূহুল মা'আনী, ২য় খণ্ড)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহ্‌দীরা আশুরার দিন সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আ.) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক হক্‌দার। এরপর তিনি এ দিন পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন (বুখারী ঃ সাওম অধ্যায়)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁদের উম্মাতগণ সকলেই সাওম পালন করেছেন।

www.pathagar.com

নবীগণের মধ্যে হযরত দাঊদ (আ.) -এর রোযা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সবসময় রোযা রাখ এবং রাতভর নামায আদায় কর। আমি বললাম জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি এরূপ করলে তোমার চোখ বসে যাবে এবং শরীল দুর্বল হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখল সে যেন রোযাই রাখলনা। (প্রতি মাসে) তিন দিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী রাখার সামর্থ রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি 'সাওমে দাঊদী' পালন কর। তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন। (ফলে তিনি দুর্বল হতেন না) এবং যখন তিনি শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না (বুখারী ঃ সাওম অধ্যায়)।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত দাঊদ (আ.) ও সিয়াম পালন করেছেন। মোটকথা হযরত আদম (আ.) –এর যুগ থেকেই রোযা রাখার বিধান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আদর্শচ্যুত হয়ে লোকেরা আল্লাহর বিভিন্ন বিধানকে যেভাবে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছিল অনুরূপভাবে রোযার মধ্যেও তারা এমন সব পরিবর্তন করেছিল যাতে রোযার ধর্মীয় তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য শেষ হয়ে একটি নিছক প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

এহেন অবস্থা হতে রোযাকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং একে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের ধারক বানানোর নিমিত্তে মহান রাব্বুল আলামীন দ্বিতীয় হিজরীতে রামাযানের মাসের রোযাকে এ উম্মাতের উপর ফরয করে দেন।

ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়া হাসিল করতে পার (২ ঃ ১৮৩)।

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে (২ ঃ ১৮৫)।

ইসলাম অন্যান্য ইবাদতের মত রোযার মধ্যেও বেশ কিছু মৌলিক ও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেছে। সমাজের সর্বস্তরে এ সুদূর প্রসারী সংস্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ইসলামের সর্বপ্রধান সংস্কার হল রোযার ব্যাপারে ধারনাগত পরিবর্তন। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের দৃষ্টিতে রোযা ছিল বেদনা ও শোকের প্রতীক। ইসলাম এই হতাশাব্যঞ্জক ভ্রান্ত ধারনাকে স্বীকার

www.pathagar.com

করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে রোযা হল, এমন এক সার্বজনীন ইবাদত যা রোযাদারকে দান করে আত্মার সজীবতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তাধারার বিশুদ্ধতা। এ রোযার মাধ্যমেই লাভ করে বান্দা এক অপার্থিব স্বাদ, লাভ করে এক নতুন উদ্যম ও প্রেরণা। রোযার উপর আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তা এক মুহূর্তে মানুষকে করে তোলে ভোগে বিতৃষ্ণ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। হাদীসে কুদ্সীতে উল্লেখ রয়েছে; আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন : 'রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরষ্কার দান করবো'। অন্য এক হাদীসে আছে, 'রোযাদার ব্যক্তি দু'টি আনন্দ লাভ করবে। একটি আনন্দ হল ইফ্তারের মুহূর্তে আর অপরটি হলো তার প্রতি পালকের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে'।

রোযাদার ব্যক্তির যেন সাধ্যাতীত কোন কষ্ট না হয় এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহ্রীকে সুন্নাত এবং বিলম্বে সাহরী গ্রহণ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। এমনিভাবে ইফ্তারের সময় বিলম্ব না করে ওয়াক্ত হতেই ইফ্তার করার হুকুম দিয়েছেন।

কোন কোন প্রাচীন ধর্ম মতে রোযা এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য পালনীয় ছিল। কিন্তু ইসলাম রোযাকে সকল শ্রেণী বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত করে এক সার্বজনীন রূপ দান করেছে। ইসলামের বিধানে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য রোযা রাখা ফরয।

ইরশাদ হয়েছে :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে (২ : ১৮৫)।

প্রাচীন ধর্মসমূহে শ্রেণী বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিশেষ কোন কারণবশত কাউকে রোযা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু ইসলাম এ ক্ষেত্রে উদার নীতিগ্রহণ করেছে। মাযূর-অক্ষম ব্যক্তিদের রোযার বিষয়টি বিবেচনায় এনে ওযর দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

তোমাদের কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পুরা করতে হবে (২ : ১৮৫)।

রোযার ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এত বাড়াবাড়ি ছিল যে, তারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতো। আবার কেউ কেউ কেবল গোশ্ত জাতীয় খাদ্য বর্জনকেই রোযার জন্য যথেষ্ট মনে করতো। কিন্তু ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উদারতা উভয়কেই প্রত্যাখান করেছে। বস্তুত ইসলামী রোযা হল ভারসাম্যপূর্ণ এক ঐশী বিধান।

এখানে যেমন অধিকার নেই আত্মাকে অমানবিক কষ্ট দেয়ার কিংবা নিজের জন্য জীবন্ত

www.pathagar.com

সামাধি রচনা করার। তেমনি অবকাশ নেই স্বেচ্ছাচারিতার। ইয়াহুদীরা শুধু ইফ্তারের সময় খাদ্য গ্রহণ করত। এরপর খাদ্য পানীয় কোন কিছুই গ্রহণ করা তাদের ধর্মে বৈধ ছিল না। ফলে সারা রাত তাদের পানাহার সহ যাবতীয় বৈধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হত। কিন্তু আল-কুরআন মানুষের মনগড়া যাবতীয় নিয়ম-কানূন ও বিধি-নিষেধ খতম করে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্ররেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয় (২ ঃ ১৮৭)।

সকল প্রাচীন ধর্মেই সৌর মাস হিসাবে রোযা রাখার বিধান ছিল। তাই দিন তারিখ এবং মাসে হিসাব রাখার জন্য সৌর বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়াও সৌর বর্ষের কারণে প্রতি বছর একই সময় নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখতে হত। এতে কখনো কোনরূপ রদবদল হতো না। কিন্তু ইসলামে সৌর মাসের পরিবর্তে চান্দ্র মাসে হিসাবে রোযা ফরয করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ

চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে তা শেষ করবে (তিরমিযী)।

রোযাকে চন্দ্র মাসের সাথে সম্পর্কিত করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় সুফল এই যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন মানুষ অতি সহজেই রোযা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এমনকি গভীর অরণ্যে পর্বত চূড়ায় অথবা জনমানবহীন কোন দ্বীপে বসবাসকারী ব্যক্তিও চাঁদ দেখে রোযা রাখতে পারছে অনায়াসে। এর জন্য তাকে সৌর বিজ্ঞানের ছাত্র হতে হয়না। এর আরেকটি সুফল হল, চন্দ্র মাসের কারণে ধীরেধীরে রামাযানের মৌসূম পরিবর্তন হয়ে থাকে। কখনো রামাযান আসে গরমে আবার কখনো বা শীতে। মৌসুমের এ পরিবর্তনের ফলে নতুনত্বের একটা স্বাদ পাওয়া যায়। এতে শীত ও গরমের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ উভয় প্রকার রোযার অভ্যস্ত হয়ে সর্ববস্থায় ধৈর্যধারণ ও শোক্র আদায়ের তাওফীক লাভ করছে মুসলমান। একজন মুসলমান যখন হিকমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণে ভরপুর এ রোযার সাথে প্রাচীন ধর্মসমূহের উপবাসে ব্রতের তুলনা করে এবং রোযার সাথে মুসলিম উম্মাহ্র একনিষ্ঠ প্রেম ও গভীর ভালবাসার ইতিহাস পাঠ করে তখন তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে এ অকপট স্বীকৃতি ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণীই এনেছেন (৭ ঃ ৪৩)।

www.pathagar.com

## রোযা ও রামাযান মাস সম্পর্কীয় পরিভাষা

সাওম (صَوم) ঃ অর্থ রোযা। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ এবং একবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই এ শব্দটি সমভাবে ব্যবহৃত হয়।

সিয়াম (صِيام) ঃ শব্দটি এর অর্থ রোযা রাখা।

সায়িম (صَائم) ঃ সিয়াম পালনকারী বা রোযাদার।

সাওমে দাউদ (صَوم دَاؤد) ঃ দাউদ (আ.) এর অনুকরণে রোযা রাখা - একদিন রোযা রাখা এবং একদিন ছেড়ে দেওয়া।

সাওমে বিসাল (صَوم وِصَال) ঃ দুই বা ততোধিক দিন করে একাধারে রোযা রাখা। এর মধ্যে কোন ইফ্তার না করা।

সাওমে আশুরা (صَوم عَاشورَاء) ঃ মুহাররামের দশ তারিখে রোযা রাখা।

আইয়ামে বীযের রোযা (صَوم أيَام البيض) ঃ প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা (কাওয়ায়িদুল ফিক্হ)।

সাহ্‌রী (سَحرى) ঃ অর্থাৎ রোযাদার ব্যক্তি অর্ধরাত্রের পর হতে সুবহি সাদিক পর্যন্ত সময়ে রোযার নিয়্যতে যে খানা খায় একে সাহ্‌রী বলে। উল্লেখ্য যে, আরবীতে একে 'اَلسَّحُوْر' বলা হয়।

ইফ্তার (إفطَار) ঃ সূর্যাস্তের পরপর রোযাদের ব্যক্তি যে খাদ্য গ্রহণ করে একে ইফ্তার বলে।

তারাবীহ্ (تَراوِيح) ঃ রামাযান মাসে ইশার সুন্নাতের পর বিত্‌রের আগে বিশ রাক'আত নামায আদায় করা সুন্নাত। একে তারাবীহ্ নামায বলে।

শবে কদর (شب قدر) ঃ কাদ্‌রের রাত্র যা রামাযানের শেষ দশকের কোন এক বি-জোড় রাত হয়ে থাকে।

ই'তিকাফ (إعتكَاف) ঃ জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় এমন কোন মসজিদে কোন পুরুষ ব্যক্তির এবং নিজ গৃহে নির্দিষ্ট স্থানে কোন মহিলার বিশেষ নিয়্যত সহকারে অবস্থান কারাকে ই'তিকাক বলে।

মু'তাকিফ (مُعتَكف) ঃ ইতিকাফকারী ব্যক্তিকে মু'তাকিফ বলে।

কাযা (قضاء) ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে কাযা অর্থ কোন ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ের পরে আদায় করা।

কাফ্ফারা (كَفّارَة) ঃ কাজে ত্রুটি হয়ে যাওয়ার পর সাদাকা বা রোযার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করাকে শরীয়াতে কাফ্ফারা বলা হয়।

www.pathagar.com

সাদাকাতুল ফিত্‌র (صَدقَةُ الفِطر) ঃ ঈদুল ফিত্‌রের দিন সকালে মালিকে নিসাব ব্যক্তির উপর যে সাদাকা ওয়াজিব হয় তাকে সাদাকাতুল ফিত্‌র বলা হয়।

ঈদুল ফিত্‌র (عِيدُ الفطر) ঃ দীর্ঘ এক মাস রোযা রাখার পর শাওয়ালের ১লা তারিখে যে ঈদ উদ্‌যাপন করা হয় তাকে ঈদুল ফিত্‌র বলা হয়।

### রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষ মহিলা যাদের শরয়ী কোন ওযর নেই এরূপ সকলের উপরই রামাযান মাসের এক মাস রোযা রাখা ফরয।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্‌ওয়া অর্জন করতে পার (২ ঃ ১৮৩)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে আর কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পুরা করবে (২ ঃ ১৮৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

أيها النَّاس اعْبدُوا رَبَّكم و صَلُّوا خَمْسَكُمْ و صُومُوا شَهْرَكُمْ و حجُّوا بيْت رَبِّكم وَ أدُّوا زَكٰواة أموالِكم طيبة بِهَا أنفُسَكم تَدخلُوا جَنَّة رَبِّكم

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রামাযান মাসের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মালের যাকাত আদায় করবে। তাহলেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে রোযার ফরযিয়াতের ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা ঐক্যমত রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি এর ফরযিয়াত অস্বীকার করে তবে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি বিনা ওযরে রোযা না রাখে তবে সে গুনাহগার হবে। সারা জীবন রোযা রাখলেও তার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

عن أبى هُريرة رَضِى الله عنه أن رسُول اللّهِ صلى اللّه عليه و سلم قَال من افطر يومًا من رمضَان من غير رخصة و لا مرض لَم يقضه صوم الدهركله و إن صَام

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ কেউ যদি শরয়ী কোন ওযর বা অসুস্থতা না থাকা সত্ত্বেও রামাযানের কোন একটি রোযা না রাখে তবে জীবনভর রোযা রাখলেও এর বদলা হবেনা (মিশকাত ঃ ১ম খণ্ড)।

রোযার মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাক্ওয়া, হৃদয়ের পবিত্রতা, শালীনতা, উন্নত নৈতিকতা এবং আত্মার সজীবতা ও চিন্তাধারার বিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করা। তাই ইসলামে রোযার যাহিরী বিধি-বিধানের গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতিও বিশেষ তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

রোযা যাতে অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয় এবং তা যেন একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَن صَام رمضَان إيمَانا و إحتسَابا غُفر له مَاتَقدم مِن ذنبه

যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রামাযানের রোযা পালন করে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী)।

বস্তুতঃ যে রোযা আল্লাহ্র ভয়, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং চারিত্রিক মহাত্ম্য শূন্য হয় সে রোযা যেন প্রকৃত অর্থে কোন রোযাই নয়।

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

عن أبى هُريرة رضِى اللّه عنه قَال قَال رسُول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مَن لَم يدع قول الزور والعمل به فليس لِلّه حَاجة فى أن يدع طعَامه و شرَابه

হযরত আবূ হারায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি, তার এরূপ পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী)।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি তার এরূপ পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী)।

হযরত আবূ উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ রোযা হল ঢাল স্বরূপ। যদি না সে নিজেই তা ছিদ্র করে দেয়। সাহাবাগণ আরয করলেন, কোন জিনিষ দ্বারা রোযা ছিদ্র হয়ে যায়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ মিথ্যা কথা ও গীবত দ্বারা (আওসাত)।

যে কাজের দ্বারা রোযার তাৎপর্য বিনষ্ট হয় এবং এরূপ কাজ থেকে পরহেয করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জোর তাকীদ করেছেন।

www.pathagar.com

তিনি বলেছেন ঃ

وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث و لا يصخب فان سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم

রোযার অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার (বুখারী)।

রোযাকে প্রাণবন্ত করতে হলে যেমনিভাবে রসনার হিফাযত জরুরী অনুরূপ চোখ, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযতও জরুরী। রোযা কবূল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হল হালাল খাদ্য গ্রহণ। সাহ্‌রী ও ইফ্‌তারের সময় পরিমিত আহার করাও বাঞ্ছনীয়।

**রোযার ফযীলত ও উপকারিতা**

রোযার বহু ফযীলত রয়েছে। রয়েছে এর মধ্যে বহু উপকারিতা। নিম্নে এর দু'চারটি তুলে ধরা হল।

বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصيام جنة فلا يرفث و لا يجهل و إن امرؤ قاتله أوشاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه و شرابه وشهوته من اجلي الصيام لي وأنا أجزي به

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ অবশ্যই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌কের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম উৎকৃষ্ট। সে আমার জন্য পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে। রোযা আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব (বুখারী)।

অপর এক হাদীসে আছে ঃ

عن سهل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ان الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيرهم يقال أنت الصائمون فيقومون لايدخل منه أحد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه

হযরত সাহল (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যে রাইয়ান নামক একটি দরজা রয়েছে, কিয়ামতের দিন রোযাদার লোকরাই এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ কর না। ঘোষণা দেওয়া হবে রোযাদার লোকেরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে (বুখারী)।

www.pathagar.com

রোযার মধ্যে বহু উপকারিতা নিহিত রয়েছে। যেমন ঃ

১. রোযার দ্বারা স্বভাবগত প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয়, চারিত্রিক পরিশুদ্ধি আসে। কেননা ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে মানুষের জৈবিক ও পাশবিক বৃত্তি নিস্তেজ হয়। মনুষ্যত্ব জাগ্রহ হয় এবং অন্তর বিগলিত হয় মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়।

২. রোযার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ভীতি এবং তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।

৩. রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহ্র আযমত ও মহত্বের ধারণা জাগ্রত হয়।

৪. রোযার দ্বারা অর্ন্তদৃষ্টি উন্মোচিত হয়।

৫. দূরদর্শিতা প্রখর হয়।

৬. রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে এক প্রকার রূহানী শক্তি সৃষ্টি হয়।

৭. রোযার দ্বারা পশু স্বভাব দূরিভূত হয়।

৮. রোযা মানুষের মধ্যে ফিরিশ্তা চরিত্র সৃষ্টি করে।

৯. রোযার মাধ্যমে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হয়।

১০. রোযার বরকতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি কোন দিনও ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত থাকেনি সে কখনো ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট বুঝতে পারে না।

১১. রোযা পালন আল্লাহ্র প্রতি গভীর প্রেমের অন্যতম নিদর্শন। কেননা কারো প্রতি ভালবাসা জন্মিলে তাঁকে লাভ করার জন্য প্রয়োজনে প্রেমিক পানাহার বর্জন করে এবং দুনিয়ার সব কিছুকে ভুলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে রোযাদার ব্যক্তিও আল্লাহ্ প্রেমে দেওয়ানা হয়ে সব কিছু ছেড়ে দেয় এমনকি পানাহার পর্যন্ত ভুলে যায়। তাই রোযা হল আল্লাহ্ প্রেমের অন্যতম নিদর্শন।

১২. রোযা মানুষের জন্য রূহানী খাদ্যতূল্য। এ খাদ্য পরকালে কাজে আসবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রোযা রাখবেনা যে পরকালে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকবে (আহ্কামে ইসলাম)।

১৩. রোযা মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ। তা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হিফাযত করে।

১৪. রোযার দ্বারা কলবের ইসলাহ্, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং হৃদয়ের সজীবতা হাসিল হয়। সর্বোপরি এর দ্বারা অন্তরাত্মায় হাসিল হয় প্রচুর প্রশান্তি এবং দূরিভূত হয় হৃদয়ের অস্থিরতা। পক্ষান্তরে পানাহারের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিও অযথা গল্প গুজব মানুষকে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে গোমরাহীতে লিপ্ত করে দেয়।

১৫. রোযার দ্বারা শারীরিক সুস্থতা হাসিল হয়। কেননা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে প্রতিটি মানুষের জন্যই বছরে কয়েকদিন উপবাস থাকা আবশ্যক। তাঁদের মতে স্বল্প খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের

www.pathagar.com

জন্য খুবই উপকারী। সুফী সাধকগণের মতে হৃদয়ের স্বচ্ছতা হাসিলে স্বল্প খাদ্য গ্রহণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে (আরকানে আরবা)।

### রোযার সময়

রোযার সময় হল সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কাজেই সুবহে সাদিক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার স্ত্রী সহবাস সবকিছু করা জায়িয। অনুরূপ সূর্যাস্তের পরও উপরোক্ত কাজগুলো জয়িয। শেষরাতে সাহ্‌রী খাওয়া এবং রোযার নিয়্যত করে নেয়ার পর রাত থাকা সত্ত্বেও কিছু খাওয়া দাওয়া বা স্ত্রী সহবাস করা না যায়িয নয়। তবে সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে এ কাজগুলো করা উচিত নয়। অবশ্য এ অবস্থায় পানাহার করলে রোযা শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সুবহে সাদিকের পরে সাহ্‌রী খাওয়া হয়েছে তবে সেই রোযার কাযা করতে হবে। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে মনে করে ইফ্‌তার করার পর যদি দেখা যায় যে মূলত সূর্যাস্ত হয়নি এ অবস্থায় বাকী সময়টুকু রোযা অবস্থায় কাটাতে হবে এবং ঐ রোযার কাযা করতে হবে (হেদায়া, ১ম খণ্ড)।

সূর্যাস্ত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে ইফ্‌তার করা জায়িয নয়। যদি সন্দেহ নিয়ে ইফ্‌তার করা হয় আর সুর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যায় তবে ঐ রোযা কাযা করতে হবে। যদি সন্দেহ নিয়া ইফ্‌তার করার পর সূর্যাস্ত হয়নি বলে নিশ্চিত হওয়া যায় তবে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### ভৌগলিক ও মৌসূমগত কারণে দিন ছোট বড় হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এবং মৌসুমের বিভিন্নতার দরুণ পৃথিবীর সকল স্থানে দিন-রাত এক সমান হয়না। কোথাও কোথাও দিন ১৩ ঘন্টা হতে প্রায় ২৪ ঘন্টা পর্যন্তও দীর্ঘ হয়ে থাকে। আবার মেরু এলাকায় মাসের পর মাস একটানা দিন ও একটানা রাত চলতে থাকে। ঐ সকল এলাকায় রোযা আদায়ের জন্য ফকীহ্‌গণ নিম্নরূপ সমাধান দিয়েছেন ঃ

১. যে সকল এলাকায় প্রায় ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দিবাভাগ দীর্ঘ হয় ঐ সকল এলাকায় পূর্ণ দিবাভাগ রোযা রেখে সূর্যাস্তের পরে ইফ্‌তার করতে হবে।

২. যে সকল এলাকায় ২৪ ঘন্টার বেশী বা একটানা দিন রাত হয়ে থাকে ঐ সকল এলাকার বাসিন্দারা তাদের নিকটতম যেই অঞ্চলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দিন-রাত হয়ে থাকে ঐ অঞ্চলের সময়কে স্টান্ডার্ড সময় ধরে তদানুযায়ী রোযা আদায় করবে।

৩. যদি কেউ এত দীর্ঘ সময় ব্যাপী রোযা রাখতে অসমর্থ হয় তবে সে ঐ সময় রোযা ছেড়ে দিয়ে সুবিধাজনক মৌসূমে ঐ রোযা কাযা করে নিবে।

৪. যদি সুবিধাজনক সময় ঐ এলাকায় কখনো না আসে এবং রোযা রাখার মত সক্ষমতাও অর্জন করতে না পারে তবে চিররুগ্ন অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় রোযার ফিদ্‌য়া আদায় করে নিবে।

৫. কোন মুসাফির ব্যক্তি ঐ সকল এলাকায় সফর অবস্থায় রোযা রাখলে তাকে ঐ অঞ্চলের

www.pathagar.com

মুকীমদের অনুরূপ রোযা পালন করতে হবে। অবশ্য মুসাফিরদের জন্য সফর অবস্থায় রোযা কাযা করার ইখ্তিয়ার রয়েছে। অর্থাৎ ঐ সময় রোযা না রেখে অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে তা আদায় করে নিতে পারবে (শামী, ২য় খণ্ড অবলম্বনে)।

## বিমানে ভ্রমণকালে দিন ছোট-বড় হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান

বিমানযোগে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে ভ্রমণকালে দিন ক্রমাগতভাবে দীর্ঘ হতে থাকে। এমনকি পশ্চিম দিকে অবিরাম বিমান চলতে থাকলে ২৪ ঘন্টার চেয়েও দিবা ভাগ দীর্ঘ হতে পারে। আবার পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে যাওয়ার সময় দিন ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। এমতাবস্থায় ফকীহ্গণের মতে রোযা আদায়ের হুকুম নিম্নরূপ ঃ

১. রোযাদার ব্যক্তি সুবহি সাদিক হতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি সূর্যাস্ত হয় তবে সূর্যাস্তের পরে ইফ্তার করবে। আর যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যাস্ত না হয় তবে সাধারণত ইফ্তার ও পানাহার করতে যতটুকু সময় লাগে ২৪ ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার ততটুকু সময় আগে ইফ্তার ও পানাহার করে নিবে।

২. পূর্ব দিকে সফরকারী ব্যক্তি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে সূর্যাস্ত পাবে এবং সূর্যাস্তের পর ইফ্তার করবে।

৩. যদি বিমান খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন হয় , তাতে সফরকারী ব্যক্তি ইফ্তারের ব্যাপারে স্বাভাবিক অবস্থায় যতটুকু সময় রোযা রাখত ততটুকু সময় রোযা রেখে তারপর ইফ্তার করবে।

## রোযা ফরয হওয়ার শর্ত

রোযা ফরয হওয়ার শর্ত তিনটি ঃ

১ মুসলমান হওয়া।

২. জ্ঞানবান হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া

৩. বালিগ হওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানবান, বালিগ মুসলমান যাদের শরয়ী কোন ওযর নেই এমন প্রত্যেক নর-নারীর উপর রোযা রাখা ফরয।

## রোযা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

রোযা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত দু'টি ঃ

১. সুস্থ থাকা।

২. মুকীম হওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্ত

রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্ত দু'টি ঃ

১. নিয়্যত করা।

২. মহিলাদের হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## রোযার নিয়্যত সম্পর্কীয় মাসাইল

রোযা সহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়্যত করা শর্ত। নিয়্যত হল, অন্তর দিয়ে কোন কাজের সংকল্প করা। রোযার ক্ষেত্রে এরূপ সংকল্প করা যে 'আমি রোযা রাখছি'। মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। প্রত্যেক দিনের রোযার জন্য নিয়্যত করা আবশ্যক।

শায়খ নাজমুদ্দীন নসফী (র.) -এর মতে রামাযানে সাহ্রী খাওয়ার দ্বারা নিয়্যত আদায় হয়ে যায়। অন্য রোযার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আরবীতে নিয়্যত করা জরুরী নয়। তবে কেউ যদি আরবী শব্দে নিয়্যত করতে চায় তাহলে বলবে ঃ

نَوَيْتُ أَنْ أَصُوْمَ غَداً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

আমি রামাযান মাসের আগামী দিনের রোযা রাখার নিয়্যত করছি।

কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ চাহে তো আগামীকাল রোযা রাখব। তবুও তার নিয়্যত সহীহ্ হবে। চান্দ্র মাসের ক্ষেত্রে রাত আগে আসে এবং দিন পরে আসে। রোযার নিয়্যত করার সময় সূর্যাস্তের পর থেকে আরম্ভ হয় এবং তা 'যুহওয়াতুল কুব্রা'র পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। 'যুহওয়াতুল কুব্রা' বলা হয় সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট সময়ের মধ্যবর্তী সময়কে। সুতরাং সূর্যাস্তের পূর্বে রোযার নিয়্যত করা জায়িয নয়। সূর্যাস্তের পূর্বে নিয়্যত করা জায়িয 'যুহওয়াতুল কুব্রা'র পূর্বে নিয়্যত করা তখনই জায়িয হবে যদি সুবহে সাদিকের পর থেকে এর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস না করা হয়। যদি এ সময়ের মধ্যে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করে থাকে তবে সুবহে সাদিকের পরবর্তী নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবেনা। যদি রামাযান মাসে নির্দিষ্টভাবে রামাযানের রোযা বা ফরয রোযার নিয়্যত না করে শুধু এতটুকু বলে যে আমি আজ রোযা রাখব অথবা রাত্রে মনে মনে বলে যে, আগামীকাল আমি রোযা রাখব তবে এতেও রামাযানের রোযা সহীহ্ হয়ে যাবে।

যদি কেউ রামাযান মাসে রামাযানের রোযা না রেখে নফল রোযার নিয়্যত করে এবং একথা মনে করে যে রামাযানের রোযা পরে কাযা করে নিব তবে এ অবস্থায়ও রামাযানের ফরয রোযা আদায় হয়ে যাবে। নফল রোযার নিয়্যত সহীহ্ হবে না। এক রামাযানে কেউ যদি অপর রামাযানের কাযা রোযার নিয়্যত করে তবুও রামাযানের ফরয রোযাই আদায় হবে। কাযার নিয়্যত সহীহ্ হবেনা। রামাযানের পর কাযা আদায় করবে। কেউ যদি রামাযানের রোযার নিয়্যত না করে মানতের ওয়াজিব রোযা আদায় করার নিয়্যত করে তবুও রামাযানের রোযাই আদায় হবে। মানতের রোযা আদায় হবে না। পরবর্তী সময় মানতের রোযা আদায় করতে হবে। মোটকথা রামাযান মাসে যে কোন রোযারই নিয়্যত করুক না কেন তাতে রামাযানের রোযাই আদায় হয়ে যাবে। অন্য কোন রোযার নিয়্যত সহীহ্ হবে না।

মুসাফির এবং রুগ্ন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্টভাবে রামাযানের রোযার নিয়্যত না করে শুধু এতটুকু বলে যে, আমি আজ রোযা রাখব তবে এতেও রামাযানের রোযা আদায় হবে। দিনের বেলা রোযার নিয়্যত করলে এভাবে নিয়্যত করবে যে, 'যখন হতে দিন শুরু হয়েছে তখন থেকে আমি রোযা রাখার নিয়্যত করেছি' যদি এরূপ বলে যে, 'এখন থেকে আমি রোযা রাখার নিয়্যত

www.pathagar.com

করলাম' তবে এ নিয়্যত সহীহ্ হবে না এবং উক্ত ব্যক্তি রোযাদার হিসাবে গণ্য হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ যদি রামাযান মাসে রাত বা দিনে বেহুশ হয়ে যায় আর দ্বিপ্রহরের পূর্বে তার হুশ ফিরে আসে এবং এর মধ্যে যদি রোযা ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে ও এ অবস্থায় যদি রোযার নিয়্যত করে নেয় তবে তার রোযা সহীহ্ হবে। পাগলের বেলায়ও হুকুম অনুরূপ। দিনের প্রথম ভাগে কোন মুসলমান মুরতাদ হয়ে যদি পুনঃ ইসলামগ্রহণ করে এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে রোযার নিয়্যত করে তবে তার রোযা সহীহ্ হবে। নিয়্যতের ক্ষেত্রে উত্তম হল রাতে নিয়্যত করা এবং নির্দিষ্টভাবে নিয়্যত করা। কাযা ও কাফ্ফার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে রোযার নিয়্যত রাতেই করতে হবে। কোন মহিলা যদি হায়িযের অবস্থায় রোযার নিয়্যত করে এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে সে পবিত্র হয়ে যায় তবে তার রোযা সহীহ্ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### রোযার ফরয

রোযার ফরয দু'টি ঃ ।

১. নিয়্যত করা,

২ পানাহার, স্ত্রী সহবাস এবং এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ্ তা'আলা রামাযানের রাতে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাসকে বৈধ করেছেন। কিন্তু রোযা অবস্থায় একাজ বৈধ নয় (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

### রোযার সুন্নাত ও আদাব

রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সাহ্রী খাওয়া সুন্নাত। যথাসম্ভব দেরী করে সাহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব তবে এত বেশী দেরী করবেনা যে সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় এবং রোযার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। সূর্যাস্ত হওয়ার পর বিলম্ব না করে শীঘ্র শীঘ্র ইফ্তার করা সুন্নাত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

ইফ্তারের সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

মাগরিবের নামাযের আগে ইফ্তার করা মুস্তাহাব (আলমগীরী)।

### রোযার প্রকারভেদ

রোযা সাধারণত তিন প্রকার ঃ

১. ফরয রোযা, ২. ওয়াজিব রোযা ও ৩. নফল রোযা।

### ফরয রোযা

ফরয রোযা দুই প্রকার ঃ

www.pathagar.com

১. নির্দিষ্ট ফরয, যেমন রামাযানের রোযা।

২. অনির্দিষ্ট ফরয, রামাযানের কাযা রোযা এবং সকল প্রকার কাফ্‌কার রোযা।

যে সকল নিষিদ্ধ কাজের দণ্ড হিসাবে শরীয়াতে রোযা রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে তাকে কাফ্‌ফারার রোযা বলে। যেমন কসম করে তা ভংগ করা, রামাযানের রোযা রেখে বিনা ওযরে তা ভঙ্গ করা।

যে কোন কারণে রামাযানে রোযা না রেখে পরবর্তী সময়ে ঐ রোযা রাখাকে কাযা রোযা বলে।

## ওয়াজিব রোযা

যে কোন মানতের রোযা ওয়াজিব রোযা হিসেবে গণ্য। এটা দু'প্রকার ঃ

১. নির্দিষ্ট দিনের মানতের রোযা,

২ অনির্দিষ্ট দিনের মানতের রোযা।

## মানত রোযা

কেউ যদি রোযা রাখার মানত করে তবে তার জন্য ঐ রোযা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি ঐ রোযা না রাখে তবে গুনাহগার হবে। কেউ যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে মানত করে এবং বলে, হে আল্লাহ্! আমার অমুক কাজটি যদি আজ সম্পন্ন হয়ে যায় তবে আগামীকাল আপনার উদ্দেশ্যে একটি রোযা রাখব অথবা এরূপ বলল যে, যদি আমার অমুক কাজটি হয়ে যায় তবে পরশু শুক্রবার দিন আমি একটি রোযা রাখব। ঐকাজ পূর্ণ হলে তার জন্যে ঐ নির্দিষ্ট দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব হবে।

জুমু'আর দিন আসার পর রোযা রাখার সময় মানতের নিয়্যত না করে সে যদি শুধু রোযা রাখার নিয়্যত করে অথবা নফল রোযার নিয়্যত করে তবে এতেও মানতের রোযা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ঐ তারিখে কাযা রোযার নিয়্যত করে এবং মানতের কথা মনে না থাকে অথবা মনে ছিল কিন্তু ইচ্ছা করেই কাযার নিয়্যত করেছে তবে কাযা রোযাই আদায় হবে। মানত আদায় হবে না। মানতের রোযা পরে কাযা করতে হবে।

কেউ যদি দিন তারিখ দির্নিষ্ট না করে মানত করে এবং এরূপ বলে যে, আমার অমুক কাজটি যদি হয়ে যায় তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি একটি রোযা রাখব অথবা শর্তহীনভাবে শুধু একথা বলল যে, আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পাঁচটি রোযা রাখব তবে এরূপ মানত করাও দুরস্ত আছে। এভাবে মানত করলে রাত্রেই রোযার নিয়্যত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের পর মানতের রোযার নিয়্যত করলে অনির্দিষ্ট মানতের রোযা আদায় হবেনা। বরং এ রোযা নফল হয়ে যাবে (মারাকিল ফালাহ্)।

যদি কেউ অর্ধদিন রোযা রাখার মানত করে তবে মানত সহীহ্ হবে না। যদি কেউ অনির্দিষ্টভাবে একদিন রোযা রাখার মানত করে তবে একদিনের রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য আদায়ের তারিখ নির্ণয় করা তার ইখ্‌তিয়ারাধীন থাকবে। যে দিন ইচ্ছা সেদিনই

www.pathagar.com

তা রাখতে পারবে। যদি কেউ দুই দিন বা তিন দিন অথবা দশ দিন রোযা রাখার মানত করে তবে এ রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য আদায় করার ব্যাপারে সে স্বাধীন, ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথকভাবে রাখতে পারবে অথবা একত্রেও রাখতে পারবে। যদি একাধারে রাখার মানত করে তবে একাধারেই রাখতে হবে। পৃথক পৃথকভাবে অথবা মাঝখানে দু'একদিন বাদ দিয়ে রোযা রাখে তাহলে তা আদায় হবেনা। এ ক্ষেত্রে যদি কোন মহিলার হায়িয বা নিফাস আরম্ভ হয়ে যায় তবে তাকে পুনরায় প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে।

কেউ যদি পৃথকভাবে কয়েকদিন রোযা রাখার মানত করে অতঃপর তা একত্রে আদায় করে নেয় তবে মানত আদায় হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে, আমি কয়েকদিন রোযা রাখার মানত করলাম তবে কমপক্ষে তিন দিন রোযা রাখতে হবে। আর বহুদিন রোযা রাখার মানত করলে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে দশ দিন এবং সাহিবাইনের মতে সাতদিন রোযা রাখতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ এরূপ মানত করে যে আমি বৃহস্পতিবার রোযা রাখব; তাহলে তাকে পরবর্তী বৃহস্পতিবারই সে রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের রোযার মানত করে তবে প্রতি বৃহস্পতিবারই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। বৃহস্পতিবারে ঐ রোযা না রাখলে সে রোযার কাযা ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ ঈদের দিন রোযা রাখার মানত করে তবে রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু এ দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ বিধায় পরবর্তীতে এর কাযা করে নিতে হবে। কেউ যদি এরূপ মানত করে যে, আমি সারা বছর রোযা রাখব তবে দুই ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন রোযা রাখবেনা। পরবর্তী সময় এ পাচ দিনের কাযা আদায় করে নিবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ঈদুল ফিত্‌রের আগে এরূপ মানত করে থাকলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি শাওয়াল মাসে এভাবে মানত করে তবে ঈদুল ফিত্‌রের কাযা ওয়াজিব হবেনা। এমনিভাবে আইয়ামে তাশরীকের পরে করলে দুই ঈদ এবং আইয়ামে তাশরীকের দিন সমূহের কাযা আবশ্যক হবে না।

আর কেউ যদি পূর্ণ এক বছর রোযা রাখার মানত করে তবে তাকে পূর্ণ এক বছরই রোযা রাখতে হবে এবং রামাযানের ত্রিশ ও দুই ঈদ এবং আইয়ামে তাশরীকের পাঁচদিন মোট পঁয়ত্রিশ দিনের রোযার কাযা করতে হবে। যদি কোন মহিলা নির্দিষ্ট কোন বছরের রোযার মানত করে তবে হায়িযের দিনগুলো ছাড়া বাকী দিনগুলোর রোযা রাখবে। পরে এ দিন গুলোর কাযা আদায় করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

একদিনের রোযার মানত করতে গিয়ে যদি কারো মুখ দিয়ে এক মাসের কথা বের হয়ে যায়; তবে এক মাস রোযা রাখাই তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা মানতের মধ্যে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা উভয়ই সমান। কেউ যদি অনির্দিষ্টভাবে বলে, আমি এক মাসের রোযা রাখব তবে ত্রিশ দিন রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। যে মাস সে চায় নির্দিষ্ট করতে পারবে। মানতের পর পরই তা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তাই বিলম্বে আদায় করলেও গুনাহ হবে না।

একাধারে এক মাস রোযা রাখার মানত করলে তাকে একাধারেই এক মাস রোযা রাখতে

www.pathagar.com

হবে। আর যদি একাধারের মানত না করে তবে পৃথক পৃথকভাবে রাখাও জায়িয হবে। কোন মাসকে নির্দিষ্ট করতঃ রোযা রাখার মানত/ঐ রোযা রাখার সময় যদি এক বা একাধিক দিনের রোযা না রাখে তবে ঐ দিনসমূহের রোযা কাযা করতে হবে। আর যদি সেই মাসে মোটেই রোযা না রাখে তবে এ রোযার কাযা আদায় করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। একাধারে তা রাখতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে পৃথকভাবেও রাখতে পারবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মানতের রোযা যথাসময় না রাখার ফলে তা যদি কাযা হয়ে যায় এবং কাযা আদায়ে বিলম্ব করতে করতে কেউ যদি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে যায় অথবা কেউ যদি সর্বদা রোযা রাখার মানত করে বার্দ্ধক্যের কারণে কিংবা কষ্টসাধ্য পন্থায় জীবিকা উপার্জন লিপ্ত হওয়ার কারণে কাযা আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ে তবে সে রোযা রাখবেনা। বরং এক এক দিনের রোযার পরিবর্তে এক একজন মিস্‌কীনকে খানা খাওয়াবে। যদি দারিদ্রের কারণে মিস্‌কীন খাওয়াতে সক্ষম না হয় তবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করবে। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যদি প্রচন্ড গরমের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে সে সময় রোযা না রেখে শীতের মৌসুমে এর কাযা আদায় করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শর্ত সাপেক্ষে রোযার মানত করতঃ শর্ত পাওয়ার আগে রোযা রাখলে ঐ রোযা যথেষ্ট হবে না। শর্ত পূরণের পরে তা পুনঃ আদায় করতে হবে। নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখার মানত করে ঐ মাস আসার আগেই যদি রোযা রাখা হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর মতে এ রোযা যথেষ্ট হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে যথেষ্ট হবে না। কেউ যদি বলে, আমার রোগ ভাল হলে আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এত দিন রোযা রাখব। সে ক্ষেত্রে রোগ মুক্তির পর ততদিন রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে।

একমাস রোযা রাখার মানত করে মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই কেউ যদি মারা যায় তবে এ বিষয়ে অসিয়্যত করে যাওয়া আবশ্যক। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ প্রতিটি রোযার পরিবর্তে এক সা' (সাড়ে তিন সের অথবা ৩ কেজি ৪০০ গ্রাম) গম মিসকীনদের প্রদান করবে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি বলে, আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক মাস রোযা রাখব। এরপর সুস্থ হওয়ার আগে যদি সে মারা যায় তবে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে ন। যদি এক দিনের জন্যও সুস্থ হয়ে থাকে তবে এক মাস রোযার ফিদ্‌য়া আদায়ের অসিয়্যত করে যাওয়া তার জন্য আবশ্যক। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে যে ক'দিন সুস্থ থাকবে ঐ ক'দিনের অসিয়্যত করে যাওয়া তার জন্য আবশ্যক হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## নফল রোযা

ফরযিয়াতের উপর আমল করার সাথে সাথে নফল আমলের অভ্যাস গড়ে তোলা অতি জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নফল নামায এবং নফল রোযার প্রতি বেশ উৎসাহিত করেছেন। এতে বহু ফযীলত রয়েছে। ফরয আদায়ের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে নফলের দ্বারা তা পূরা করে দেয়া হবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযার প্রতি যত্নবান হওয়াও বাঞ্ছনীয়। অবশ্য বছরে পাঁচ দিন রোযা রাখা জায়িয নয়। দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পর ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহজ্জ মোট এই পাঁচ দিন রোযা রাখা

www.pathagar.com

হারাম। এই পাঁচদিন এবং রামাযানের রোযা ছাড়া যে কোন দিন নফল রোযা রাখা জায়িয।

নফল রোযা যতবেশী রাখা যাবে ততবেশী সাওয়াব হবে। 'নফল রোযার কথা' উল্লেখ করে অথবা শুধু রোযার কথা উল্লেখ করে নিয়্যত করলেও নফল রোযা সহীহ্ হবে। 'যাহওয়াতুল কুব্রা'র পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়্যত করা দুরস্ত আছে। সুতরাং এর পূর্ব পর্যন্ত যদি পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস না করে থাকে এবং এ সময় রোযা রাখার নিয়্যত করে তবে এ নিয়্যত সহীহ্ হবে। নফল রোযা আরম্ভ করলে নফল রোযা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব কেউ যদি নফলের নিয়্যতে রোযা আরম্ভ করে তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কাযা করতে হবে (কুদূরী)।

স্বামী বাড়ী থাকা অবস্থায় স্ত্রীর জন্য তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা দুরস্ত নয়। এমনকি স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখার পর সে যদি তা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম করে তবে নফল রোযা ভেঙ্গে ফেলা দুরস্ত আছে। পরে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে এর কাযা করতে হবে।

মেহমান যদি রোযাদার মেযবানকে নফল রোযা ভঙ্গ করে তার সাথে খানায় শরীক হওয়ার জন্য বলে তবে মেযবানের জন্য রোযা ভঙ্গ করে মেহমানের সাথে খানায় শরীক হওয়া জায়িয আছে। অবশ্য পরে এর কাযা করতে হবে (কাযী খান)।

### আশুরার রোযা

'আশুরা' শব্দটি আরবী। মুহাররম মাসের দশম দিবসকে 'আশুরা' বলা হয়। এদিনে রোযা রাখা প্রথমে ফরয ছিল, পরে রামাযানুল মুবারকের রোযা ফরয হওয়ার পর তা রহিত হয়ে যায়। আশুরার রোযা প্রবর্তিত হওয়া সম্বন্ধে ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) -এর বরাতে একটি হাদীস করেছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন সাওম পালন করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কী ব্যাপার? তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন? তারা বলল, এটি একটি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসলাঈলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে নাজাত দান করেছেন। ফলে এ দিনে মূসা (আ.) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আ.) -এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন (বুখারী)।

অপর এক হাদীসে আছে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রথমে আশুরার দিনে সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে যখন রামাযানের রোযা ফরয করা হল তখন তিনি বলেছেন, যার ইচ্ছা সে এ রোযা রাখ আর যার ইচ্ছা সে এ রোযা ছেড়ে দিবে (বুখারী)।

ফকীহ্গণ বলেন, আশুরার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। এতে বহু ফযীলত রয়েছে। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ আশুরার রোযা দ্বারা আমি আশা করি যে বিগত এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু আশুরার দিনের রোযা রাখা মাকরূহ। সুন্নাত তরিকা হলো আশুরার দিনের রোযার সাথে তার আগের দিন বা পরের দিনে মিলিয়ে দু'টি রোযা রাখা (আলমগীরী ও মারাকিল ফালাহ্)।

www.pathagar.com

## শা'বানের রোযা

শা'বান মাস অত্যন্ত বরকত ও ফযীলতের মাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রজবের চাঁদ উঠতেই আল্লাহ্‌র দরবারে এ মর্মে দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ্! আপনি রজব ও শা'বান মাসকে আমাদের জন্য বরকত দ্বারা ভরপুর করে দিন এবং আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত পৌছিয়ে দিন। প্রকৃতপক্ষে শা'বান হল রামাযানের প্রস্তুতির মাস। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রামাযান ছাড়া বাকী এগার মাসের তুলনায় এ মাসে বেশী সাওম পালন করেছেন। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, নবী করীম (সা.) শা'বান মাসের চেয়ে অধিক নফল রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। তিনি (প্রায়) পুরা শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন।

এ মাসের রোযা সমূহের মধ্যে ১৫ই শা'বানের রোযা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইব্‌ন মাজা শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

عَن عَلِيّ رضِى اللّٰه عنه قَال قَال رسُول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلم إذَا كَانت لَيلة النصف من شعبان فقوموا لَيلَها و صُوموا يومها فإن اللّٰه تَعَالىٰ ينزل فيهَا لِغُروب الشمس إلى السَّماء الدُّنيا فيَقُول اَلاَمن مُستَغفِر فاغفر له اَلاَ مُسترزِق فارزقه اَلاَمبتلى فاعافيه اَلاَكذا الا كذا حتى يَطلع الفجر •

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে তোমরা ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে। কেনা সূর্যাস্তের পর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে এ মর্মে আহবান করতে থাকেন যে, (তোমাদের মধ্যে) কেউ ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন রিযকপ্রার্থী আছে কি? আমি তার রিযকের ব্যবস্থা করে দিব এবং কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আছে কি? আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিব। এভাবে সুবহি সাদিক পর্যন্ত তিনি আহবান করতে থাকেন।

অপর এক হাদীসে আছে, এ রাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বনূ কালাব গোত্রের বকরী পালের শরীরে যে পরিমাণ পশম আছে এ পরিমাণ মানুষের পাপ ক্ষমা করে থাকেন (মিশ্‌কাত)।

এক হাদীসে এ কথাও উল্লেখ আছে এ রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে সমূহের আলোকে আল্লামা শামী, আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম, মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) প্রমুখ ফকীহ্‌গণ এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগী করাকে মুস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্তি করেছেন। মুফ্‌তী শফী (র.) -এর মতে শা'বানের ১৪ তাং দিবাগত রাতের আমল হল ঃ

১. রাতে না ঘুমিয়ে সজাগ থাকা এবং ইবাদত, তিলাওয়াত ও যিক্‌র আযকারে মশগুল থাকা।

২. তাওবা ইস্‌তিগফার করত উভয় জাহানের কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করা।

www.pathagar.com

৩. কবর যিয়ারত করা (হাদীস)

৪. দিনে রোযা রাখা (শবে-বরাত কী হকীকত)

শবে বরাতের এ পূণ্যময় রজনী পাওয়ার পরও যারা এ কদর করে না, তাদের চেয়ে হতভাগা আর কে? এ রাতে বাড়ী ঘর এবং মসজিদের আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজী এবং খেল তামাশার উদ্দেশ্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাফিরা না জায়িয কাজ। মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে মসজিদে হৈ-হুল্লোড় করা নিন্দনীয় কাজ। এতে ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং ইবাদতের পরিবেশ নষ্ট হয়। এহেন বদ রুসূম থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

## আরাফা দিনের রোযা

যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখকে 'ইয়াওমুল আরাফা' বা আরাফার দিন বলা হয়। এদিনে রোযা রাখা বড়ই সাওয়াবের কাজ। যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাখবে তার বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছর এই দুই বছরের সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রোযার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে হাজীদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরূহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হাদীস শরীফে আছে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হতে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত রোযা রাখা উত্তম। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের রাত্রগুলো বছরের অন্যান্য রাত্রের তুলনায় উত্তম (মারাকিল ফালাহ্)।

## আইয়ামে বীযের রোযা

চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, এ ১৫ তারিখ এ-ই তিন দিনকে 'আইয়ামে বীয' বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে এই তিন দিন রোযা রাখল সে যেন সারা বছর রোযা রাখল। নবী করীম (সা.) সাধারণত প্রত্যেক মাসের এই তিন দিন রোযা রাখতেন। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

১. প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা

২. দু' রাক'আত সালাতুদ্ দুহা আদায় করা এবং

৩. নিদ্রার পূর্বে বিত্রের নামায আদায় করা।

অপর এক হাদীসে আছে, রাবী বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখতে হুকুম করতেন। এভাবে রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য (মারাকিল ফালাহ্)।

## সাওমে দাউদী

হযরত দাউদ (আ.) এক দিন পর এক দিন রোযা রাখতেন। তাই এভাবে রোযা রাখাকে সাওমে দাউদী বলা হয়। কেউ অধিক পরিমাণে রোযা রাখার আগ্রহী হলে এ ভাবে রোযা রাখা

www.pathagar.com

উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট তা খুবই পছন্দনীয়। আবূ দাঊদ শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন ঃ দাঊদ (আ.) -এর রোযা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই পছন্দনীয় রোযা এবং তাঁর নামায আল্লাহ্‌র নিকট খুবই প্রিয়। তিনি প্রথমে অর্ধরাত্র পর্যন্ত ঘুমাতেন এরপর জাগ্রত হয়ে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সময় ইবাদত-বন্দেগী করতেন। অবশেষে এক ষষ্টাংশ পরিমাণ সময় আবার ঘুমাতেন এবং তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং এক দিন ছেড়ে দিতেন (মারাকিল ফালাহ্‌)।

## সাওমে বিসাল

রাতে পানাহার ইত্যাদি ব্যতিরেকে লাগাতার দুই বা ততোধিক দিন রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলে (মা'আরিফুস্‌ সুনান)।

তবে এভাবে রোযা রাখা মাকরূহ (মারকিল ফালাহ্‌)।

উপরে যে সব নফল রোযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এ ছাড়াও কিছু নফল রোযার বিবরণ হাদীস ও ফিকহ্‌-এর কিতাব বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ঃ

রামাযানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। একাধারে বা পৃথক পৃথকভাবে -এর রোযা রাখা জায়িয আছে। অবশ্য পৃথক পৃথকভাবে রাখা উত্তম। এই রোযা সপ্তাহে দু'টি করে রাখা ভাল (মারাকিল ফালাহ্‌ ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ সোমবার এবং বৃহস্পাতিবার মানুষের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। অতএব আমি পসন্দ করি যেন রোযা অবস্থায় আমার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয় (মারাকিল ফালাহ্‌)।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে জুমু'আর দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড) ৮

প্রত্যেক সপ্তাহে বুধবার রোযা রাখা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এ দিনে রোযা রাখা জন্য সাহাবায়ে কিরামকে হুকুম করছেন (তিরমিযী ঃ ১ম খণ্ড)।

এ ছাড়াও যে কোন দিন নফল রোযা রাখা যায়। যতবেশী রাখবে তত বেশী সাওয়াব পাবে।

## রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিনসমূহ

দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পর তিন দিন মোট পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন ঃ এ দিন গুলোতে রোযা রাখবে না। কেননা এ হল পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগের দিন। কেউ যদি এ দিনগুলোতে রোযা রাখতে আরম্ভ করে ছেড়ে দেয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

**মাকরূহ রোযা**

শুধু আশুরার এক দিন রোযা রাখা মাকরূহ। রাত্রে পানাহার ইত্যাদি ব্যতিরেকে সাওমে বিসাল করা মাকরূহ। রোযা রেখে চুপ থাকার ব্রত পালন করা মাকরূহ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলাদের জন্য নফল রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু স্বামী অসুস্থ, রোযাদার বা মুহ্‌রিম হলে তার অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা মাকরূহ নয়। রোযা রাখার কারণে যদি মুসাফির ব্যক্তির কষ্ট হয় তবে রোযা রাখা মাক্‌রূহ। যদি সফর সঙ্গী এবং কাফেলার অধিকাংশ লোক রোযা এবং তাদের সফরের খরচা যৌথভাবে নির্বাহ করা হয়, সেক্ষেত্রে সফরকারী ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা উত্তম। আরাফার দিন হাজীদের দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে রোযা রাখা মাকরূহ। অনুরূপ, যিলহজ্জের আট তারিখে হাজীদের জন্য রোযা রাখা মাক্‌রূহ্ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# রোযা ভঙ্গের কারণ এবং কাযা ও কাফ্‌ফারা

বিভিন্ন কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় রোযা অবস্থায় সে সব কাজগুলো অবশ্যই পরিত্যজ্য, অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রোযা ভঙ্গের পর কোন কোন অবস্থায় শুধু কাযা ওয়াজিব হয়। আবার কোন কোন অবস্থায় কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

### যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

রোযাদার ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কোন্ কিছু আহার করানো হলে, কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়ার সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও অসতর্কতাবশত পেটে পানি প্রবেশ করলে, রোযাদারের প্রতি কোন কিছু নিক্ষেপ করার পর তা তার গলায় প্রবেশ করলে, ডুব দিয়ে গোসল করার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়ে পানি গলার মধ্যে প্রবেশ করলে, রোযার দিনে ঘুমের অবস্থায় কোন কিছু আহার করলে, অথবা রোযার অবস্থায় পাথর, লোহা বা শিশার টুক্‌রা বা এ জাতীয় কোন বস্তু গলাধঃকরণ করলে যা সাধারণত খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয় না বা ঔষধরূপেও সেবন করা হয় না এ সব ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবেন না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

লোবান, আগর বাতি জ্বালিয়ে ইচ্ছাকৃত এর ধোঁয়া গ্রহণ করলে, হুক্কা, সিগরেট ইত্যাদি পান করলে, কাচা লাউ যা রান্না করা হয়নি তা ভক্ষণ করলে, তাজা বা শুকনা আখরোট, শুকনো বাদাম, খোসাসহ ডিম, ছিলকা সহ আনার ও কাচা পেস্তা ভক্ষণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এতে কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। শুকনো পেস্তাবাদাম চিবিয়ে ভক্ষণ করলে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। অবশ্য না চিবিয়ে গিলে ফেললে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। খোসা ফাটা থাকলেও অধিকাংশ ফকীহ্‌দের মতে এ হুকুমই প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

চাউল, বাজরা, মশুরী, মাসকলাই ইত্যাদি ভক্ষণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে ও কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। দাঁতের ফাঁকে যদি কোন খাঁদ্য দ্রব্য আট্‌কিয়ে থাকে আর তা সামান্য পরিমাণ হলে রোযা ফাসিদ হবে না। পরিমাণে বেশী হলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। চনা বুট বা এর চেয়ে বড় কোন কিছু হলে একে বেশী বলে গণ্য করা হবে। এর চেয়ে ছোট বা কম হলে তা কম বলে ধর্তব্য হবে। এরূপ কোন বস্তু মুখ থেকে বের করে হাতে নিয়ে পুনঃরায় তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা তিল গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা এতো একেবারেই ক্ষুদ্র বস্তু। তবে এ জাতীয় বস্তু মুখের বাইরের থেকে নিয়ে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মতভেদ থাকলে সহীহ্ মত হল, না চিবিয়ে গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর চিবিয়ে গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য চিবানোর পর গলায় স্বাদ অনুভূত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি গমের দানা চিবায় তবে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা এতো মুখেই বিলীন হয়ে যায়। অন্যকে খাওয়ানোর জন্য কেউ যদি খানা চিবায় এবং তা যদি মুখের ভেতর চলে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাহ্রীর লোকমা মুখে রয়ে গেলে এবং ফজর উদিত হওয়ার পর তা গলাধঃকরণ করলে তার রোযা ভঙ্গ হবে ও কাযা ওয়াজিব হবে। আর যদি মুখ থেকে বের করে পুনঃ খায় তাহলে কাযা কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। অন্যের থু থু গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবেনা। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তির থু থু গলাধঃকরণ করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। নিজের মুখের থুথুতে বেশিই হোক তা গলাধঃকরণ করলে রোযার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের থুথু হাতে নিয়ে পুনঃরায় তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি কথা বলার সময় অথবা অন্য কোন সময় মুখের থুথুতে রোযাদার ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয় ভিজে যায় অতঃপর সে যদি তা গিলে ফেলে তাহলে তার রোযা ফাসিদ হবে না। যদি লালা মুখ থেকে থুতনি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর যোগসূত্র মুখের মধ্যে থাকে এমতাবস্থায় উক্ত লালা মুখে টেনে নিয়ে তা গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে না। কিন্তু মুখের সাথে যুগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলে এবং তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোগের কারণে যদি কারো মুখ থেকে লালা নির্গত হয়ে মুখে পুনঃ প্রবেশ করে এবং হুলকুমে ঢুকে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। রক্ত পান করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে হুলকুমে ঢুকলে যদি থুথুর পরিমাণ বেশী হয় তাহলে ক্ষতি নেই। আর রক্তের পরিমাণ বেশী হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। সমান সমান হলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রেশমের রঙ্গের কাজ করার সময় যদি রেশম মুখের ভেতর ঢুকে এবং মুখের থুথু রঙ্গিন হয়ে যায় তবে এ থুথু গলাধঃকরণ করলে এবং এ সময় রোযার কথা স্মরণ থাকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি বা বরফের পানি গলার ভেতর ঢুকলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় চোখের দুই এক ফোটা পানি মুখে ঢুকলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু চোখের পানির পরিমাণ বেশী হলে এবং সম্পূর্ণ মুখে এর লবণাক্ততার স্বাদ অনুভূত হলে আর সে পানি গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বমি হওয়ার পর তা পুনরায় গিলে ফেললে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। নাকে নস্য গ্রহন করলে, কানে তৈল ঢাললে অথবা পায়খানার রাস্তায় ডুস নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন মহিলা যদি তার যোনি পথে কোন তরল পদার্থ ফোটা ফোটা করে প্রবেশ করায়

www.pathagar.com

তবে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পেট বা মাথার যখমে ঔষধ ব্যবহার করার পর তা যদি পেটে বা মাথার ভেতরে ঢুকে যায় তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ভেতরে না ঢুকলে রোযা ভঙ্গ হবেনা। অবশ্য তরল ঔষধ ব্যবহার করার পর তা ভেতরে ঢুকছে কি ঢুকেনি নিশ্চিতভাবে না জানা গেলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এ অবস্থায় ও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তরল ঔষধ স্বাভাবতই ভেতরে ঢুকে যায়।

যদি কারো পেটে তীর বা বর্শাইত্যাদি বিদ্ধ হয়ে পেটের ভেতরে থেকে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে তীর বা বর্শার কিছু অংশ বাইরে থেকে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে না। সুতা দিয়ে বাধা গোশ্‌তের টুক্‌রা গিলে তৎক্ষণাৎ তা বের করে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবেনা। কিন্তু সাথে সাথে বের না করে রেখে দিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পানি বা তৈল দ্বারা ভিজানো আঙ্গুল মলদ্বারে অথবা মহিলার যোনিদ্বারে ঢুকানো হলে, পানি বা তেল ভিতরে প্রবেশ করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় এরূপ করা হলে সেক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মলত্যাগের সময় রোযাদার ব্যক্তির বসা অবস্থায় মলদ্বার বেরিয়ে আসলে পানি ব্যবহারের পর ঐ পানি না মুছে দাঁড়ালে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ তাতে গুহ্যদ্বার দিয়ে পেটের ভিতর পানি প্রবেশের আশংকা থাকে।

ফকীহ্‌গণ একথাও বলেছেন যে, রোযাদার ব্যক্তি ইস্‌তিনজা করার সময় শ্বাস গ্রহণ করবে না। কেননা এতে পেটের ভিতর পানি ঢুকার আশংকা আছে। রোযাদার ব্যক্তি যদি ইস্‌তিনজার সময় এত বেশী পানি ব্যবহার করে যে, যাতে পানি মলদ্বারের ভেতরে ঢুকে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রোযা অবস্থায় কাউকে জোরপূর্বক সঙ্গম করানো হলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবেনা। অনুরূপ কোন মহিলা যদি কোন পুরুষকে জোরপূর্বক সঙ্গম করতে বাধ্য করে তাহলে উক্ত পুরুষের উপরও কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। স্ত্রীকে চুম্বন করার পর বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। স্ত্রী স্বামীকে চুম্বন করলে যদি আদ্রতা দেখতে পায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ আদ্রতা না দেখে শুধু তৃপ্তি অনুভূত হলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

নিজ স্ত্রীকে স্পর্শ করা, একত্রে মিলিতভাবে শয়ন করা, মুসাফাহা করা এবং মু'আনাকা করা এগুলো সব চুমু দেওয়ার মতই অর্থাৎ স্ত্রীকে চুমু দিলে যে হুকুম হয় এসকল ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কাপড়ের উপর দিয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি স্ত্রীর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করে তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। রোযা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি হস্তমৈথুন করে এবং এতে বীর্য নির্গত হয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ স্ত্রীর দ্বারা হস্ত মৈথুন করিয়ে বীর্যপাত করানো হলে তাতেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাহ্‌রী খাওয়ার পর পান মুখে ঘুমিয়ে পড়লে এবং সুবহে সাদিকের পর জাগ্রহ হলে এ রোযা সহীহ্ হবেনা। কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না (তাতার খানিয়া, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

ঘুমন্ত মহিলার সাথে সহবাস করলে মহিলার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে এবং পুরুষের উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। ক্ষণে ভাল ক্ষণে পাগল এ জাতীয় কোন মহিলা যদি সুস্থ অবস্থায় রোযার নিয়্যত করে এবং পরে যদি তার সাথে কেউ যিনা করে তবে তার উপরও কাযা ওয়াজিব হবে এবং পুরুষের উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরায় পানাহার করে তবে তার রোযা অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

বমি হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করলে রোযা অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাতে কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর এতে রোযা ভঙ্গ হয় না এ কথা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত রোযা ছেড়ে পানাহার করলে তাতে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। স্বপ্নদোষ হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করলে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য স্বপ্ন দোষের হুকুম জানা সত্ত্বেও এরূপ করলে কাফ্ফারা ও ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রামাযান মাসে কোন কারণবশত যদি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলেও দিনের বেলায় রোযাদারের ন্যায় পানাহার বন্ধ রাখা ওয়াজিব (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

## যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়

রামাযান মাসে নিয়্যত করে রোযা রাখার পর ওজর ব্যতীত স্বেচ্ছায় তা ভঙ্গ করলে ঐ রোযার কাযাও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। মলদ্বার বা যোনিদ্বার দিয়ে যৌনচারিতায় লিপ্ত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। বীর্যপাত হোক বা না হোক কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। মহিলা যদি স্বেচ্ছায় পুরুষের সাথে এ কাজে লিপ্ত হয় তবে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। জোরপূর্বক আরম্ভ করার পরে মহিলা যদি স্বেচ্ছায় এ কাজে রাযী হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রেও কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে। কোন মহিলা যদি কোন বালক বা পাগলকে সুযোগ দেয় এবং তারা যদি তার সাথে যিনা করে তবে উক্ত মহিলার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য বা ঔষধ গ্রহণ করলে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্য বা পানীয় জাতীয় কোন কিছু পানাহার করে তাহলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

যে সব গাছের পাতা সাধারণত ভক্ষণ করা হয় তা ভক্ষণ করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে। শাক-সব্জির হুকুমও অনুরূপ। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শুধু লবণ খেলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। রোযা অবস্থায় শিংগা লাগনোর পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

চোখে সুরমা ব্যবহার করা অথবা শরীরে বা গোঁফে তৈল মাখার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। মিস্ওয়াক করার পর রোযা

www.pathagar.com

ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

পরনিন্দা করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

কোন ঘুমন্ত মহিলার সাথে সহবাস করা হলে পুরুষের উপর কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (শামী)।

রামাযান মাসে রোযার নিয়্যত করে রোযা আরম্ভ করে ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। রামাযান ছাড়া অন্য কোন রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ রামাযানের রোযার নিয়্যত করার পূর্বে রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

## যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

রোযাদার ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করে তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয় না। এ ক্ষেত্রে ফরয ও নফল রোযার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি রোযাদার ব্যক্তিকে ভুলবশত পানাহার করতে দেখে এবং তাকে সবল ও রোযা রাখতে সক্ষম মনে করে সে ক্ষেত্রে তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। স্মরণ না করানো মাকরূহ তাহরিমী। আর যদি তাকে দুর্বল মনে হয় তবে তাকে রোযার কথা স্মরণ না করানোও জায়িয আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযার দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কোন মহিলার প্রতি কামভাবের দৃষ্টিতে তাকানোর ফলে বীর্যপাত ঘটলে রোযা ভঙ্গ হবে না। রোযা অবস্থায় সুরমা, তৈল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলেও রোযা ভঙ্গ হয় না (কুদূরী)।

দাঁতের ফাঁকে চনা বুটের চেয়েও ছোট কোন বস্তু আটকিয়ে থাকলে এবং তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা তিল গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবেনা। গমের দানা চিবালে এতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

রোগ ব্যধির কারণে মুখ থেকে পানি নির্গত হয়ে থুথুর সাথে পুনরায় মুখের ভেতর ঢুকলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কুলি করার পর মুখের ভিতর যে পানি লেগে থাকে তা থুথুর সাথে গলাধঃকরণ করলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মস্তক থেকে কফ নাকে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে টেনে তা যদি গলাধঃকরণ করা হয় তবে তাতে রোযা নষ্ট হবেনা। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে মিশে কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলে এবং থুথুর পরিমাণ বেশী হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। মশা-মাছি রোযাদারের পেটে ঢুকলে রোযা নষ্ট হবে না। ধুলা বালি, ধূঁয়া বা ঔষধের স্বাদ রোযাদারের কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করতে তাতে রোযা ভঙ্গ হবেনা। দু'এক ফোটা চোখের পানি গলার ভেতর ঢুকলে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। শরীরের ঘাম মুখে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবেনা। গোসলের পর দেহে ঠাণ্ডা অনুভূত হলে রোযা ভঙ্গ হবেনা। চোখে ঔষধ দেওয়ার পর গলার ভিতর স্বাদ অনুভূত হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। চোখে সুরমা ব্যবহার করার পর থুথুতে সুরমার রং প্রকাশ পেলে অধিকাংশ ফকীহ্ এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না। অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে সামান্য হোক

www.pathagar.com

বা মুখ ভরে হোক এতে রোযা ভঙ্গ হবেনা। অনুরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সামান্য পরিমাণ বমি করলে তাতেও রোযা ভঙ্গ হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কানের ভিতর ফোটা ফোটা করে পানি ঢাললে রোযা ভঙ্গ হবেনা। পুরুষের প্রস্রাব নালীতে ফোটা ফোটা করে কোন কিছু ঢাললে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কোন যৌন কল্পনায় কামউত্তেজনার কারণে বীর্যপাত ঘটলে রোযা ভঙ্গ হবে না। মহিলা তার স্বামীকে স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে তাতেও রোযা ভঙ্গ হবেনা (আলমগীরী, ১মখণ্ড)।

রোযা অবস্থায় কাঠি দ্বারা কান চুলকানোর পর কান থেকে ময়লা বের হলে রোযা ভঙ্গ হবে না (মারাকিল ফালাহ্)।

কারো স্বামী বদ মেজাজ হলে এবং তরকারিতে লবণ কমবেশী হওয়ার ফলে তার প্রতি যুলুম করার আশংকা থাকলে জিহ্বায় অগ্রভাগ দ্বারা তরকারির লবণ দেখে নেওয়াতে রোযা নষ্ট হবে না (বেকায়া ১ম খণ্ড)।

অনন্যোপায় হলে খাদ্য চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়া জায়িয আছে। এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। পরে মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে (শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় মিস্ওয়াক করা জায়িয। এতে রোযা নষ্ট হয় না (মারাকিল ফালাহ্, ১ম খণ্ড)

এমনকি যদি নিমের কাঁচা ডালের দ্বারা মিস্ওয়াক করা হয় এবং এতে এর তিক্ততার স্বাদ মুখে অনুভূত হয় তবেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

রামাযানের রাতে গোসল ফরয হওয়ার পর দিনে গোসল করলে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবেনা। এমনকি সারা দিন গোসল না করলেও রোযার কোন ক্ষতি হবেনা। অবশ্য ফরয গোসল অকারণে দেরীতে করার গুনাহের কাজ (নূরুল ঈযাহ্)।

## রোযা অবস্থায় যে সব কাজ মাকরূহ

রোযা অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো মাকরূহ ঃ

১. রোযা অবস্থায় গন্ধ জাতীয় বস্তু চিবানো,

২. বিনা ওযরে কোন কিছু চিবানো বা কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা,

৩. কোন বস্তু খরিদ করার সময় জিহ্বা দ্বারা এর স্বাদ গ্রহণ করা। যেমন মধু, তৈল ইত্যাদি,

৪. শৌচকর্ম সম্পাদনে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা,

৫. কুলি করার সময় গড়াগড়া করা এবং নাকে পানি দেওয়ার সময় নাকের ভেতর পানি টেনে নেওয়া,

৬. পানিতে নেমে গোসল করার সময় বায়ু নির্গত করা,

৭. মুখে থুথু জমিয়ে তা গিলে ফেলা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড),

৮. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা,

www.pathagar.com

৯. কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে না করলে এ অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বা তার সাথে কোলাকুলি করা,

১০. যে কাজ করলে রোযাদার দুর্বল হয়ে রোযা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এমন কাজ করা। যেমন শিংগা লাগানো অথবা অত্যাধিক কষ্টসাধ্য কোন কাজ করা (মারকিল ফালাহ্ ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড),

১১. এমন বিলম্বে সাহ্‌রী খাওয়া যে, সময়ের ব্যাপারে সন্দেহ এসে যায় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড),

১২. রোযা অবস্থায় কয়লা বা মাজন দ্বারা দাঁত মাজা,

১৩. বিনা ওযরে রোযা অবস্থায় শিশু সন্তানের খাওয়ার জন্য কোন কিছু চিবিয়ে দেওয়া (মারাকিল ফালাহ্)।

## রোযা অবস্থায় যেসব কাজ মাকরূহ নয়

রোযা অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা মাকরূহ নয় ঃ

১. মিস্‌ওয়াক করা। রোযা অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যা তথা সব সময় মিস্‌ওয়াক করা জায়িয। কাঁচা বা শুকনা যে কোন ধরণের ডাল দ্বারা মিস্‌ওয়াক করা যাবে।

২. চোখে সুরমা ব্যবহার করা। এবং গোঁদে তৈল মালিশ করা। যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকে তবে এগুলো ব্যবহার করা জায়িয। আর যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকে তবে মাকরূহ।

৩. শিংগা লাগানো। যদি তাতে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা না থাকে তবে তা মাক্‌রূহ হবেনা। আর যদি দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকে তবে মাকরূহ হবে। তাই দিনে শিংগা না লাগিয়ে সূর্যাস্তের পর শিংগা লাগানো শ্রেয়।

৪. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বা তার সাথে কোলাকুলি করা, যদি এতে সহবাসে লিপ্ত হওয়া বা বীর্যপাত হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৫. রোযা অবস্থায় কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়া,

৬. গোসল করা,

৭. শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা (মারাকিল ফালাহ)

৮. স্বামী বদ মিজাজ হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা খাদ্যের স্বাদ চেখে দেখলে রোযা মাকরূহ হবেনা।

৯. অনন্যোপায় অবস্থায় রোযাদার মা কোন কিছু চিবিয়ে শিশুকে আহার করালে রোযা মাকরূহ হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## যে সব ওযরে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয

কেউ যদি রোযা অবস্থায় হঠাৎ এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে রোযা রাখলে জীবন নাশের আশংকা দেখা দিতে পারে বা রোগ বেড়ে যেতে পারে এ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেওয়া

www.pathagar.com

ক্ষুধা বা পিপাসায় প্রাণ যায় এরূপ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়িয (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও মারাকিল ফালাহ্)।

রোযা অবস্থায় গর্ভবতী মহিলার যদি নিজের বা সন্তানের প্রাণ-নাশের আশংকা হয় তবে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয (শরহুল বিদায়া)।

কষ্টসাধ্য কোন কাজের কারণে কাতর হয়ে যদি ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দেয় তবে রোযা ছেড়ে দেওয়া দুরস্ত আছে। অবশ্য রোযাদার অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন ছাড়া স্বেচ্ছায় এরূপ কঠিন কাজে লিপ্ত হওয়া গুনাহের কাজ।

উপরোক্ত অবস্থায় ওযরের কারণে রোযা ছেড়ে দিলে পরবর্তী সময়ে তার কাযা করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় যদি এমন ক্ষুধা বা পিপাসা লাগে যে প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দেয় অথবা জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়ে যায় তবে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ওযরের কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়িয। অবশ্য পরে তা কাযা করে নিতে হবে। যিয়াফতও এক ধরণের ওযর। অতএব মেযবান যদি আহার না করলে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয। পরে কাযা করে নিতে হবে। অবশ্য মেযবান যদি শুধু উপস্থিতির উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং আহার করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি না করে তবে রোযা ভঙ্গ করবে না।

শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র.) বলেন, পরে কাযা করতে পারবে বলে ইয়াকীন থাকলে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়িয হবে। যদি কাযা করতে পারবে বলে ইয়াকীন না থাকে তাহলে মেযবানের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রোযা ভঙ্গ করা জায়িয হবে না। দ্বিপ্রহরের আগে এরূপ অবস্থা ঘটলে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পরে ঘটলে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয হবে না তবে পিতামাতা অথবা স্বামীর নির্দেশে দ্বিপ্রহরের পরও নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়িয।কাযা ও ওয়াজিব রোযার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণ সমূহ ওযর হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## যে সব কারণে রোযা না রাখা জায়িয

সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি আরোপ করেন না। এটাই তাঁর নিয়ম। কাজেই মাযূর লোকদের জন্য রামাযান মাসে রোযা না রেখে পরবর্তী সময় রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। সফর, অসুস্থতা, গর্ভবতী হওয়া, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে স্তন্য দান, হয়িয নিফাস, অথবা অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে রামাযান মাসে রোযা না রাখা জায়িয।

কেউ যদি রামাযান মাসে আটচল্লিশ মাইল সফরের নিয়্যতে সুবহে সাদিকের পূর্বে নিজ বাড়ি থেকে বের হয় তবে সফরের অবস্থায় তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। পরে এর কাযা করতে হবে। দিনের বেলা সফর আরম্ভ করলে ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়িয নেই রোযা রেখে সফর শুরু করত রোযা ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। বাড়ীতে অবস্থানকালে রোযা রাখার পর রোযা ভঙ্গ করে সফর আরম্ভ করলে কাযা কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

দিনের প্রথমাংশে স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার পর কেউ যদি জোরপূর্বক সফরে প্রেরণ করে

www.pathagar.com

সে ক্ষেত্রে কাফ্ফারা রহিত হবে না। রামাযান মাসে রোযাদার অবস্থায় সফরে বের হওয়ার পর কোন প্রয়োজনে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে দিনের বেলা পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযা রাখা যদি মুসাফিরের কষ্ট না হয় এবং অধিকাংশ সফর সংগীরা যদি রোযাদার হয় আর তাদের ব্যয় যদি যৌথভাবে নির্বাহ না করা হয় তবে রোযা রাখা উত্তম। পক্ষান্তরে যদি রোযা রাখা কষ্ট হয় এবং সফর সংগীরা যদি রোযাহীন হয় অথবা তাদের ব্যয় যদি যৌথভাবে নির্বাহ করা হয় তাহলে রোযা না রাখাই উত্তম। সফরের অবস্থায় রোযা রাখায় প্রাণ নাশের আশংকা হলে রোযা না রাখা ওয়াজিব (মারাকিল ফালাহ্)।

রোগীর জন্য রামাযান মাসে রোযা না রাখা জায়িয। অসুস্থ ব্যক্তি যদি প্রাণ নাশের অথবা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তবে তার জন্য রোযা না রাখা জায়িয। যদি রোগ বেড়ে যাওয়া অথবা রোগ দীর্ঘ স্থায়ী হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলেও রোযা না রাখা জায়িয। পরে এর কাযা করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়ে রোগী নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে। তবে তা শুধু অনুমান ভিত্তিক হলে গ্রহণযোগ্য হবে না বরং রোগের আলামত কিংবা অভিজ্ঞতা অথবা ফাসিক নয় এমন কোন বিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে নিশ্চিত ধারণা হলেই এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন সুস্থ ব্যক্তির প্রবল আশংকা জাগে যে, রোযা রাখলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে তবে তার জন্য উপরোক্ত রোগীর হুকুম প্রযোজ্য হবে। পালা জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট দিনে জ্বর আসার পূর্বে এই ওযরে রোযা ভঙ্গ করে পানাহার করার অবকাশ আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

গর্ভবতী হওয়া এবং স্তন্যদান করার ওযরেও রোযা না রাখা জায়িয। গর্ভবতী এবং স্তন্যদান কারীনী মহিলা যদি সন্তান অথবা নিজের প্রাণ বিপন্ন হওয়ার আশংকাবোধ করে তবে তাদের জন্য রোযা না রাখা জায়িয। পরে এ রোযা কাযা করে নিবে। তাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

হায়িয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা জায়িয নেই। রোযা রাখার পর হায়িয আসবে ধারণায় কোন মহিলা যদি রোযা ভেংগে ফেলে পরে তার হায়িযও আসল না তাহলে তার উপর কাযাও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। হায়িযের সর্বোচ্চ সময় সীমা দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর রাতে হায়িয বন্ধ হলে সুবহে সাদিক হতে রোযা আরম্ভ করবে। যদি দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে হায়িয বন্ধ হয় আর গোসলের পর সুবহে সাদিকের পূর্বে কিছু সময় পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে তার উপর এ দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব। গোসল সমাপ্ত করার সাথে সথেই সুবহে সাদিক হয়ে গেলে রোযা রাখবে না তবে কোনরূপ পানাহার করবে না। বরং পূর্ণ দিন রোযাদারের ন্যায় কাটাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও আলজাওহারতুন নায়্যারা)।

বার্দ্ধক্যের কারণেও রোযা না রাখা জায়িয। অতিশয় বার্দ্ধক্যে উপনীত ব্যক্তি যে রোযা রাখতে সক্ষম নয় সে রোযা না রেখে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে খাওয়াবে। বৃদ্ধা মহিলারও এ-ই হুকুম। অতিশয় বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। এ ফিদ্য়া রামাযানের প্রথম দিকে বা শেষ দিকে যে কোন সময় ইচ্ছা এক সাথে আদায় করতে পারে। ফিদ্য়া আদায় করার পর রোযা রাখতে সক্ষম হলে সে

www.pathagar.com

দিনগুলোর কাযা করতে হবে এবং আদায়কৃত ফিদ্য়ার হুকুম বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি অসুস্থতা বা সফরের কারণে রামাযানের রোযা ছুটে যায় এবং অসুস্থতা বা সফর অব্যাহত থাকে আর এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা যায় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য সে যদি মিস্কীনদেরকে খানা খাওয়ানোর অসিয়্যাত করে যায় তবে অসিয়্যাত সহীহ্ হবে। যদিও তা তার উপরে ওয়াজিব ছিল না। এমতাবস্থায় ওলী মৃত ব্যক্তির পরিত্যজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে মিস্কীনদের খাওয়াবে। রোগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ীতে আসার পর মৃত্যুর পূর্বে যদি এ পরিমাণ সময় পায় যে সময়ের মধ্যে ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করা যায় তবে ঐ সকল রোযার কাযা করা তার উপর ওয়াজিব। কাযা না করে থাকলে মৃত্যুর পূর্বে ফিদ্য়া প্রদান করার অসিয়্যাত করে যাওয়া ওয়াজিব। ওলীকে সে অসিয়্যাত আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রতি রোযার ফিদ্য়া এক এক ফিত্রার সমান। কিন্তু অসিয়্যাত না করলে ও ওয়ারিশগণ ফিদ্য়া আদায় করে দিতে পারে। যদিও তা তাদের উপর আদায় করা ওয়াজিব নয়। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওলী বা ওয়ারিস অন্য কারোর রোযা রাখা জায়িয নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রুগী সুস্থ হওয়ার পর অথবা মুসাফির বাড়ীতে ফিরে আসার পর মারা গেলে যতদিন সুস্থ ছিল বা বাড়ীতে মুকীম ছিল তত দিনের কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে। বিগত রামাযানের ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করার পূর্বেই পুনরায় রামাযান মাস এসে যায় সেক্ষেত্রে রামাযানের রোযাই রাখতে হবে। রামাযানের শেষে বিগত বছরের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন মুজাহিদ যদি নিশ্চিতভাবে জানে যে রামাযান মাসে তাকে জিহাদ করতে হবে এমতাবস্থায় রোযা রাখার কারণে তার দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তার জন্য রোযা না রাখা জায়িয। যদি পরে যুদ্ধ না হয় তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না কাযা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১মখণ্ড)।

## 'ইয়াওমুশ্ শক্'-এ রোযা রাখার হুকুম

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে ২৯শে শা'বান সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা না গেলে অথবা চাঁদ দেখার সংবাদ শরীয়াতের দৃষ্টিতে প্রমাণিত না হলে পরের দিনটি শা'বান মাসের না রামাযানের তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তাই সেদিনটিকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'ইয়াওমুশ্ শক্' (সন্দেহের দিন) বলা হয়।

'ইয়াওমুশ্ শক' এ রামাযানের ফরয নিয়্যতে অথবা কোন ওয়াজিব নিয়্যাতে অথবা এরূপ দ্বিধাযুক্ত নিয়্যাতে রোযা রাখলে তা মাকরূহ হবে।

যদি বিশেষ বিশেষ ব্যাক্তিবর্গ নফলের নিয়্যাতে রোযা রাখে অথবা আদত অনুযায়ী নফল রোযা রাখে তাহলে মাকরূহ হবেনা।

'ইয়াওমুশ্ শক' -এ (২৯শে শা'বান) রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে বিধান নিম্নরূপ ঃ

১. রামাযানের নিয়্যতে রোযা রাখা ঃ

'ইয়াওমুশ্ শক'-এ রামাযানের রোযার নিয়্যতে রোযা রাখা মাকরূহ। যদি কেউ এই দিনে

www.pathagar.com

রোযা রাখে এবং প্রমাণিত হয় যে দিনটি রামাযানেরই তবে রোযাটি রামাযানের ফরয রোযা বলে গন্য হবে। আর যদি দিনটি শা'বানের বলে প্রমাণিত হয় তবে ঐ রোযাটি নফল বলে গন্য হবে। এবং তা ভঙ্গ করলে কাযা করতে হবে না।

২. রামাযান ছাড়া অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যতে রোযা রাখা ঃ

'ইয়াত্তমুশ্ শক '-এ কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যতে রোযা রাখা মাকরূহ। যদি কেউ তা রাখে এবং প্রমাণিত হয়যে দিনটি রামাযানের তবে তা রামাযানের ফরয রোযা বলে গন্য হবে। আর দিনটি শা'বানের বলে প্রমাণিত হলে তখন যে নিয়্যতে রোযা রাখা হয়েছে তাই আদায় হবে।

৩. নফলের নিয়্যতে রোযা রাখা ঃ

যদি কারো পুরো শা'বান মাস অথবা শা'বানের শেষ তিন দিন রোযা রাখার অভ্যাস থাকে তবে তার জন্য 'ইয়াত্তমুশ্ শক' -এ রোযা রাখা উত্তম। মুফ্তী-ফকীহ্গণের জন্য এই দিনে রোযা রাখা উত্তম। আর সর্বসাধারণ 'ইয়াত্তমুশ্ শক্' -এ দুপুর পর্যন্ত পানাহার বর্জন করে দিনটি রামাযানের প্রমাণিত না হলে রোযা রাখবে না।

৪. রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে রোযা রাখা ঃ

'ইয়াত্তমুশ্ শক্' -এ যদি কেউ এরূপ নিয়্যত করে যে যদি দিনটি রামাযানের হয় তবে রোযা রাখব না। এরূপ দ্বিধাযুক্ত নিয়্যতে পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকলে তা রোযা বলে গন্য হবে না।

৫. কোন প্রকারের রোযা রাখবে এনিয়ে দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় রোযা রাখা ঃ

'ইয়াওমুশ্ শক্' -এ যদি এরূপ নিয়্যত করে যে, যদি দিনটি রামাযানের হয় হবে আমার এ রোযা হবে রামাজানের ফরয রোযা আর যদি দিনটি শা'বানের হয় তবে তা হবে অন্য কোন ওয়াজিব রোযা। এরূপ নিয়্যতে ঐদিন রোযা রাখা মাকরূহ। পরে দিনটি রামাযানের বলে প্রমাণিত হলে রোযাটি রামাযানের ফরয রোযা বলে গন্য হবে আর দিনটি শা'বানের প্রমাণিত হলে রোযাটি নফল বলে গন্য হবে, অন্য কোন ওয়াজিব হিসাবে নয়। অবশ্য এই নফল রোযা ভঙ্গ করা হলে তার কাযা ওয়াজিব হবে না।

যদি কেউ এরূপ নিয়্যত করে যে, দিনটি রামাযানের হলে রামাযানের ফরয রোযা আর শা'বানের হলে নফল রোযা। এরূপ নিয়্যতে ও রোযা রাখা মাকরূহ। তবে এ অবস্থায় দিনটি রামাযানের প্রমাণিত হলে রোযাটি রামাযানের ফরয রোযা হিসাবে গন্য হবে। আর দিনটি শা'বানের প্রমাণিত হলে রোযাটি নফল বলে গন্য হবে। এ নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে কাযা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

## কাযা রোযা

যদি ওযরবশত রামাযানের সব রোযা অথবা কয়েকটি রোযা ছুটে যায় তবে যথাশীঘ্র তার কাযা করতে হবে। বিনা কারণে কাযা করতে দেরী করলে গুনাহগার হবে। কাযা রোযা একাধারে কিংবা পৃথক পৃথক উভয় ভাবেই রাখা জায়িয (কুদূরী)।

www.pathagar.com

কাযা রোযা রাখার ক্ষেত্রে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে নিয়্যত করা জরুরী নয়। যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে সে কয়টি রোযা রাখলেই যথেষ্ট হবে। যদি ঘটনাক্রমে দুই বা ততোধিক রামাযানের কাযা একত্র হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রে বছর নির্দিষ্ট করেই নিয়্যত করতে হবে। যে, 'আমি অমুক বছরের রামাযানের রোযার কাযা আদায় করছি' (শামী, ২য় খণ্ড)।

কাযা রোযার জন্য রাত্রে নিয়্যত করা জরুরী। সুব্হে সাদিকের পর কাযা রোযার নিয়্যত করলে কাযা সহীহ্ হবে না বরং ঐ রোযা নফলরূপে গন্য হবে। কাযা পুনরায় রাখতে হবে (কুদূরী)।

কোন ব্যক্তি যদি পূর্ণ রামাযান পাগল অবস্থায় থাকে তাহলে সুস্থ্ হওয়ার পর তাকে এ রোযার কাযা করতে হবে না। কিন্তু মাসের মধ্যখানে সুস্থ্ হয়ে গেলে পরবর্তী রোযাগুলো তাকে রাখতে হবে। সাথে সাথে পূর্বের দিনগুলোর কাযাও করতে হবে। কোন পাগল ব্যক্তি যদি রামাযানের শেষ দিন দ্বিপ্রহরের পর সুস্থ্ হয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ যদি রামাযানের পূর্ণ মাস বেহুশ থাকে তবে সুস্থ্ হওয়ার পর তাকে এ রোযার কাযা করতে হবে।

যদি কেউ রামাযানের কোন একদিন সূর্যাস্তের পর এ অবস্থায় বেহুশ বা পাগল হয় যে পরের দিন তার রোযা রাখার নিয়্যত ছিল আর এই বেহুশী অবস্থায় যদি তার কয়েক দিন কেটে যায় তবে বেহুশ হওয়ার রাতের পরের দিনটি রোযা বলে গন্য হবে বাকী দিনগুলির রোযা কাযা করতে হবে।

তবে যদি পরের দিনটির রোযা রাখার নিয়্যত না থেকে থাকে তবে ঐ দিনের রোযার ও কাযা করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি বেহুশ ব্যক্তিকে দিনের বেলায় ঔষধ সেবন করানো হয় এবং তা গলার ভিতর ঢুকে যায় তবে এই দিনের রোযাও কাযা করতে হবে (মুলতাকাল আবহুর)।

## রোযার কাফ্ফরা সম্পর্কিত মাসাইল

রামাযান মাসে রোযা রাখার পর বিনা ওযরে, ইচ্ছাকৃতভাবে তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। রোযার কাফ্ফারা যিহারের কাফ্ফারার মতই। কাফ্ফারা হল, একটি গোলাম আযাদ করা। সম্ভব না হলে একাধারে ষাট দিন রোযা রাখা। তাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিস্কীনকে দু'বেলা আহার করানো।

গোলাম আযাদ করতে অক্ষম হলে একাধারে ষাটদিন রোযা রাখতে হবে। ভেঙ্গে ভেঙ্গে কিছু কিছু করে রোযা রাখা জায়িয নেই। যদি ঘটনাক্রমে মাঝে দুই এক দিন বাদ পড়ে যায় তবে পুনরায় আরম্ভ করে ষাটটি পূর্ণ করতে হবে। তবে এই ষাট দিনের মধ্যে যদি কোন মহিলার হায়িয আরম্ভ হয়ে যায় তবে পূর্বের রোযাগুলোও হিসাবে ধরা হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

নিফাসের কারণে যদি রোযা ভঙ্গ করতে হয় তবে পূর্বের রোযাসমূহ ধর্তব্য হবেনা। নতুনভাবে পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে (শামী)।

www.pathagar.com

রোগের কারণে যদি কাফ্ফারার রোযা ভঙ্গ করতে হয় সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে। যদি মাঝে রামাযান মাস এসে যায় তবে রামাযান মাসের পর কাফ্ফারার রোযা আদায় হবে না। নতুনভাবে আবার ষাটটি রোযা রাখতে হবে (শামী)।

বার্দ্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে কেউ যদি কাফ্ফারার রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে এর পরিবর্তে ষাটজন মিস্কীনকে পেটভরে দুই বেলা আহার করাতে হবে।

এই ষাটজন মিস্কীনের প্রত্যেকেই বালেগ হতে হবে। কোন নাবালিগকে কাফ্ফারার খাদ্য খাওয়ানো হলে তা হিসাবে গন্য হবে না। এর পরিবর্তে সমসংখ্যক বালিগ মিস্কীনকে খাওয়াতে হবে (শামী)।

খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেক মিস্কীনকে 'সাদাকাতুল ফিত্র' পরিমাণ চাল বা আটা বা এর মূল্য প্রদান করলেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে (শামী)।

যার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে সে যদি অন্য কাউকে তার পক্ষ হতে কাফ্ফারা আদায় করার জন্য আদেশ করে এবং উক্ত ব্যক্তি তা আদায় করে দেয় তবে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে তার বিনা অনুমতিতে অন্য কেউ যদি তার পক্ষ হতে কাফ্ফারা আদায় করে তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

একজন মিস্কীনকে ষাটদিন পর্যন্ত দু'বেলা আহার করালে অথবা ষাট দিন পর্যন্ত এক জন মিস্কীনকে ষাটবার সাদকায়ে ফিত্রের সমপরিমাণ গম বা এর মূল্যে প্রদান করলে এতেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে (হিদায়া)।

একাধারে ষাট দিন আহার না করিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আহার করালেও কাফ্ফারা আদায় হবে (মারাকিল ফালাহ্)।

ষাট দিনের গম বা আটা অথবা এর মূল্য হিসাব করে যদি একই দিনে তা কোন এক মিস্কীনকে প্রদান করা হয় তবে তাতে একদিনের কাফ্ফারা আদায়ে হবে বাকী ঊনষাট দিনের কাফ্ফারা পুনরায় পুনঃ আদায় করতে হবে (শামী)।

কোন মিস্কীনকে সাদাকায়ে ফিত্রের পরিমাণ হতে কম প্রদান করলে তাতে কাফ্ফারা আদায় হবে না ( বাহরুর রাইক)।

একটি রোযা ভঙ্গ করলে একটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে একাধিক রোযা ভঙ্গ করলেও একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হবে। একটি কাফ্ফারার পরিমাণ ষাট জন মিস্কীনকে দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে আহার করানো। কিন্তু কাযার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ একাধিক রোযা ভঙ্গ করার অবস্থায় প্রত্যেকটি রোযারই কাযা ওয়াজিব হবে। অবশ্য দুই রামাযানের দু'টি রোযা ভঙ্গ করলে দু'টি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি কাফ্ফারা যথেষ্ট হবেনা (শামী)।

## ফিদ্য়ার মাসাইল

অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে অক্ষম অথবা এমন রুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার আশা করা যায় না তাদের ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান হল – তারা রোযার পরিবর্তে ফিদ্য়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে

www.pathagar.com

অথবা সাদাকায়ে ফিত্রের সমপরিমাণ গম, যব, খেজুর বা তার বাজার মূল্য কোন মিস্কীনকে প্রদান করবে (শামী)।

একটি পূর্ণ ফিদ্য়া একজন মিস্কীনকে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি একটি ফিদ্য়া ভাগ করে একাধিক মিস্কীনকে প্রদান করা হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তা ও দুরস্ত আছে (শামী)।

বৃদ্ধ যদি পুনরায় কখনো রোযা রাখার শক্তি ফিরে পায় অথবা নিরাশ রুগ্ন ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে এবং রোযা রাখতে সক্ষম হয় তবে যেসব রোযার ফিদ্য়া প্রদান করা হয়েছে পুনরায় এগুলোর কাযা করতে হবে। আর যে ফিদ্য়াটা সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে (শামী ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কারো যিম্মায় কাযা রোযা থাকলে সে যদি তার ওয়ারিসদেরকে অসিয়্যাত করে যায় যে আমার এতগুলো রোযার কাযা আছে, তোমরা এ ফিদ্য়া আদায় করে দিবে। এরূপ অসিয়্যাত করে গেলে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার পর ঋণ পরিশোধ করে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা সম্পূর্ণ ফিদ্য়া আদায় করা সম্ভব হলে তা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে। ফিদ্য়ার পরিমাণ যদি তার অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী হয় তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদ দ্বারা যে পরিমাণ ফিদ্য়া আদায় করা যায় ঐ পরিমাণই আদায় করা ওয়াজিব হবে। অতিরিক্ত পরিমাণ ফিদ্য়া আদায় করা ওয়ারিসদের উপর ওয়াজিব নয়। বাকী ফিদ্য়া আদায় করতে অতিরিক্ত যে সম্পদ লাগবে তার জন্য ওয়ারিসদের অনুমতি জরুরী হবে (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়্যাত না করে যায় এবং এমতাবস্থায় যদি তার ওলী ওয়ারিসগন নিজেদের মাল থেকে তার নামায রোযার ফিদ্য়া আদায় করে দেয় তবে তা জায়িয হবে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো নিজগুণে তা কবুল করে নিবেন এবং তার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। মৃত ব্যক্তির অসিয়্যাত না করা অবস্থায় তার পরিত্যক্ত মাল থেকে ফিদ্য়া আদায় করা জায়িয নেই। অনুরূপ ফিদ্য়ার পরিমাণ যদি তার মালের এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশী হয় তবে অসিয়্যাত করা সত্ত্বেও ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া অতিরিক্ত ফিদ্য়া পরিত্যাক্ত মাল দ্বারা পরিশোধ করা জায়িয হবে না। অবশ্য দি ওয়ারিসগণ সকলেই খুশী মনে অনুমতি দেয় তবে পরিত্যক্ত মাল থেকে ও অবশিষ্ট ফিদ্য়ার অবশিষ্ট আদায় করা জায়িয হবে। কিন্তু নাবালিগ ওয়ারিসের অনুমতি শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব বালিগ ওয়ারিসগণ যদি নিজেদের অংশ পৃথক করে নিয়ে তার থেকে ফিদ্য়ার অতিরিক্ত অংশ আদায় করে তবে জায়িয হবে (শামী আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ওলীর জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে নামায ও রোযার কাযা আদায় করা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কোন ওয়ারিস যদি মৃত ব্যক্তি পক্ষ হতে রোযা রাখে বা নামায পড়ে এতে তার কাযা আদায় হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া ১ম খণ্ড)।

রোযা পালনে অক্ষম এবং ফিদ্য়া আদায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও প্রকাশ্যে মানুষের সামনে পানাহার করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

## মুসাফিরের রোযা

সফরে থাকাকালীন অবস্থায় মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখা জায়িয আছে। অবশ্য পরে এর কাযা করে নিতে হবে।

সফরের অবস্থায় রোযা রাখলে যদি কোন ক্ষতি না হয় তবে রোযা রাখা উত্তম। যদি ক্ষতি হয় তবে রোযা না রাখাই উত্তম (শারহুল বিদায়া ও নূরুল ঈযাহ্)।

রোযা অবস্থায় দিনে সফর আরম্ভ করলে ঐদিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়িয নেই ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। সফর করার ইচ্ছায় সফরে বের হওয়ার পূর্বে কেউ যদি রোযা ভঙ্গ তার প্রতি কাযা কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে। রামাযান মাসে সফর আরম্ভ করে কোন কিছু নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ীতে এসে পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুসাফির ব্যক্তি সফরে বের হওয়ার পর কোথাও পনের দিন বা ততোধিক দিন যদি অবস্থানের নিয়্যত করে তবে সেখানে থাকাকালে রোযা না রাখা তার জন্য জায়িয নেই। অবশ্য পনের দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়্যত করলে রোযা না রাখা দুরস্ত হবে (শামী)।

কোন ব্যক্তি সফর অবস্থায় রোযা রাখেনি। বাড়ি প্রত্যাবর্তন করে ঐ রোযার কাযা না করে কয়েক দিন পরেই মারা গেছে। এ ক্ষেত্রে যে কয়দিন সে জীবিতবস্থায় বাড়িতে ছিল ঐ কয়েক দিনের কাযাই তার উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু পুরা রোযা কাযা করার মত সময় সে পায়নি। এ কয়দিনের ফিদ্য়া আদায়ের অসিয়্যাত করে যাওয়া তার প্রতি ওয়াজিব।

সফর থেকে বাড়ী আসার পর যে কয়দিন সে জীবিত ছিল ছুটে যাওয়া রোযার সংখ্যা এরচেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত দিনগুলোর ফিদ্য়া আদায় করার জন্য অসিয়্যাত করা তার উপর ওয়াজিব নয় (শারহুল বাদায়ে, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী)।

কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি সফরের অবস্থায় মারা যায় তাহলে সফরের কারণে তার যে কয়েকটি রোযা ছুটেছে এর ফিদ্য়া আদায় করার জন্য অসিয়্যাত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, সে কাযা রোযা রাখার সময় পায়নি (শামী)।

## রুগ্ন ব্যক্তির রোযা

অসুস্থ ব্যক্তি যদি জীবন বিপন্ন হওয়ার অথবা অঙ্গহানী ঘটার আশংকাবোধ করে তবে তার জন্য রোযা না রাখা জায়িয। অনুরূপ রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা রোগ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা থাকলেও রুগ্ন ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা জায়িয। রোগের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সুস্থ হওয়ার পর তার কাযা করতে হবে। রুগী নিজে রোগের আলামত অথবা নিজের অভিজ্ঞতা কিংবা ধার্মিক বিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে রোগ বৃদ্ধি জীবন বিপন্ন হওয়া বা অঙ্গহানীর প্রবল ধারনা হলেই রোযা না রাখা তার জন্য জায়িয হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোগ আরোগ্য হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা থাকা অবস্থায় রোযা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে তবে এ অবস্থায় রোযা না রাখা জায়িয আছে (শামী)।

কেউ যদি পীড়িত অবস্থায় মারা যায় তবে রোগের কারণে তার যে সব রোযা ছুটে গিয়েছে

www.pathagar.com

তার ফিদ্য়া আদায় করার জন্য অসিয়াত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা সে কাযা রোযা রাখার সময় পায়নি (শামী)।

রোগের কারণে কয়েক দিন রোযা রাখতে সক্ষম হয়নি এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভের কয়েকদিন পর মারা যায় তাহলে যে কয়েকদিনের রোযা তার ফাওত হয়েছে এ পরিমাণ সময় সে সুস্থ থাকলে উক্ত দিনগুলোর ফিদ্য়া আদায় করার জন্য অসিয়্যাত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। আর যে কয়েকদিন সে সুস্থ ছিল এর পরিমাণ যদি ছুটে যাওয়া রোযার অপেক্ষা কম হয় তবে যে কয় দিন সে সুস্থ ছিল সে কয়েকদিনের ফিদ্য়া আদায় করার অসিয়্যাত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু অতিরিক্ত দিন সমূহের অসিয়্যাত করা তার উপর ওয়াজিব নয় (শামী ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## মাযূর ব্যক্তির রোযা

যে সব অবস্থা শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওযর বলে স্বীকৃত এমন কোন ওযর কারো মধ্যে পাওয়া গেলে শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে 'মাযূর' বলা হয়।

ওযর দু' প্রকার হতে পারে ঃ

১. রোযা রাখার পর ওযর সৃষ্টি হওয়া,

২. রোযা আরম্ভ করার পূর্বে ওযর বিদ্যমান থাকা।

রোযা রাখার পর ওযর দেখা দিলে যেমন – কেউ হঠাৎ এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে এতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয় এ অবস্থায় তার জন্য রোযা ছেড়ে দেয়া জায়িয। এ ভাবে রোযা অবস্থায় যদি কোন মহিলার হায়িয আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে এ অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা জায়িয হবে না।

সফর, অসুস্থতা, গর্ভবতী হওয়া, দুগ্ধ পান করান হায়িয নিফাস জারী হওয়া এবং অতিশয় বার্দ্ধক্য ইত্যাদি শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওযর। এ গুলোর কোন একটি রোযার দিনের পূর্বে কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে মাযূর বলে গন্য হবে। এবং এ অবস্থায় রোযা না রাখা জায়িয হবে। তবে পরে এর কাযা করে নিতে হবে।

## অতি বৃদ্ধের রোযা

রামাযান মাসে যে সব ওযরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে বার্দ্ধক্য জনিত কারণ তার অন্যতম। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে একেবারেই অক্ষম সে রামাযানের প্রতিটি রোযার পরিবর্তে ফিদ্য়া স্বরূপ একজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে। বৃদ্ধ মহিলার ক্ষেত্রেও এ হুকুম। এই ফিদ্য়া রামাযানের প্রথম তারিখে এক সাথে আদায় করাও জায়িয, শেষ তারিখে আদায় করাও জায়িয়। কোন ব্যক্তি যদি ফিদ্য়া আদায়ের পর সুস্থ হয় এবং রোযা রাখতে সক্ষম হয় তাহলে আদায়কৃত ফিদ্য়া বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য প্রদত্ত ফিদ্য়া সাদাকা হিসাবে গন্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারিনী মহিলার রোযা

গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারিনী মহিলা রোযা রাখার কারণে যদি নিজের কিংবা সন্তানের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা বোধ করে তবে তাদের রোযা না রাখা দুরস্ত আছে। পরে তার কাযা করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সে মাতা নিজ শিশুকে দুধ পান না করিয়ে ধাত্রীর দুধ পান করান সে মাতার জন্য রোযা পরিত্যাগ করা জায়িয নয়।

কোন মহিলা যদি ধাত্রীর চাকুরী করে তবে স্তন্যদানকালে রামাযান এসে গেলে রোযা না রেখে শিশুকে দুগ্ধপান করানো তার জন্য জায়িয আছে। অবশ্য পরে এর কাযা করে নিতে হবে (শামী)।

## রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ও ডুস গ্রহণ

মুখ, নাক, কান, প্রশ্রাব এবং বাহ্যদ্বার ইত্যাদির কোন একটি দিয়ে মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীতে কোন কিছু প্রবেশ করলে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ সকল অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দেহাভ্যন্তরে কোন কিছু প্রবেশ করানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

মুখ, নাক, কান, প্রশ্রাব ও বাহ্যদ্বার ছাড়া কোন বিকল্প উপায়ে যদি সরাসরি পাকস্থলী অথবা মস্তিষ্কে কোন কিছু প্রবেশ করানো হয় তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সরাসরি পাকস্থলি বা মস্তিষ্কে না পৌঁছে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। অতএব গোশ্‌তে অথবা রগে কোন প্রকারের ইনজেকশনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। সেলাইন, গ্লুকোজ ইনজেক্‌শন বা ইনজেক্‌শনের মাধ্যমে শরীরে রক্ত প্রবেশ করানো দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রোযা অবস্থায় এ জাতীয় ইনজেক্‌শন না নেওয়া শ্রেয়।

ডুশ ব্যবহার বা হাপানীর প্রকোপ নিরসনের জন্য গ্যাস জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)।

## রোযা অবস্থায় মাজন বা পেস্ট ব্যবহার করা

ফকীহ্‌গণের মতে রোযা অবস্থায় শুক্‌না বা তাজা উভয় প্রকার ডাল দ্বারা মিস্‌ওয়াক করা জায়িয। এতে হাল্‌কা স্বাদ অনুভূত হলেও কোন ক্ষতি হবে না।

রোযা অবস্থায় দিনের বেলা কয়লা, গুলের মাজন, টুথপেস্ট, পাউডার ইত্যাদি দাঁত মাজা মাকরূহ। এ গুলোর কিছু অংশ যদি গলার ভিতর চলে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)।

## রোযা অবস্থায় রক্ত দান অথবা রক্ত গ্রহণ

রোযা অবস্থায় প্রয়োজনবোধে শিংগা লাগানো জায়িয। তবে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো মাকরূহ হবে। এ কারণেই ফকীহ্‌গণ বলেন, সন্ধ্যার পর শিংগা লাগানো উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

কাজেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা রক্ত দানের উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এতে শারীরিক দুর্বলতার আশংকা থাকলে মাকরূহ হবে। তাই দিনে রক্ত না দিয়ে রাতে দেওয়াই উত্তম। রোগ ব্যধির কারণে কারো রক্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)।

### রোযা অবস্থায় অপারেশন

মুখ গহ্বর, নাক ও কানের অভ্যন্তর ভাগ, প্রশ্রাব ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর যেকোন স্থানে অপারেশন করে কোন অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এসকল অঙ্গে অপারেশনের পরে ঔষধ বা অন্য কোন কিছু প্রবেশ করানো হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গুলি ছাড়া শারীরের যে কোন স্থানে অপারেশন করলে এবং ঔষধ বা অন্য কোন কিছু প্রবেশ করানো হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

তীর বা বর্শা টেটা বিদ্ধ হওয়ার পর যদি এর পূর্ণ ফলা পেটের ভিতরই রয়ে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এর কিছু অংশ পেটের বাইরে থেকে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। পাকস্থলীর অপারেশনের সময় যদি তার কোন অংশ বের করে পুনঃ তা সংযোজন করা হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন বমি মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তা পুনঃ উদারাস্ত করা হলে অথবা মুখের থুথু হাতে জমা করে পরে তা খেয়ে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)।

### ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার

দুই প্রকারের ক্ষত যাতে ঔষধ ব্যবহার করাকে ফকীহ্‌গণ রোযাভঙ্গকারী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

১. আম্মা (آمـه) ২. জায়িফা (جائفة)।

মাথার উপরিভাগের গভীর ক্ষত যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে গেছে তাকে 'আম্মা' বলা হয়। এতে ঔষধ ব্যবহার করলে ঔষধ মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে যায়। আর জায়িফা (جائفة) পেটের ঐ গভীর ক্ষত যা পাকস্থলীতে পৌছে গেছে। এতে ঔষধ ব্যবহার করলে ঐ পাকস্থলী পর্যন্ত পৌছে যায়। উপরোক্ত জখমদ্বয় দ্বারা ঔষধ যেহেতু সরাসরি পাকস্থলী বা মস্তিষ্কে পৌছে যায় তাই এই দুই ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ছাড়া শরীরের অন্য কোন জখমে ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না (আলমগীরী, শামী)।

অর্শ্ব রোগের বটি সাধারণত বাহ্য দ্বার থেকে কিছু নীচে গজিয়ে থাকে। তাই অর্শ্বের বটিতে বরফ দ্বারা সেক দিলে অথবা এতে জমাট কোন ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। শিশু অর্শ্বের বটিতে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে এর কিছু অংশ যদি ভিতরে চলে যায় তবে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আহ্‌সানুল ফাতাওয়া)।

www.pathagar.com

চোখের ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করলে এবং ঔষধের স্বাদ গলায় অনুভূত হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না (শামী, ২য় খণ্ড ও আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

আধুনিক যুগের কোন কোন ফকীহ্ চোখে তরল ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোযা ভঙ্গ হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, শরীর বিজ্ঞানীদের মতে চোখের ছিদ্রির সাথে গলার সরাসরি সংযোগ রয়েছে। তাই চোখে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে তা গলায় পৌছে যেতে পারে।

### রোযা অবস্থায় দাঁত সংযোজন এবং ঔষধ ব্যবহার

রোযা অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনের দাঁত উত্তোলন বা নতুন দাঁতের সংযোজনের ফলে রোযা ভঙ্গ হয় না। প্রয়োজনে দাঁতে ঔষধ ব্যবহার করাও জায়িয। বিনা প্রয়োজনে তা মাকরূহ। যদি রক্ত বা ঔষধ পেটের ভিতর প্রবেশ করে এবং এর পরিমাণ থুথুর পরিমাণের চেয়ে বেশী বা সমান হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি থুথুর পরিমাণ রক্ত বা ঔষধের চেয়ে হয় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এ অবস্থায় যদি গলার ভিতর ঔষধের স্বাদ অনুভূত হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (বায্যাযিয়া ও আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

### কতিপয় জরুরী মাসাইল

নাবালিগ ছেলে মেয়ে যদি রোযা রাখার পর তা ভঙ্গ করে তবে তাদের উপর এর কাযা ওয়াজিব নয়। কিন্তু নামায শুরু করার পর তা ভঙ্গ করলে তা পুনরায় আদায় করার জন্য তাদেরকে হুকুম করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় যদি কারো এমন ক্ষুধা বা পিপাসা লাগে যে, এতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে রোযা ভঙ্গ করে প্রাণ রক্ষা করা তার উপর ওয়াজিব। যদি রোযা ভঙ্গ না করে ক্ষুধা বা পিপাসায় মারা যায় তবে সে গুনাহগার হবে (বাদায়েউস্ সানায়ে আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

www.pathagar.com

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# চাঁদ দেখা

### চাঁদ দেখার গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ

লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলে দিন এটি মানুষের বিভিন্ন কাজ কর্মের এবং হজ্জের সময় নির্দেশক (২ ঃ ১৮৯)।

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابِ

যেন তোমরা (চাঁদ ও সূর্যের মাধ্যমে) বছর গণনা এবং সময়ের হিসাব জানতে পার (১০ ঃ ৫)।

এ আয়াত দু'টির দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম ও ইবাদত বন্দেগীতে চাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত রামাযান ও হজ্জের সময় নির্ণিত হয় চাঁদের সাহায্যে। রামাযানের রোযা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

তোমাদের মধ্য হতে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে রোযা রাখে (২ ঃ ১৮৫)।

হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারাও চাঁদের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ছেড়ে দাও (বুখারী ও মুসলিম)।

তাছাড়া চাঁদের মাধ্যমে বছর পূর্তিতে ফরয হয় যাকাত, নির্ধারিত হয় দুই ঈদের দিন আশুরা ও শবে বরাত, শবে কাদ্‌র সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। তাই মুসলমানের জীবনে চাঁদ দেখার গুরুত্ব অপরিসীম।

### রোযা ও ঈদের চাঁদ দেখা

শা'বানের উনত্রিশ তারিখ সূর্যাস্তের সময় রামাযানের চাঁদ উঠেছে কিনা তা দেখার ও

www.pathagar.com

জানার চেষ্টা করা ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এভাবে রামাযানের চাঁদের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য রজব মাস অন্তে শা'বানের চাঁদ তালাশ করাও ওয়াজিব। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

তোমরা রামাযানের হিসাব যথাযথভাবে রাখার জন্য শা'বানের চাঁদের পুরাপুরি হিসাব রাখবে (তিরমিযী)।

শা'বান ও রামাযানের চাঁদ অন্বেষণ করা যেমন ওয়াজিব তেমনি রামাযানের ঊনত্রিশ তারিখ অন্তে শাওয়ালের চাঁদ অন্বেষণ করাও ওয়াজিব। ঈদুল আযহা পালনে যেন কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তাই যিলক্বাদ ও যিলহাজ্জ এই দুই মাসের চাঁদ তালাশ করাও ওয়াজিব। শা'বান, রামাযান, শাওয়াল, যিলক্বাদ ও যিলহাজ্জ এই পাঁচ মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসের চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। এভাবে প্রত্যেক মাসের চাঁদ দেখার জন্য যথাসময়ের পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করাও মুস্তাহাব।

## চাঁদ দেখার উপর রোযা ও ঈদের নির্ভরশীলতা

চাঁদের মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনে হয় আবার কখনো ত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। তাই শা'বানের ঊনত্রিশতম দিনে সূর্যাস্তের সময় চাঁদ উদিত হওয়ার উপর পরবর্তী দিনের রোযা নির্ভরশীল। যদি ঐ দিনে চাঁদ দেখা যায় তাহলে পরবর্তী দিন থেকে রামাযান মাসের রোযা রাখা শুরু করতে হবে। আর যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ঐ শা'বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ হবে। শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী দিন থেকেই রামাযানের রোযা শুরু হবে। এ ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার উপর রামাযানের রোযা শুরু করা নির্ভরশীল নয়। অনুরূপ রামাযানের ঊনত্রিশ তারিখ সূর্যাস্তের সময় শাওয়ালের চাঁদ দেখার উপর পরবর্তী দিনে ঈদ হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি এ সময়ে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় তবে পরবর্তী দিনে ঈদুল ফিত্‌র হবে আর যদি চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে রামাযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরবর্তী দিনে ঈদুল ফিত্‌র হবে। এ ক্ষেত্রে চাঁদ দেখা না দেখার উপর ঈদুল ফিত্‌র নির্ভরশীল নয়।

চন্দ্র উদয় প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদগণ প্রমুখের হিসাব নিকাশ ঘোষণা ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য নয়। তা তাদের নিজেদের বেলায়ও নয় এবং অন্যদের বেলায়ও নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় চারভাবে ঃ

১ কেউ নিজে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে।

২. কেউ চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদাতার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে।

৩. চাঁদের উদয় সম্পর্কে বিচারকের রায়ের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিলে এবং

৪. চাঁদ উঠার ঘটনা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে চলে গেলে অর্থাৎ চাঁদ দেখার সংবাদ ব্যাপক

www.pathagar.com

হওয়ার কারণে তা সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য হলে। প্রত্যেকটি অবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আবার আকাশে চাঁদ দেখার মাস'আলা দুই ধরণের ঃ

১. আকাশে প্রতিবন্ধক থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা এবং

২. প্রতিবন্ধক না থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা। প্রথমত রামাযানের চাঁদ সংক্রান্ত এই দুই ধরণের মাস'আলা বর্ণিত হচ্ছে।

### আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় রামাযানের চাঁদ দেখার বিধান

আকাশে চাঁদ উঠার জায়গায় মেঘ বা ধূলার আস্তরণ ইত্যাদি প্রতিবন্ধক থাকলে রামাযানের চাঁদ এক ব্যক্তির সাক্ষ্যেই প্রমাণিত হবে। সে লোককে অবশ্যই মুসলমান ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। সে স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস, নারী হোক বা পুরুষ, তাতে সাক্ষ্য প্রদানে কোন তারতম্য হবে না এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য সমপর্যায়ের গণ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মেঘ, ধূলার আস্তরণ, অন্ধকার, ধূলা ধোয়া বা ধূলিঝড় ইত্যাদি কারণে সাধারণত আকাশে চাঁদ দেখার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদাতার পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিলে তার মধ্যেও সাক্ষ্যদাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা জরুরী। অতএব, এক্ষেত্রেও নারী বা পুরুষ হওয়া এবং স্বাধীন বা ক্রীতদাস হওয়ায় কোন পার্থক্য হবে না, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন আদিল মুসলমান হওয়া জরুরী হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার দায়ে বেত্রাঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাওবা করে, তাহলে তার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য বা সাক্ষীর স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি সে তাওবা না করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেবল রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এ ধরণের ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, শাওয়াল, যিলহজ্জ ইত্যাদির চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে এই ধরণের লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, চাই সে দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাওবা করুক বা না করুক (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

'মাসতুরুল হাল' অর্থাৎ যার নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা জানা নেই এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশুদ্ধ মতে রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ক্রীতদাসের পক্ষে অপর এক ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, অনুরূপ এক মহিলার সপক্ষে অপর এক মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যে বালক বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তবে নিকটবর্তী বয়সের তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। ফাসিক (যার মাঝে ন্যায়নিষ্ঠতা অনুপস্থিত এবং সৎকার্য অপেক্ষা মন্দকর্ম অধিক) এমন লোকের রামাযানের চাঁদ দেখার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান বা সাক্ষীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান অগ্রাহ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রামাযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানকালে 'সাক্ষ্য দিচ্ছি' বা এর সমার্থক কোন শব্দ এবং নিজ সত্যতার দাবী প্রকাশক কোন শব্দ ব্যবহার করা জরুরী নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি প্রশাসক সমীপে রামাযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান

www.pathagar.com

কালে অন্য কেউ সে মাহফিলে উপস্থিত থেকে তা শুনলে তার জন্য রোযা রাখা ফরয হয়ে যাবে প্রশাসকের ঘোষণা শোনার জন্য তার অপেক্ষা করা মোটেই জরুরী নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হতে চাঁদ দেখার বিস্তারিত বিবরণ শোনা জরুরী নয়। এক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি শহরের বাইরের লোক বা ভিতরের মাঠে গিয়ে বা বাড়ীর ছাদে উঠে চাঁদ দেখেছে ইত্যাকার কোন বিবরণ শোনার ওপর তার সাক্ষ্য গ্রহণ নির্ভর করবেনা (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমান রামাযানের চাঁদ দেখে তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সে রাতেই কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তির নিকট এর সাক্ষ্য প্রদান করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ফাসিক ব্যক্তি (অর্থাৎ যে আদিল নয়) যে যদি একা চাঁদ দেখে আর কেউ না দেখে তাহলে ইমাম বা কাযীর নিকট এ বিষয়ে তার সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য। কেননা, কাযী কখনো তার কথা গ্রহণ করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে কাযীর কর্তব্য তার কথা গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করা। কোনভাবে যদি ফাসিক ব্যক্তির এই প্রতীতি জন্মায় যে, ইমাম বা কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন তাহলে তার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কাযী বা ইমাম কোন ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল করেন এবং সেমতে রোযা রাখার নির্দেশ জারী করেন তাহল সকলের জন্যই রোযা রাখা ফরয হয়ে যাবে। এ সময় এই ব্যক্তি বা শহরের অন্য যে কোন ব্যক্তি রোযা রাখার পর তা ভেঙ্গে ফেললে কাযার সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে ফাসিকের সাক্ষ্য কবুল না করে তা প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করা ইমাম ও কাযীর জন্য আবশ্যক ছিল। সাক্ষ্য প্রদানকারী যদি বিশ্বস্ত হয় তাহলেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী ২য় খণ্ড)।

## আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকা অবস্থায় রামাযানের চাঁদ দেখার বিধান

যদি রামাযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক লোকের সাক্ষ্য অপরিহার্য হবে। যাদের সাক্ষ্য সত্য বলে গ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধা থাকবেনা এবং যাদের সকলের একত্রে মিথ্যা বলবে বলে ধারণা করার কোন অবকাশ থাকবেনা।

সাক্ষীদের নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই। বরং ইমাম বা কাযীর অন্তরে ইয়াকীন জন্মানোর জন্য যতজনকে তিনি যথেষ্ট মনে করেন তত জনের সাক্ষ্য তিনি সংগ্রহ করবেন। রামাযান, শাওয়াল ও যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি রামাযানের ঊনত্রিশ তারিখে প্রশাসক বা কাযীর নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমরা আপনাদের একদিন পূর্বে রোযা রাখতে শুরু করেছি, তাহলে সাক্ষ্যদাতা কোন এলাকার অধিবাসী তা লক্ষ্য করতে হবে। যদি সেই শহরেরই লোক হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসক বা কাযী তার এ কথা গ্রহণ করবেন না। কেননা শহরের অধিবাসী হিসাবে তার জন্য যেদিন চাঁদ দেখেছে সেদিনই সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব ছিল। যেহেতু সে সেই ওয়াজিব তরক করেছে তাই সে আর আদিল বলে পরিগণিত হবেনা। বরং সে ফাসিকের

www.pathagar.com

অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে আর সেই সাক্ষ্যদাতা যদি শহরের বাইরে দূরবর্তী এলাকার লোক হয়ে থাকে তাহলে তার একথা গ্রহণ করা হবে। এই বিধান বছরের সকল মাসের চাঁদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান

রামাযানের উনত্রিশ তারিখ সূর্যাস্তের সময় চাঁদ অন্বেষণ করবে। যদি শাওয়ালের চাঁদ মাত্র এক ব্যক্তিই দেখতে পায় তাহলে সে রোযা রাখা ছাড়বে না এবং ত্রিশ তারিখেও রোযা রাখবে। কেননা, ইবাদতে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। আর এখানে রোযা রাখাই হচ্ছে সতর্কতার প্রকাশ। যেহেতু তার একার চাঁদ দেখায় ভুল হওয়াও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যদি সে রোযা না রাখে তাহলে তাকে শুধু ঐ রোযারই কাযা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি একা চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি কাযী বা প্রশাসকের নিকট সাক্ষ্য প্রদানের পর তা অগ্রাহ্য হয় তাহলে তার জন্য অন্যান্য মুসলমানের সাথে রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি সে রোযা না রাখে তাহলে তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা আদায় করতে হবেনা। কেননা তার চাঁদ দেখার হিসাবে রামাযান মাস শেষ হয়ে গেছে। যদি কাযী বা প্রশাসক তার কথা প্রত্যাখ্যান করার পূর্বেই সে রোযা ছেড়ে দেয় তাহলেও তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি এই লোকের কথা বিশ্বাস করে অন্য কোন লোক রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তাকেও কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। কেবল কাযা আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি প্রশাসক বা কাযী একা শাওয়ালের চাঁদ দেখেন তাহলে এর ভিত্তিতে তিনি লোকদের ঈদ উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিবেন না এবং নিজেও রোযা তরক করবেন না। কেননা শাওয়ালের চাঁদ একা একজনের দেখা শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি আকাশে প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে ঈদুল ফিত্‌রের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ

১. সাক্ষীদের আদিল (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) হওয়া,

২. আযাদ হওয়া,

৩. দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান করা,

৪. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' বলে সাক্ষ্য প্রদান করা।

৫. অপবাদে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

উল্লিখিত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে কমপক্ষে দুইজন আযাদ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা যাদের কেউ মিথ্যা অপবাদের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়নি এবং যারা আদিল তারা 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' একথা বলে সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। একজন কাযী তাদের চাঁদ দেখার প্রতি স্বীকৃতি দিবেন। এরপর তিনি ঈদ উদ্‌যাপনের নির্দেশ প্রদান করবেন। কেবল মহিলাদের সাক্ষ্য যদি তারা সংখ্যায় অনেকও হয় তথাপিও তা গৃহীত হবে না। অনুরূপ গোলাম

www.pathagar.com

বা অপবাদে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাওবা করে তবুও তাদের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানে আরবী শব্দ 'আশ্‌হাদু' বা তার সম অর্থবোধক বাংলা, ইংরেজী বা অন্য যে কোন ভাষার শব্দ যে দেশে যে ভাষা প্রচলিত সে ভাষায় তার অর্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করতে পারবে। আরবী শব্দ 'আশ্‌হাদু' বলতে হবে, অন্য কোন ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না; এরূপ ঠিক নয়। তবে সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থের শব্দ হলে তার দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা গৃহীত হবে না, যেমন আমি জানি বা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি- এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগে সাক্ষ্য প্রদান করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ যদি আরবী শব্দ বলতে আগ্রহী হয় তাহলে 'আশ্‌হাদু' বলতে হবে। 'শাহিদ্‌তু' শব্দ বলা সহীহ্ হবে না। কেননা এরূপ শব্দ সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না বরং 'শাহিদতু' সাক্ষ্য সম্পর্কিত সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য কাযী বা প্রশাসকের সামনে প্রদান করতে হবে (উমদাতুল ফিক্‌হ, ৩য় খণ্ড)।

### আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান

শাওয়ালের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এ অবস্থায় একদল লোক চাঁদ দেখলে শরীয়াতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। দু'একজন লোক চাঁদ দেখার দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এ সময় একদল লোকের সাক্ষ্য প্রদান করা আবশ্যক। ফিকহ্ গ্রন্থে চাঁদ প্রত্যক্ষকারীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নেই। অবশ্য এমন সংখ্যক লোককে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যাতে এ ব্যাপারে কারো কোনরূপ দ্বিধা, সংশয় না থাকে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অবশ্য দু'একজন লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দান করলে ইমাম তা প্রত্যাখ্যান না করে আরো লোকের সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা এর অপেক্ষায় থাকবেন। এভাবে আরো লোকের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে ইমাম চাঁদ দেখার ও ঈদ উদ্‌যাপন করার ফয়সালা প্রদান করবেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### ঈদুল আযহা ও অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বিধান

ঈদুল আযহার চাঁদ অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ এবং বছরের অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বিধান ঈদুল ফিত্‌রের চাঁদ দেখার বিধানের মতই। এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত। তাই মুসলমান আযাদ এবং অপবাদে দণ্ডপ্রাপ্ত নয় এরূপ দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করলে প্রশাসক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন।

সাক্ষ্য দাতাদের আদিল হতে হবে। এবং 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি' বলে তাদের সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। আকাশে চাঁদ দেখায় কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে উপরোক্ত বিধান কার্যকর হবে। আর যদি চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে অন্য সকল মাসের মত এ মাসগুলোতেও একদল মানুষের চাঁদ দেখার দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কিরাম আকাশে প্রতিবন্ধকতা না থাকা অবস্থাতেও রামাযান ও দুই ঈদের ব্যতীত অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন

www.pathagar.com

মহিলার সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা এ সকল মাসে চাঁদ দেখার প্রতি সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে আগ্রহ খুবই কম। ফলে খুব কম সংখ্যক লোকই এ মাস-গুলোর চাঁদ অনুসন্ধান করে বা প্রত্যক্ষ করে। অতএব দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা চাঁদ দেখলে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

**কারো চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের প্রত্যয়নে সাক্ষ্য প্রদান**

কেউ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, এই মর্মে কাযীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করা হলে কাযী তা গ্রহণ করবেন এবং সেই হিসাবে নির্দেশ জারী করবেন। এ ক্ষেত্রে মূল সাক্ষীর সম সংখ্যক সাক্ষী উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলেই তা গৃহীত হবে। রামাযানের চাঁদ যেহেতু একজন বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাই প্রমাণিত হয় তাই চাঁদ প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীর সত্যায়নকারীও কেবল একজন আদিল ব্যক্তি হলেই তা গৃহীত হবে।

রামাযানের চাঁদ ব্যতীত অন্য সকল মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে কমপক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। তাই, চাঁদ প্রত্যক্ষকারীর সাক্ষ্যে সত্যায়নকারীও দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হতে হবে। তখন সত্যায়নকারীদের সাক্ষ্য প্রদানের যাবতীয় শর্তও বহাল থাকতে হবে।

দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা নিজ এলাকার কাযীর নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করল যে , অমুক শহরের দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সে এলাকার কাযীর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করছে এবং তিনি তা গ্রহণ করে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার রায় প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় সেই কাযীর রায় প্রদান এই কাযীর জন্য দলিল বিধায় তিনি এই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। এবং সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান করবেন।

কিন্তু কোন কাযীর চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা সম্পর্কে অন্য কাযীকে খবর অবহিত করা হলে ঐ কাযী ঐ খবরের উপর ভিত্তি করে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার কারণ তা নিছক সংবাদ যথা নিয়মে সাক্ষ্য প্রদানের সত্যায়ন সাক্ষ্য নয়। অতএব যদি এক দল লোক এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, অমুক এলাকার লোকেরা এই এলাকার লোকজনের একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছে সে হিসাবে তাদের আজ ত্রিশতম দিন, তাহলে তাদের কথায় এ এলাকার লোকদের পরবর্তী দিন রোযা না রেখে ঈদ করা সহীহ্ হবে না। কেননা, তারা নিছক সংবাদ দিয়েছে; কোন সাক্ষ্য প্রদান করেনি। কাজেই এই এলাকার লোকেরা পরের দিন রোযা রাখবে এবং তারাবীহ্ নামাযও পড়বে (উমাদাতুল ফিক্হ্, ৩য় খণ্ড)।

অনুরূপ কিছু লোক এসে যদি নিজ এলাকার কাযীর নিকট এ মর্মে সংবাদ দেয় যে অমুক এলাকার কাযী সে এলাকায় লোকদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যে উপর ভিত্তি করে শাওয়ালের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা করেছেন, তাহলেও এ কাযী ঐ খবরের উপর ভিত্তি করে শাওয়ালের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা করতে পারবেন না। কারণ এটাও নিছক খবর, সাক্ষ্য নয়।

রামাযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরই যথেষ্ট। সাক্ষ্য প্রদান অপরিহার্য নয়। কিন্তু ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য নিছক খবর যথেষ্ট নয়। যথা নিয়মে সাক্ষ্য প্রদানও অপরিহার্য। সুতরাং দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা

www.pathagar.com

'সাক্ষ্য দিচ্ছি' বলে চাঁদ প্রত্যক্ষ করার বর্ণনা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

সরকার কর্তৃক যথানিয়মে গঠিত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য চাঁদ দেখা কমিটির নিকট যথা নিয়মে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করলে এতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির ফয়সালা কার্যকর হবে বলে বিবেচিত হবে।

যে গ্রাম বা এলাকায় চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তি যদি রামাযানের চাঁদ দেখে তবে তার জন্য অপরিহার্য যে, সে এলাকার মসজিদে গিয়ে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করবে। যথানিয়মে সাক্ষ্য গ্রহণের পর চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে এবং উক্ত এলাকার সকলের জন্য রোযা রাখা অপরিহার্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হলে

কোন প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান যদি একাকী রামাযানের চাঁদ দেখে, কিন্তু ইমাম বা কাযী বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য মনে না করেন তাহলে চাঁদ প্রমাণিত হবে না, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। শরয়ী দলীল দ্বারা এ ক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় তার একা চাঁদ দেখা অথবা আকাশে মেঘ কুয়াশা ইত্যাদি থাকা অবস্থায় চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির ফাসিক হওয়া ইত্যাকার অনির্ভরযোগ্য অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

চাঁদ প্রত্যক্ষকারীর সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়ার অন্য সকলের নিকট পরবর্তী দিন শা'বানের ত্রিশ তারিখ এবং তার নিজের নিকট তা রামাযানের প্রথম দিন বলে গণ্য হবে। অধিকাংশ আলিমের মতে তার জন্য এদিন রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি সে এ রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কিন্তু এমন ব্যক্তির রোযা ত্রিশটি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও সে একাকী রোযা তরক করতে পারবে না বরং ইমাম ও অন্য সকলের সাথেই তাকে ঈদ করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এতে তাকে একত্রিশটি রোযা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার একটি রোযা নফল বলে গণ্য হবে বাকী ত্রিশটি রামাযানের ফরয রোযা হবে। সে যদি ত্রিশ দিনের পরবর্তী দিনটিতে রোযা না রাখে তবে কাযা ওয়াজিব হবে। এই বিধান ফাসিক, আদিল উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

একা চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি যদি কাযী বা ইমামের নিকট সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বেই তার রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে সহীহ্ মত হচ্ছে এই যে, তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে, কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অনুরূপ একা চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি কাযী বা ইমামের নিকট সাক্ষ্য প্রদান না করে সে ক্ষেত্রে তার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি রোযা না রাখে তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

কাযী যখন কারো সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন, তখন তার জন্য তারাবীহের নামায পড়া জরুরী হয় না। কিন্তু সাক্ষ্য কবুল করলে যেহেতু সকলের জন্যই তরাবীহ্ জরুরী হয় তেমনি এই ব্যক্তির জন্য ও তারাবীহের নামায পড় জরুরী হবে (উমদাতুল ফিক্হ)।

www.pathagar.com

### চাঁদ দেখার খবর ঘোষণা এবং এজন্য আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার

কোন ঘটনা বা লেনদেন সম্পর্কে কাউকে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে জানালে টেলিফোন করলে এবং টেলিফোনে তার আওয়াজ সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেলে বা চিঠি লিখলে এবং পত্র লেখকের লেখার ভঙ্গি ও হস্তাক্ষর সম্পর্কে প্রাপকের পূর্ণ পরিচিতি থাকলে তার প্রেরিত ও বর্ণিত বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করাতে কোন আপত্তি থাকে না। ফলে যাকে সংবাদ জানানো হয়, তার এ সংবাদ পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা তার জন্য বিধিসম্মত বলে বিবেচিত হয়। দুনিয়ার অধিকাংশ লেন-দেন এভাবেই হয়ে থাকে।

কিন্তু কারো বিশ্বাস্য সংবাদকে সর্বজন গ্রহণীয় করতে হলে এবং এই সংবাদ অনুসারে আমল করানোর ইচ্ছা পোষণ করলে এতে সাক্ষ্য প্রদানের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। নতুবা তা ইসলামী শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই চাঁদ দেখার বিষয়ে এবং অন্যান্য শরয়ী বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য প্রশাসক বা নেতৃস্থানীয় আলিম ব্যক্তি বর্গের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য। তা না হলে প্রেরিত সংবাদ যতই বিশ্বাসযোগ্য হোক, তা ফয়সালার মানদণ্ডে বিবেচিত হবে না।

চাঁদ দেখা কর্তৃপক্ষ যদি সাক্ষ্য প্রদানে এই বিধান অনুসরণ করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পর তা গ্রহণ করে সরকার কর্তৃক প্রচার করার জন্য শর্ত হল, এ বিষয়টি নিম্নোক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার কোন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে ঃ

১. شَهَادَة عَلَى الرُّؤْيَة-চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান,

২. شَهَادَة على شَهَادَة الرُّؤْيَة-চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান,

৩. شَهَادَة على القضا-আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক চাঁদের ফয়সালা প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান।

### চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান

শরী'আতের হুকুম আহ্কাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নির্ভরযোগ্য এক বা একাধিক আলিমের উপস্থিতিতে চাঁদ দেখার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করা।

### চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান

যদি চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি নিজে আলিমদের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে না পারে, তাহলে প্রত্যেক একজনের স্বপক্ষে দুইজন করে সাক্ষী নির্ধারণ করবে। তারা আলিমগনের নিকট গিয়ে বলবেন যে, অমুক আমাদের নিকট সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে যে, আমি অমুক রাতে অমুক স্থানে স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে তার সাক্ষ্য প্রদানে আমাকে সাক্ষী নির্ধারণ করেছে। তাই আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করছি।

### আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক চাঁদের ফয়সালা প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান

যেখানে চাঁদ দেখা গিয়েছে, যদি সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে কোন স্থানীয় 'চাঁদ দেখা কমিটি' থাকে এবং সে কমিটিতে এমন নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরাম থাকেন যাঁদের ফাত্ওয়ার প্রতি স্থানীয় আলিমগণ ও স্থানীয় জনগণ পূর্ণ আস্থা রাখেন, চাঁদ

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষকারীরা তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাদের চাঁদ প্রত্যক্ষ করার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং উক্ত উলামায়ে কিরাম তাদের সাক্ষ্য কবুল করেন, তাহলে তাদের উক্ত এলাকার জন্য উলামায়ে কিরামের এই রায় প্রদান যথাযথ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বত্র তাদের রায় কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্রের 'কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটি'র সামনে উক্ত উলামায়ে কিরামের রায় নিম্নোক্ত শর্তাবলীসহ উপস্থাপন করতে হবে ঃ

উক্ত আলিমগণ সকলে বা সকলের পক্ষ হতে একজন পত্র মারফত জানাবেন যে, অমুক সময় আমাদের উপস্থিতিতে আমাদের নিকট দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং আমাদের নিকট তাদের এই সাক্ষ্য প্রদান নির্ভরযোগ্য ও যথাযথ বলে প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষিতে আমরা চাঁদ উঠার রায় প্রদান করেছি। দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে চিঠিটি লিখে বন্ধ করে তাদের হাতে 'কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটি'র নিকট তা পাঠাতে হবে। তারা চিঠিটি হস্তান্তরের সময় ও এই সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, অমুক আলিমগণ আমাদের উপস্থিতিতে চিঠিটি লিখে বন্ধ করে আমাদের হাতে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটির নিকট শরী'আতের শর্ত মোতাবিক এই প্রত্র গৃহীত বলে বিবেচিত হওয়ার পর তাঁরা সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে সারা দেশে চাঁদ দেখার রায় প্রদান করবেন।. তাদের এই রায় সারা দেশের সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য গ্রহণীয় হবে। সে ক্ষেত্রেও সাধারণ সংবাদ পাঠকের মাধ্যমে তা জানানো যথেষ্ট হবে না। বরং কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটির পক্ষ হতে একজন নেতৃস্থানীয় আলিম স্বয়ং রেডিও বা টেলিভিশন মারফত দেশবাসীকে সাক্ষ্য প্রদানের তিনটি অবস্থার যেইটি এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে তার উল্লেখ করে জানাবেন যে, উক্ত পন্থায় আমাদের নিকট চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে চাঁদ উঠার রায় প্রদান করছি এবং সরকারের পক্ষ হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে আমরা তা সারাদেশে প্রচার করছি।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি সহজ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ঃ

সরকার চাঁদ সম্পর্কিত মাস'আলা মাসাইলে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরাম নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি চাঁদ দেখা কমিটি গঠন করবেন। অনুরূপ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ও আঞ্চলিক চাঁদ দেখা কমিটি গঠন করবেন। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক কমিটি সমূহকে চাঁদ দেখার যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পন করা হবে। আঞ্চলিক কমিটি যথা নিয়মে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এর পর এই সংবাদ আঞ্চলিক কমিটি টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটির নিকট এমনভাবে পৌছাবেন যেন তার মধ্যে কোন দ্বিধা, দ্বন্ধ বা সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটি দেশব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এরূপ ক্ষেত্রে রেডিও ও টেলিভিশন এবং পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত ঐ সংবাদ যথাযথ বলে গৃহীত হবে (জাওয়াহিরুল ফিকহ)।

www.pathagar.com

**ইখ্তিলাফে মাতালি' -এর হুকুম**

ভৌগলিক অবস্থানের বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশে চন্দ্র উদয়ের সময়েও পার্থক্য হয়ে থাকে। একেই 'ইখতিলাফে মাতালি' বলা হয়। এ অবস্থায় কোন এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্বের লোকদের রোযা ও ঈদ ইত্যাদির ব্যাপারে তা গৃহিত হবে কিনা এ নিয়ে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছু মতভেদ ছিল।

একদল ফিক্‌হবিদের বর্ণনায় রয়েছে যে, বিশ্বের কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে রামাযানের রোযা ও ঈদুল ফিত্‌রের ক্ষেত্রে তা সর্বত্রই গ্রহণীয় হবে। এমনকি তাঁদের মতে প্রাচ্যের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা পশ্চাত্যের জন্য প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ পশ্চাত্যের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা প্রাচ্যের জন্য প্রযোজ্য হবে। যাহেরী রিওয়ায়াতে এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী ফকীহ্‌গণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোন এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে ও তার নিকটবর্তী দেশের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। দূরবর্তী দেশের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না।

মুতা'আখ্খিরীন ফকীহ্‌গণ যাহেরী রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, 'ইখতিলাফে মাতালি' গ্রহণযোগ্য নয়'।

মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কিরামের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো এই যে, 'ইখতিলাফে মাতালি' নিকটবর্তী দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। দূরবর্তী দেশসমূহ যেখানে চাঁদের উদয়ে এক দিনেরও পার্থক্য হয়ে থাকে সেখানে ইখতিলাফে মাতালি' মু'তাবার হবে। মুহাকিক্ক অলিমগণ এ মতের উপর 'ইজ্‌মা' ঐকমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন (বাদায়েউস্ সানায়ে ও তাবঈনুল হাকাইক, যায়লায়ী, বিদায়তুল মুজাতাহিদ, মা'আরিফুস্ সুনান)।

**সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা রাখা ও ঈদ উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে**

কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা বিশ্বে একইদিন রোযা আরম্ভ এবং একই দিনে ঈদ উদ্‌যাপন করা আবশ্যক। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া ঃ

ক. সাহাবা কিরাম, তাবিঈন, তাবি-তাবিঈনের যমানায় মুসলিম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিন রোযা পালন ও ঈদ পালন করা হয়েছে। ঐ যমানায় একই দিনে রোযা পালন বা ঈদ উদযাপনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। যদি একই দিনে ঈদ ও রোযা পালনের শরীয়তী কোন নির্দেশ থাকত তবে অবশ্যই তারা তা পালনের ব্যবস্থা করতেন।

খ. একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করতে হলে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে চন্দ্রের উদয়স্থলের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ শরীয়াতে কোন স্থানকে এরূপ মানদণ্ড সাব্যস্ত করে নাই। আর শরীয়াতের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে কোন স্থানকে মানদণ্ডরূপে ঘোষণ করা হলে তাতে উম্মাতের মধ্যে আরো অধিক ইখতিলাফ ও অনৈক্য সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

গ. বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ উদ্‌যাপন করতে গেলে ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

www.pathagar.com

"তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রেখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ করো" এই হাদীসের উপর সকল এলাকার লোকের আমল করা সম্ভব নয়। তখন চাঁদ দেখা সত্ত্বেও বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলের লোক রোযা ও ঈদ পালন করতে পারবে না এবং চাঁদ না দেখেও কোন কোন অঞ্চলের লোকদের (একই দিনে রোযা ও ঈদ করার স্বার্থে) রোজা ও ঈদ পালন করতে হবে। অথচ তা যেমন বাস্তব সম্মত নয় তেমন হাদীসেরও পরিপন্থি।

## অমুসলিম দেশ থেকে প্রাপ্ত চাঁদ দেখার খবর

যেহেতু অমুসলিম দেশে ইমাম বা কাযী নেই, তাই মুসলিম বিচারক থাকলে তার নিকট চাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। যদি মুসলিম বিচারক না থাকেন বা তিনি ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী ফয়সালা না করেন তাহলে স্থানীয় বিশিষ্ট আলিমের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করবে। যদি এলাকায় কোন বিশিষ্ট আলিমও না থাকেন, তাহলে স্থানীয় মসজিদে সবার সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করবে। এভাবে চাঁদ দেখা স্বীকৃত হওয়ার পর তা ঐ দেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ সমূহে তা গ্রহণীয় হবে না। কারণ অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রনাধীনে পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর শরয়ী ব্যাপারে গ্রহণ করা যায় না।

## জ্যোতির্বিদ ও আবহাওয়াবিদদের হিসাবে চন্দ্রোদয় নির্ণয়

শরী'আতের দৃষ্টিতে জ্যোতির্বিদ ও আবহাওয়াবিদদের কথা অনুযায়ী রোযা রাখা বা না রাখা কোনটিই সাব্যস্ত হবে না। রোযা, ঈদ ইত্যাদি সাব্যস্ত হবে চাঁদ প্রত্যক্ষ করার দ্বারা এ বিষয়ে আলিমগণ একমত। কেননা নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ঈদুল ফিত্‌র কর, আর যদি রামাযানের চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শা'বানের ত্রিশদিন পূর্ণ করো।

## বিভিন্ন দেশে সফর করার ফলে রোযা ত্রিশ দিনের অধিক বা ঊনত্রিশ দিনের কম হওয়া প্রসঙ্গে

রামাযানের মধ্যে কেউ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার পর সে দেশে রামাযান মাস চলতে থাকলে বা রামাযান মাস শেষ হলে সে দেশবাসীর ন্যায় তাকে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার রোযা ত্রিশদিনের অধিক হলেও সে দেশবাসীর অনুসরণে তাকে রোযা রাখতে হবে। যে ত্রিশ দিনের অধিক সে রোযা রেখেছে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি ঊনত্রিশ দিনের কম হয় তবে সে দেশবাসীর অনুসরণে তাদের সাথে ঈদ পালন করবে। পরে উক্ত রোযার কাযা করে নিবে (আহ্‌সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

## যেখানে চাঁদ কখনো দেখা যায় না সেখানে রোযার হুকুম

যে জায়গায় সদাসর্বদা মেঘ অথবা অন্য কোন কারণে কখনো চাঁদ দেখা সম্ভব হয় না সেখানে নিকটবর্তী যে রাষ্ট্রের শরীয়াতের নিয়মাবলী মেনে চাঁদের ফয়সালা প্রদান করা হয় সে রাষ্ট্রের ফয়সালা নিজ দেশের জন্যও প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# সাহ্‌রী ও ইফ্‌তার

### সাহ্‌রীর ফযীলত

'সাহ্‌রী' শব্দটি আরবী 'সাহরুন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সুবহি সাদিকের পূর্বে যা পানাহার করা হয় তাকে 'সাহ্‌রী' বলা হয়।

হাদীস শরীফে সাহ্‌রী খাওয়ার অনেক ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ তিনটি কাজে বরকত রয়েছে। মুসলমানদের জামা'আতে, সারীদ নামক খাদ্যে ও সাহরীতে তাবাণী নামক খাদ্যে। সাহ্‌রী খাওয়া মোস্তাহাব।

সাহ্‌রী খাওয়াতে বহু বরকত রয়েছে। কারণ এর দ্বারা রোযা রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মন প্রফুল্ল থাকে। এগুলো হলো সাহ্‌রী খাওয়ার বাহ্যিক বরকত। এ অন্তর্নিহিত বরকত এই যে, ঐ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। এটা দু'আ কবুলের সময়। এ সময়কার দু'আ, যিক্‌র, ইবাদত ও ইসতিগফার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি পসন্দনীয় (নব্বী শরহে মুসলিম)।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহ্‌রীতে বরকত রয়েছে (মুসলিম)।

হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও আহলে কিতাব -এর (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হল, সাহ্‌রী খাওয়া (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) বলেন, রামাযান মাসের কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে সাহরী খেতে ডাকলেন এবং বললেন ঃ এসো মুবারক খানার দিকে (মিশকাত)।

'বাহরুর রায়িক' কিতাবে উল্লেখিত এক হাদীসে রয়েছে নবী করীম (সা.) বলেন ঃ সাহ্‌রী খাওয়ার সব কাজেই বরকত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ করো না।

### সাহ্‌রীর সময় ও আদাব

সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব। এর জন্য উপযুক্ত সময় হল রাতের শেষ ভাগ।

ফকীহ্ আবুল লাইস সমরকান্দী (র.) বলেন, সাহ্‌রীর জন্য উপযুক্ত সময় হল রাতের ষষ্ঠাংশ। অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সুবহি সাদিক পর্যন্ত যে কয় ঘন্টা হয় তার ছয় ভাগের শেষ ভাগ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

বিলম্বে সাহ্‌রী গ্রহণ করা মুস্তাহাব। তবে সুব্‌হি সাদিক হয়ে যাওয়া এবং রোযায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ। সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সাহরী খাওয়া জায়িয। এরপরে জায়িয নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাহ্‌রীর আদব সমূহের অন্যতম হচ্ছে হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাদ্য পরহেয করা। অতি ভোজন থেকে বিরত থাকাও সাহ্‌রীর আর একটি আদব। অর্থাৎ পরিমিত আহার করবে। এ পরিমাণ আহার করবেনা যাতে কষ্ট হয় ও ঢেকুর উঠে।

সাহরীর জন্য খাদ্য গ্রহণ সম্ভব না হলে অন্তত এক গ্লাস পানি হলেও পান করে নিবে। এতে সাহ্‌রীর বরকত ও সাওয়াব লাভ হবে।

## সাহ্‌রী সম্পর্কিত মাসাইল

এই ধারনায় যদি সাহ্‌রী গ্রহণ করে যে, সুব্‌হি সাদিক হয়নি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুব্‌হি সাদিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ এই ধারনায় স্ত্রী সহবাস করে যে, রাত অবশিষ্ট আছে, কিন্তু পরে জানতে পারল যে, সুবহি সাদিকের পর সহবাস করা হয়েছে এবং জানার সঙ্গে সঙ্গে সে বিরত হল, এ অবস্থায় তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। যেহেতু তার এ ভুল ছিল অনিচ্ছাকৃত (শামী, ২য় খণ্ড)।

সুবহি সাদিকের ব্যাপারে সন্দেহ হলে সাহ্‌রী গ্রহন থেকে বিরত থাকা উত্তম। অবশ্য সন্দেহ সত্ত্বেও পানাহার করলে রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে যদি সুব্‌হি সাদিক হওয়ার পরে পানাহার করা হয়েছে বলে সুনিশ্চিত হয় অথবা এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে তার প্রতি রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

দু'জন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে সুব্‌হি সাদিক হয়েছে। আর দু'জন সাক্ষ্য দিল যে উদয় হয়নি। সে অবস্থায় পানাহার করল এরপর প্রকাশ পেল যে, সত্যিই সুব্‌হি সাদিক হয়ে ছিল। তাহলে তার উপর কাযা, কাফ্‌ফারা দু'টোই ওয়াজিব হবে।

যদি একব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সুব্‌হি সাদিক হয়ে গেছে এবং অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে হয়নি এ অবস্থায় পানাহার করার পর জানা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে তখন সুব্‌হি সাদিক হয়ে গিয়েছিল তবে তার রোযা কাযা করতে হবে। কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন লোক সাহ্‌রী গ্রহণ কালীন সময়ে একদল লোক তার কাছে এসে বলল, সুব্‌হি সাদিক উদয় হয়েছে। এখন সাহ্‌রী গ্রহণকারী ভাবল রোযা যখন নষ্ট হয়ে গেছে তাই খেয়ে নিই এবং তাই করল। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে প্রথমবার খাদ্য গ্রহণ মূলত সুব্‌হি সাদিকের পূর্বে ছিল কিন্তু পরবর্তী খাদ্য গ্রহণ হয়েছে সুব্‌হি সাদিক উদয়ের পর। এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি আগন্তুকরা একদল হয় আর তাদেরকে সত্য মনে করে থাকে তাহলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি আগন্তুক মাত্র এক ব্যক্তি হয় চাই সে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হোক কিম্বা না হোক, তার কথার উপর নির্ভর করে উপরোক্তভাবে আহার গ্রহণ

www.pathagar.com

করে থাকলে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল ভাল করে দেখে এস সুব্হি সাদিক উদয় হয়েছে কিনা। স্ত্রী আকাশের দিকে তাকাল। ফিরে এসে বলল। সুব্হি সাদিক উদয় হয়নি। তখন স্বামী তার সাথে সহবাস করল। কিন্তু পরে জানতে পারল যে, তখন সুব্হি সাদিক উদয় হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে কোন কোন ফকীহ্ বলেন, স্ত্রী নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক উভয় অবস্থায়ই স্বামীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না আর স্ত্রী যদি সুব্হি সাদিক হয়েছে জেনে এই কাজ করে থাকে তবে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব।

সাহ্রী গ্রহণ করার সময় সুব্হি সাদিক উদয় সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেনি যে, সুব্হি সাদিক উদয় হয়েছিলো কিনা ? এ অবস্থায় তার উপর কাযা কাফফারা কোনটিই ওয়াজিব হবেনা (শামী, ২য় খণ্ড)।

সুব্হি সাদিক হয়ে গিয়েছে এরূপ ধারণা হওয়া সত্ত্বেও কেউ সাহ্রী গ্রহণ করল। পরে জানা গেল যে, তখন সুব্হি সাদিক হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তার ঐ রোযা শুদ্ধ হবে না। পরে তার কাযা করতে হবে। আর যদি তখন সুব্হি সাদিক হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে এক্ষেত্রে তার উপর কাযা কাফ্ফারা কোনটাই ওয়াজিব নয়।

কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, এক্ষেত্রে কাযা করে নেওয়া ভাল। যখন কোন ব্যক্তি সাহ্রী গ্রহণ করল এ ধারণায় যে রাত অবশিষ্ট আছে। পরে জানতে পারল যে, তখন সুব্হি সাদিক হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

সুব্হি সাদিক হয়েছে বলে প্রবল ধারণা হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ সাহ্রী গ্রহণ করে তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

সুব্হি সাদিক হয়ে যাওয়ার কথা জানার পর সাহ্রী খাওয়া নিষেধ। তাই সুব্হি সাদিকের পর কেউ সাহ্রী খেলে তার রোযা শুদ্ধ হবে না। সাহ্রী খাওয়া অবস্থায় সুব্হি সাদিক হয়ে গেলে সাথে সাথে খানা বন্ধ করে দিতে হবে। ঐ অবস্থায় মুখে কোন খাদ্য থাকলে তাও গিলে ফেলা জায়িয হবে না।

কেউ যদি নিজে বা অন্য কারো মাধ্যমে সুব্হি সাদিক নিরূপণ করতে সক্ষম না হয় তবে সে তাহারীর তথা চিন্তা ভাবণা করে প্রবল ধারণা অনুসারে আহার গ্রহণ করবে। রামাযান মাসে নির্ধারিত সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সাইরেন, ঘন্টা বা মাইক ইত্যাদির মাধ্যমে সাহ্রী বা ইফতারের যে সময় ঘোষণা করা হয় এর ভিত্তিতে সাহ্রী ও ইফতার গ্রহণ করা জায়িয। ভুলবশত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সাহ্রী বা ইফ্তারের সময় প্রচার করা হলে তার উপর নির্ভর করে সাহ্রী বা ইফ্তার গ্রহণ করা জায়িয হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ইফ্তারের ফযীলত

'ইফ্তার' শব্দের আভিধানিক অর্থ রোযা ভংগ করা। শরীয়াতের পরিভাষায় রোযাদার ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর যে পানাহার করে তাকে 'ইফ্তার' বলা হয়। হাদীস শরীফে ইফ্তারের বহু ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণিত রয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

عن أبى هُريرة رَضِى الله عنه قَال قَال رسُول الله صلى الله عليه و سلم للصَّائِم فرحتَان فرحة عند فطرة و فرحة عند لِقَاء رَبّه

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, রোযাদার ব্যক্তির জন্য দু'টি আনন্দ। একটি তার ইফ্‌তারের সময় অন্যটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময় (বুখারী ও মুসলিম)।

عن أبى هُريرة رضى الله عنه قَال قَال رسُول الله صلى الله عليه و سلم ثلثة لا ترد دعوتهم الصَّائم حين يفطر و الإمَام العَادل و دعوة المظلوم

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, তিন ব্যক্তি যাদের দু'আ প্রত্যাখান করা হয় না। রোযাদার যখন ইফ্‌তার করে, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং মাযলুমের দু'আ।

عن عمر بن العَاص رضى الله عنه قَال قَال رسُول الله صلى الله عليه و سلم إن للصَّائم عند فطرة لدعوة مَا ترد

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ রোযাদার ব্যক্তির ইফ্‌তারের সময়ের দু'আ প্রত্যাখান করা হয় না (আত্‌তারগীব ওয়াত তারহীব)

সালমান ইব্‌ন আমির (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ইফ্‌তার করে যেন খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করে। কেননা এতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায় তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফ্‌তার করে। কেননা পানি পবিত্রকারী (আহ্‌মাদ,তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজা ও দারেমী)।

## ইফ্‌তারের সময়

সূর্যাস্তের পর সাথে সাথে ইফ্‌তার করা সুন্নাত। যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে তখনই ইফ্‌তার করতে হবে।

সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বেই ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব (আলমগীরী)।

হযরত উমর ফারূক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যখন রাত আসবে দিন চলে যাবে, তখন রোযাদারগণ ইফ্‌তার করবে (মুসলিম)।

## ইফ্‌তারের আদাব

খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফ্‌তার করবে। সূর্যাস্তের পূর্বে ইফ্‌তার সামনে নিয়ে বসে সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন।

www.pathagar.com

## ইফ্তারের দু'আ

ইফ্তারের সময় দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ মুহূর্ত। হাদীস শরীফে ঐ সময় দু'আ করার ব্যাপারে বিশেষ ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। ইফ্তার প্রসঙ্গে হাদীসে বিভিন্ন দু'আ বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিকে রোযা খুলছি (আবূ দাউদ)।

## ইফ্তার করানোর ফযীলত

রোযাদারকে ইফ্তার করানোর মধ্যেও বিশেষ সাওয়াব রয়েছে। এ সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্তার করাবে অথবা কোন মুজাহিদকে জিহাদের আসবাব প্রদান করবে সে রোযা ও জিহাদের অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্তার করাবে তা তার জন্য গুনাহ মাফের ও জাহান্নামের আগুন হতে নাজাতের কারণ হবে এবং সে ঐ রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। এতে রোযাদারের সাওয়াব বিন্দুমাত্র কম হবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের প্রত্যেকেরই তো রোযাদারকে ইফ্তার করানোর সামর্থ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ (পেট ভর্তি করে খাওয়ান জরুরী নয়) যে ব্যক্তি রোযাদারকে একঢোক দুধের শরবত অথবা একটি খেজুর বা একটু পানি দ্বারা ইফ্তার করাবে তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা এই সাওয়াব দান করবেন (বায়হাকী)।

## ইফ্তার সম্পর্কিত মাসাইল

কোন রোযাদার যদি এই ধারণায় ইফ্তার করে যে, সূর্যাস্ত হয়েছে। অথচ তখন সূর্যাস্ত হয়নি। তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবেনা (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফ্তার করে অতঃপর জানতে পারে যে, সূর্য ডুবেনি। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে ঐ রোযার কাযা করে নিবে (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ঃ সাওম অধ্যায়)।

সূর্যাস্ত সম্পর্কে সন্দেহ থাকাবস্থায় ইফ্তার করা জায়িয নয়। কেউ সে অবস্থায় ইফ্তার করলে এবং পরবর্তী সময়ে সূর্যাস্ত সম্পর্কে কিছু জানতে না পারলে তার উপর ঐ রোযার অবশ্যই কাযা ওয়াজিব হবে। ফকীহ্ আবূ জাফরের বরাত দিয়ে 'ফাতহুল কাদীরে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। আর যদি পরবর্তী সময়ে সূর্যাস্ত না হওয়া জানা যায় তাহলে তার উপর কাযা কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। আর যদি পরবর্তী সময়ে জানা যায় যে, ঐ সময় সূর্যাস্ত হয়ে গিয়ে ছিল তাহলে তার উপর কাযা, কাফ্ফারা কিছুই ওয়াজিব হবে না (তাতার খানিয়াহ ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

দু'জন সাক্ষ্য দিল যে, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে আর একজন সাক্ষ্য ছিল যে, সূর্যাস্ত হয়নি। ঐ অবস্থায় ইফ্‌তার করার পর পরবর্তীতে জানা গেল যে, সূর্যাস্ত হয়নি সে ক্ষেত্রে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে (তাতার খানিয়াহ)।

**ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইফ্‌তার করা**

সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে সাথে সাথে ইফ্‌তার করা উত্তম। মাগরিবের নামাযের আগে ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেন ঃ মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতদিন সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে ইফ্‌তার করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনটি বিষয় নবীগণের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ঃ

১. শীঘ্র ইফ্‌তার করা,

২. বিলম্বে সাহ্‌রী গ্রহণ করা,

৩. মিস্‌ওয়াক করা (শামী, ২য় খণ্ড)।

তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে সুর্য ডুবে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে ইফ্‌তার করবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

**বিলম্বে ইফ্‌তার করা**

বিলম্বে ইফ্‌তার করা মাকরূহ অর্থাৎ নক্ষত্রের আলো বিচ্ছুরিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে ইফ্‌তার করা মাকরূহ। তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীঘ্র ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব নয়। এ রকম দিনে যখন পূর্ণ বিশ্বাস হবে যে, সূর্য ডুবেছে তখনই ইফ্‌তার করবে। এর পূর্বে ইফ্‌তার করবে না। এমনকি সময়ের পূর্বেও আযানের শব্দ শুনা গেলেও ইফ্‌তার করবেনা (শামী, ২য় খণ্ড)।

www.pathagar.com

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# ই'তিকাফ

### ই'তিকাফের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও স্থান

ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা, কোন বস্তুর ওপর স্থায়ীভাবে থাকা। ই'তিকাফের মধ্যে নিজের সত্তাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয় এবং নিজেকে মস্‌জিদ হতে বের হওয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। শরী'আতের পরিভাষায় ই'তিকাফের নিয়্যতে পুরুষের ঐ মসজিদে অবস্থান করা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা হয় অথবা কোন মহিলার নিজ ঘরে নামাযের স্থানে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হল, দুনিয়ার সবরকম ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে একমাত্র তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা।

যে মসজিদে নিয়মিতভাবে আযান, ইকামত সহকারে জামা'আতের সাথে নামায আদায় হয় সেই মসজিদেই ই'তিকাফ করা সহীহ্ হবে। ই'তিকাফের সর্বোত্তম স্থান মসজিদুল হারাম, এরপর মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরপর মাসজিদে আক্‌সা। এরপর ঐ জুমু'আর মসজিদ, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়। এরপর সে মসজিদ যেখানে মুসল্লির সংখ্যা অধিক হয়ে থাকে (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ই'তিকাফ সহীহ্ হবে এমন মসজিদে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায় করা হয় (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

ইমাম জালালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) 'কেফায়া' গ্রন্থে হিদায়া কিতাবে উল্লিখিত কথাটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইমাম আযম আবূ হানীফ (রা.)-এর বক্তব্যে জুমু'আর মসজিদ ব্যতিত অন্য মস্‌জিদের কথা বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ যেখানে জুম'আর নামায আদায় করা হয় সেখানে অবশ্যই ই'তিকাফ সহীহ্ হয় (ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড)।

মহিলাগণ নিজ ঘরে নামাযের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ই'তিকাফ করবেন। নামাযের জন্য জায়গা নির্ধরিত না থাকলে ই'তিকাফে বসার সময় তা নির্ধারিত করে নিলেও সহীহ্ হবে। মসজিদে ইতিকাফে করা তাদের জন্য মাকরূহ (শামী, ২য় খণ্ড)।

মানতের ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। সুতরাং মানতের ই'তিকাফ কমপক্ষে একদিন করতে হবে। কেননা একদিনের কম সময়ে রোযা সহীহ্ হয় না। এ ছাড়া রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মু'আক্কাদায়ে কিফায়া। নফল ইতিকাফের জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই এবং এর জন্য রোযা রাখাও শর্ত নয়। এ ই'তিকাফ অল্প কিছুক্ষণের জন্যও হতে পারে এমনকি মসজিদে না বসে মসজিদ অতিক্রম করার সময়ও নফল ই'তিকাফের নিয়্যত করলে তা সহীহ্ হবে (তাহ্‌তাবী)।

www.pathagar.com

## ই'তিকাফের ফযীলত ও উপকারিতা

ই'তিকাফের ফযীলত ও উপকারিতা অপরিসীম। কেননা দুনিয়ার সবরকম ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, নিভৃতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য ই'তিকাফ করা হয়। ই'তিকাফকারী পুরুষ ও মহিলা বহু ধরণের গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। বান্দা ই'তিকাফ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত থাকে। এ জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমত, অনুগ্রহ ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। ই'তিকাফকারী ব্যক্তি পুরো সময় ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। আতা আল-খোরাসানী (র.) বলেছেন, ই'তিকাফকারী সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে সোপর্দ দিয়েছে এবং বলছে যে, আমি এ স্থান ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমাকে ক্ষমা করা হয়। এজন্যও ই'তিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম যে ই'তিকাফের মধ্যে বান্দা আল্লাহ্‌র ঘরে ইবাদতে মশগুল রাখার মাধ্যমে নিজের অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে (বাদাউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফের মধ্যে অন্তরকে দুনিয়াবী বিষয় থেকে মুক্ত করা হয়, নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করা হয়, আল্লাহ্‌র ঘরে নিজেকে আবদ্ধ রাখা হয় এবং আল্লাহ্‌র ঘরে নিজেকে সবসময় আটকিয়ে রাখা হয়। অধিকন্তু ই'তিকাফকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরের সঙ্গে নিজেকে স্থায়ীভাবে সম্পৃক্ত করে রাখে, যেন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। ই'তিকাফ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল যদি তা একনিষ্ঠতার সঙ্গে হয়ে থাকে (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ই'তিকাফকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, সে ই'তিকাফ এবং মসজিদে বদ্ধ থাকার কারণে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার নেকীর হিসাব সব ধরণের নেক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির ন্যায় জারী থাকে (ইব্‌ন মাজা)।

বান্দা যখন ই'তিকাফের নিয়্যতে নিজেকে মসজিদে আটকিয়ে রাখে তখন যদিও সে সালাত, যিকির ও তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে বহু সওয়াব অর্জন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু কিছু সাওয়াবের কাজ থেকেও সে বঞ্চিত হয়। সে রোগীর সেবা করতে পারে না। ইয়াতীম, বিধবা, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্তের সহযোগিতা করতে পারে না, কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারে না, জানাযার নামাযে শরীক হতে পারে না- যেগুলো খুবই পূণ্যের কাজ বলে হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সে জন্য উল্লিখিত হাদীসে ই'তিকাফকারী ব্যক্তির জন্য এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার আমলনামায় সেইসব ইবাদতের সাওয়াবও লেখা হবে, ই'তিকাফের কারণে যে গুলো থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল।

## রামাযানে ই'তিকাফের ফযীলত ও গুরুত্ব

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রামাযানের তৃতীয় দশক আগমন করলে সারা রাত জেগে থাকতেন, নিজের পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে রাখতেন (ইবাদত বন্দেগীতে) কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং উম্মুল মু'মিনীনগন থেকে দূরে থাকতেন (মুসলিম)।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রামাযানের তৃতীয়

www.pathagar.com

দশকে পরিশ্রম করতেন, যে রকম কঠোর পরিশ্রম অন্য সময়ে করতেন না (মুসলিম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রত্যেক রামাযানে দশদিন ই'তিকাফ করতেন; কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেছেন, সে বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছেন (বুখারী)।

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি ই'তিকাফ করেননি, এজন্যে পরের বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছেন (আবূ দাউদ)।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বদা রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি সফর করেছিলেন সে জন্যে পরের বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছেন (ইব্ন মাজা)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। বর্ণনাকারী নাফি (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) আমাকে মসজিদের সেই স্থানটি দেখিয়েছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ই'তিকাফ করেছেন (ইব্ন মাজা)।

হযরত ইব্ন উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন তাঁর জন্য বিছানা বিছানো হতো (আবূ লুবাবা ইব্ন মুনযির (রা.) -এর তাওবার খুঁটির পাশে (ইব্ন মাজা)।

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তুর্কী তাবূতে রামাযানুল মুবারকের প্রথম দশদিন ই'তিকাফ করেছেন। এরপর দ্বিতীয় দশ দিনও। এরপর তাবু থেকে মাথা বের করে বললেন, আমি এই (কাদরের) রাতের অনুসন্ধানে প্রথম দশদিন ই'তিকাফ করেছি। এরপর দ্বিতীয় দশদিনও। তার স্বপ্নে একজন ফিরিশ্তা এসে আমাকে বললেন যে এ রাতটি রামাযানের শেষ দশকে। কাজেই যে আমার সঙ্গে ই'তিকাফ করেছে, সে যেন শেষ দশদিনও ই'তিকাফ করে। আমাকে এ রাতটি দেখানো হয়েছিল। এবং তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। (আমি স্বপ্নে) দেখেছি যে, এ রাতের সকালে ফজরের নামাযে আমি পানি ও কাদামাটিতে সিজ্দা করছি। তোমরা এ রাতের অনুসন্ধান করবে শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে। বর্ণনাকারী বলেন, ছাদ থেকে ঐ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, তখন মসজিদের ছাদ গাছের ডালা দ্বারা নির্মিত ছাপড়ার ন্যায় ছিল। এতে মসজিদের ছাদ থেকে পানি টপ্কিয়ে পড়েছিল। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, (রামাযানের) একুশ তারিখ সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কপাল মুবারকে আমি স্বচক্ষে কাদামাটির চিহ্ন দেখেছি (মিশকাত)।

## ই'তিকাফের প্রকারভেদ ও হুকুম

ই'তিকাফ তিন প্রকার ঃ ওয়াজিব ই'তিকাফ, সুন্নাত ই'তিকাফ ও নফল ই'তিকাফ।

ওয়াজিব ই'তিকাফ ঃ ই'তিকাফ ওয়াজিব হয় মানত করার দ্বারা। মানত দুই ধরনের হতে পারে। সাধারণ মানত অথবা কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত মানত। সাধারণ মানত যেমন, কেউ বলল, আমি অমুক তারিখে ই'তিকাফ করা মানত করলাম। শর্তের সাথে সম্পর্কিত

www.pathagar.com

মানত যেমন, কেউ বলল আমার উদ্দেশ্য পূরণ হলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ই'তিকাফ করব। মানতের ই'তিকাফ সহীহ্ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত। এমন কি, কেউ যদি মানত করে যে, রোযা রাখা ব্যতীত আমি একমাস ই'তিকাফ করব তবু তার ই'তিকাফ আদায় কালে রোযা রাখতে হবে। মানত সহীহ্ হওয়ার জন্য মানতের কথা মুখে উচ্চারণ করা জরুরী। মনে মনে নিয়্যত করার দ্বারা মানত হয় না। এ প্রকার ই'তিকাফের হুকুম হলো, নিজের ওপর থেকে ওয়াজিব সাকিত হওয়া এবং সাওয়াব হাসিল করা (হাশিয়াতুত্ তাহ্‌তাবী ও বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

সুন্নাত ই'তিকাফ ঃ রামাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফে যা সুন্নাত মুয়াক্কাদা কিফায়া। মহল্লাবাসীর কোন একজন তা আদায় করলে অন্য সকালে দায়মুক্ত হবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই তরকে সুন্নাতের জন্য দায়ী হবে।

এই প্রকার ই'তিকাফের হুকুম হলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া থেকে মুক্ত হওয়া এবং সাওয়াব হাসিল করা (হাশিয়াতুত্ তাহতাবী ও বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

নফল ই'তিকাফ ঃ মানতের ই'তিকাফ এবং রামাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ ব্যতীত অন্য সময়ের ই'তিকাফ এ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত নয়। সময়ের ব্যপারেও কোন সীমাবদ্ধতা নেই। দিনে বা রাত্রে যে পরিমাণ সময়ের জন্য ইচ্ছা নিয়্যত করে ই'তিকাফ করা যাবে।

## ই'তিকাফের শর্তাবলী

১. নিয়্যত করা। নিয়্যত করা ব্যতীত ই'তিকাফ করলে ই'তিকাফ সহীহ্ হবে না।

২. পুরুষের জন্য এ রকম মসজিদ হতে হবে, যেখানে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা হয়। (তবে নফল ই'তিকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে)। মহিলাগণ নিজেদের ঘরের সালাত আদায়ের স্থানে ই'তিকাফ করবে। তারা প্রয়োজন ব্যতীত এ স্থান থেকে বের হবে না।

৩. রোযা রাখা, তবে নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত নয়।

৪. মুসলমান হওয়া, কেননা কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইবাদতের যোগ্যতা রাখে না।

৫. আকিল-জ্ঞানবান হওয়া। প্রাপ্তবয়স্ক বা বালিগ হওয়া। ই'তিকাফ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এ জন্য জ্ঞানবান অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার ই'তিকাফও সহীহ্ হয়, যেমনিভাবে তাদের নামায ও রোযা দুরস্ত হয়।

৬. নারী পুরুষ সকলের জানাবাত বা গোসল ফরয হয় এমন অপবিত্রতা থেকে এবং নারীদের হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

## ই'তিকাফের নিয়ম

ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। সুতরাং রমযানে হোক, অথবা রমযান ছাড়া

www.pathagar.com

অন্য সময়ে- সর্বাবস্থায় এই প্রকার ই'তিকাফের মধ্যে রোযা রাখা জরুরী।

কেউ যদি একদিন ই'তিকাফ করার মানত করে তবে তার উপর শুধু দিনের ই'তিকাফই ওয়াজিব হবে। সুতরাং সে সুবহে সাদিকের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং সূর্যাস্তের পর বের হবে। আর যদি সে ই'তিকাফের মানত করার সময় রাতসহ নিয়্যত করে থাকে, তবে রাতও অন্তর্ভূক্ত হবে (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

কেউ যদি নির্দিষ্ট দিনের বা কোন নির্দিষ্ট তারিখের ই'তিকাফের মানত করে তবে তাকে ঐ নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখেই তা আদায় করতে হবে। শরয়ী ওযর ব্যতীত তা আদায়ে বিলম্ব করা জায়েয নয়। অবশ্য ওযর থাকলে জায়িয হবে। কেউ যদি মানত করে যে, সে রাতে ই'তিকাফ করবে, তাহলে তার মানত সহীহ্ হবে না। কেননা মানতের ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। আর রাত রোযা রাখার সময় নয় (বাহরুর রাইক,২য় খণ্ড)।

কেউ যদি একদিনের ই'তিকাফের মানত করে তবে তার উপর শুধু দিনের ই'তিকাফ-ই ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ একদিনের ই'তিকাফের মানত করে এবং দিন-রাত উভয়েই নিয়্যত করে তবে তার উপর একদিন একরাতের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে।

কেউ যদি দুই তিন বা ততোধিক দিনের ই'তিকাফের মানত করে তবে দিন রাত উভয় সময়ের-ই ই'তিকাফ করতে হবে।

যদি কেউ এই মানত করে যে, দুই বা তিন অথবা এরচেয়ে বেশী সংখ্যক রাতে ই'তিকাফ করবে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য শুধু রাতই হয়ে থাকে, তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি রাত বলে তার উদ্দেশ্য রাতসহ দিনও হয়ে থাকে, তবে দিন-রাত উভয়েরই ই'তিকাফ করতে হবে (আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

রামাযানুল মুবারকের বিশ তারিখ আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্বে শেষ দশকের ই'তিকাফের নিয়্যত করে ই'তিকাফকারী মসজিদে প্রবেশ করবে শরয়ীভাবে ঈদের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে ই'তিকাফ খতম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মিরকাত শরহে মিশকাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে চার ইমামের সকলের-ই এ মত যে একমাস ই'তিকাফ করার ইচ্ছা থাকুক বা দশদিন উভয় অবস্থায়ই ই'তিকাফকারী ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে আগের দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে (মিশ্কাত, ৪র্থ খণ্ড)।

মহিলাগণ নিজেদের ই'তিকাফের স্থানে এবং পুরুষগণ মসজিদের প্রবেশ করার সময় অথবা প্রবেশ করে মনে মনে এরূপ নিয়্যত করবে যে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য রামাযানুল মুবারকের শেষ দশদিনের সুন্নাত ই'তিকাফ শুরু করছি।

সুন্নাত ই'তিকাফের নিয়্যত বিশ তারিখ রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বেই করতে হবে। যদি সূর্যাস্তের পর নিয়্যত করা হয়, তবে এ ই'তিকাফ সুন্নাত থাকবে না, বরং নফল হয়ে যাবে। কেননা, নিয়্যত করার পূর্বে শেষ দশদিনের কিছু অংশ এ রূপ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যেখানে ই'তিকাফের নিয়্যত করা হয়নি। সুতরাং পুরো দশদিনের ই'তিকাফ হয়নি।

নফল ই'তিকাফ বলা হয়, যে ই'তিকাফের মধ্যে দিন বা সময়ে কোন নির্ধারিত সীমা থাকে না। অর্থাৎ ওয়াজিব ও সুন্নাত ই'তিকাফ ব্যতীত যে পরিমাণ সময়ের জন্যই হোক, তা নফল ই'তিকাফ।

www.pathagar.com

নফল ই'তিকাফের জন্য এরূপ নিয়্যত করবে ঃ হে আল্লাহ্! যতটুকু সময় আমি এ মসজিদে থাকব, ততটুকু সময়ের জন্য ই'তিকাফের নিয়্যত করছি। আর শুধু মনে মনে নিয়্যত করলেই যথেষ্ট হবে, মুখে বলা জরুরী নয় (বাহরুর রাইক)।

যদি দশদিনের কম সময়ের নিয়্যত করা হয় তবে তা নফল ই'তিকাফ হয়ে যাবে। নফল ই'তিকাফ বছরের যে কোন সময়েই করা যায়। তবে রামাযান শরীফে করলে সাওয়াব বেশী হয়। যদি কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে ই'তিকাফেরও নিয়্যত করে, তবে সে ই'তিকাফেরও সাওয়ার পাবে।

## ই'তিকাফের আদাবসমূহ

১. অহেতুক কথা না বলা। যথাসম্ভব পূণ্যের আলোচনায় মশগুল থাকা।

২. উত্তম মসজিদ নির্বাচন করা। যেমন, মসজিদে হারাম বা জামে মসজিদ ইত্যাদি।

৩. বেশী বেশী করে কুরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফ পাঠ করা।

৪. যিক্‌র করা।

৫. ইল্‌মে দীন শিক্ষা করা।

৬. ইল্‌মে দীন শিক্ষা দেওয়া।

৭. সীরাতুন্নবী (সা.) অধ্যয়ন করা।

৮. আম্বিয়া এবং আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করা।

৯. শরয়ী আহ্‌কামের কিতাবাদি পাঠ ও রচনা করা।

১০. যে সব কথায় গোনাহও নেই এবং সাওয়াব নেই, অর্থাৎ মোবাহ্ কথা প্রয়োজন ছাড়া না বলা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, শামী, ২য় খণ্ড ও মারাকিল ফালাহ্)।

## যে যে কারণে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি শরয়ী প্রয়োজন এবং মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। শরয়ী প্রয়োজন যেমন, জুমু'আর সালাতের জন্য বের হওয়া। মানবীয় প্রয়োজন যেমন, মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য যাওয়া। মহিলাগণ যদি ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে ঘরের অন্যত্র যায় তবে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর অল্প সময় মসজিদের বাইরে থাকলেও ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে বের হলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কিছুক্ষণের জন্য বের হয় সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি রোগীর শুশ্রূষা করার জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে কেউ যদি ই'তিকাফের মানত করার সময় রোগী শুশ্রুষা, জানাযার নামায এবং ইল্‌মের মজলিসে

www.pathagar.com

উপস্থিত হওয়ার শর্ত করে নেয়, তবে তার জন্য এ কাজগুলো জায়িয আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

স্ত্রী সংগম বা এর আনুসংগিক কার্যাবলী যেমন, চুম্বন, স্পর্শ, আলিংগন ইত্যাদি কাজসমূহ করা ই'তিকাফ অবস্থায় হারাম। স্ত্রী সংগমে বীর্যপাত হউক বা না হউক ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভূলবশত হোক, দিনে হউক বা রাতে হোক সর্বাবস্থায় ই'তিকাফ ভংগ হয়ে যাবে। আনুসংগিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বীর্যপাত হলে ই'তিকাফ ভংগ হবে, অন্যথায় ভংগ হবে না। চিন্তা বা দৃষ্টি দেওয়ার কারণে যদি বীর্যপাত হয় বা কারো স্বপ্নদোষ হয় তবে এর দ্বারা ই'তিকাফ ভংগ হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শুধুমাত্র বেহুশী বা পাগল হওয়াতে ই'তিকাফ ভংগ হবে না। তবে এ অবস্থায় যদি একাধিক দিবস অতিবাহিত তবে ই'তিকাফ ভংগ হয়ে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফ অবস্থায় যদি কোন মহিলার মাসিক এসে যায়, তবে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

উপরি বর্ণিত কারণসমূহের দ্বারা ই'তিকাফ ভংগ হয়ে গেলে তা পরবর্তীতে যথানিয়মে কাযা করে নিতে হবে।

## ই'তিকাফকারীর জন্য জায়িয কাজসমূহ

১. মসজিদে পানাহার করা,

২. মসজিদে নিদ্রা যাওয়া,

৩. মসজিদের মিনারায় আরোহণ করা। মসজিদের মিনারা যদি মসজিদের অংশবিশেষ হয় তাহলে সকল ই'তিকাফকারীর জন্য তাতে আরোহন করা জায়িয। আর যদি মিনারা মসজিদের অংশ না হয় তাহলে সেখানে শুধু মুআয্যিন ই'তিকাফকারী আযানের জন্য আরোহণ করতে পারবেন। অন্য ই'তিকাফকারীদের জন্য আরোহণ করা জায়িয নয়।

৪. ই'তিকাফকারীর মাথা ধৌত করার জন্য মসজিদ থেকে মাথা বের করা।

৫. মস্জিদে অযূ বা গোসল করার দ্বারা যদি মসজিদ অপবিত্র বা ময়লাযুক্ত হওয়ার আশংকা না থাকে তবে মসজিদে অযূ বা গোসল করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৬. ই'তিকাফকারীর জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা।তবে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্য মসজিদে প্রবেশ করানো জায়িয নয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

৭. ই'তিকাফকারীর বিবাহ করা,

৮. ই'তিকাফকারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং মাথায় তৈল লাগোনো জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ই'তিকাফকারীর জন্য নাজায়িয কাজসমূহ

১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা।

২. ক্রয়- বিক্রয়ের বস্তু মসজিদে উপস্থিত করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা।

www.pathagar.com

৩. ই'তিকাফ অবস্থায় কথা না বলাকে ইবাদত মনে করে নিরব থাকা, তবে গোনাহ জনিত কথা পরিহার ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফ অবস্থায় মজুরী নিয়ে কোন কাজ করা মাকরূহ। এক্ষেত্রে যেসব কাজ মসজিদে মাকরূহ ঐ সব কাজ মসজিদের ছাদে করা মাকরূহ (বাহারুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

### ই'তিকাফকারীর জন্য জুমু'আর সালাতে অংশগ্রহণ

পাঞ্জেগানা মসজিদে ই'তিকাফকারী ব্যক্তি জুমু'আর নামায আদায়ে উদ্দেশ্যে নিজ মসজিদ থেকে বের হয়ে নিকটবর্তী জুমু'আর মসজিদে গিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারবে।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি জুমু'আর মসজিদে গিয়ে ফরযের পূর্ববর্তী সুন্নাত, খুত্বা, জুমু'আর ফরয আদায় এবং জুমু'আর ফরযের পরবর্তী ছয় রাক'আত সুন্নাত আদায় করা পরিমাণ সময় পর্যন্ত জুমু'আর মসজিদে অবস্থান করতে পারবে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে জুমু'আর মসজিদ নিকটবর্তী হলে যাওয়ালের পরে এবং দূরবর্তী হলে এতটুকু সময় পূর্বে নিজ মসজিদ থেকে বের হবে যেন ফরযের পূর্ববর্তী সুন্নাত আদায় করা যায় এবং খুত্বা শুনা যায়। পাঞ্জেগানা মসজিদে ই'তিকাফকারী ব্যক্তি যদি জুমু'আর মসজিদে নামায আদায় করতে গিয়ে নামায আদায়ের পরেও সেখানে অবস্থান করে তবে তাতে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। এমনকি যদি ঐ জুমু'আর মসজিদে একদিন একরাত অবস্থান করে অথবা ঐ জুমু'আর মসজিদে অবস্থান করেই ইতিফাক পূর্ণ করে তাতেও ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। তবে প্রয়োজন ব্যতিত এরূপ করা মাকরূহ তানযীহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

### ই'তিকাফকারীর জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ

ই'তিকাফকারী রোগী দেখতে অথবা জানাযার সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। তবে নফল ই'তিকাফকারী রোগী দেখার উদ্দেশ্যে অথবা জানাযার সালাতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। যদি কোন ই'তিকাফকারী ব্যক্তি কোন বৈধ কাজ যেমন, মানবীয় প্রয়োজন অথবা জুমু'আর সালাতের জন্য বের হওয়ার পর পথে কোন রোগী দেখে নেয় অথবা উপস্থিত জানাযার সালাত কোন রোগী দেখতে গেল অথবা জানাযার সালাত আদায় করে নেয় তবে তা জায়িয (শামী, ২য় খণ্ড)।

কেউ যদি ই'তিকাফের মানত করার সময় এ নিয়্যত করে যে, সে ই'তিকাফ অবস্থায় রোগী দেখতে যাবে, জানাযার সালাত আদায় করতে যাবে এবং ইল্মী মজলিসে উপস্থিত হবে তবে তার জন্য ই'তিকাফ অবস্থায় এ কাজসমূহের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার জায়িয (শামী ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### যে সব কারণে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারেন

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি তিন ধরণের প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে পারে। যেমন ঃ

১. শরয়ী প্রয়োজন,

www.pathagar.com

২. মানবীয় প্রয়োজন,

৩. একান্ত অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি শরয়ী প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। যেমন, জুমু'আ ও দুই ঈদের নামায। মিনারার দরজা মসজিদের বাইরে থাকলেও ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মিনারায় গিয়ে আযান দেওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি এমন সব মানবীয় প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যেতে পারবে, যে কাজগুলো একান্ত প্রয়োজন এবং তা মসজিদে বসে করাও যায় না। যেমন, মলমূত্র ত্যাগ করা এবং ফরয গোসল আদায় করা।

একান্ত অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনেও ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। যেমন মসজিদ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে, যালিম ব্যক্তি ই'তিকাফকারী ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দিলে অথবা কোন অত্যাচারীর কারণে নিজের জান অথবা মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই অন্য মসজিদে ই'তিকাফের জন্য চলে যাবে (মারাকিল ফালাহ্)।

## ই'তিকাফ ফাসিদ হলে তার হুকুম

যে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যায় তা ওয়াজিব ই'তিকাফ হলে সক্ষম হওয়ার পর এর কাযা করতে হবে। ই'তিকাফ কাযা করার সঙ্গে সঙ্গে রোযাও কাযা করতে হবে। যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের ই'তিকাফের মানত করা হয় তবে যে কয়দিনের ই'তিকাফ ছুটে গেছে সে কয়দিনের ই'তিকাফের কাযা করতে হবে। প্রথম থেকে নতুন করে পুনরায় কাযা করতে হবে না। যদি কেউ নির্দিষ্টভাবে কোন মাসের ই'তিকাফের মানত করে অতঃপর কোন একদিনের ই'তিকাফ ভেঙ্গে ফেলে, তবে নূতন করে পুন একমাসের ই'তিকাফ কাযা করতে হবে। উল্লিখিত উভয় অবস্থাতে চাই বিনা ওযরে নিজের কাজের মাধ্যমে ই'তিকাফ ভঙ্গ হোক যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া হোক, অসুস্থ হয়ে মসজিদ থেকে বের হতে বাধ্য হওয়া অথবা ব্যক্তির কোন ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভঙ্গ হোক যেমন মহিলাদের ঋতুস্রাব হওয়া উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

কেউ যদি নাউযুবিল্লাহ মুরতাদ হয়ে যায় এবং এরপর তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে তার জন্য পূর্ব বাতিলকৃত ই'তিকাফের কাযা করতে হবে না।

কোন ব্যক্তি মানতের ই'তিকাফ পালনকালে পাগল হওয়ার কারণে যদি তার ই'তিকাফ ভঙ্গ হয় এবং তা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে তাহলে যখনই সুস্থ হবে তখনই তাকে রোযা সহ ই'তিকাফের কাযা করতে হবে।

নফল ই'তিকাফ যদি কেউ একদিন পূর্ণ হওয়ার আগেই ভেঙ্গে দেয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না।

মানতের ই'তিকাফ যদি ছুটে যায়, তবে হয়তো তা নির্দিষ্ট মাসের মানত হবে, অথবা অনির্দিষ্ট মাসের। নির্দিষ্ট মাসের কিছু অংশের ই'তিকাফ যদি ছুটে যায় তবে সেই অংশের ই'তিকাফ পূর্ণ করলেই চলবে। নতুন করে সবগুলো পালন করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

মাসের সবগুলোই যদি নির্ধারিত সময় থেকে ছুটে যায় তবে সবগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা জরুরী। উক্ত ব্যক্তি যদি কাযা না করে এবং জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যায়, তবে উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যে তার এই অসিয়্যাত করা ওয়াজিব যে, তারা যেন প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একজন মিস্‌কীনকে দু'বেলা খাবার দান করে।

উল্লেখ্য এই ফিদ্‌য়া রোযার কারণে দিতে হচ্ছে। যেমন, রামাযানের রোযার পরিবর্তে দিতে হয়। আর যদি উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট মাসের এক অংশের কাযা করে এবং অপর অংশের না করে তবু উল্লিখিত হুকুম।তবে শর্ত হলো মানতের সময় সে ব্যক্তি সুস্থ হতে হবে। আর যদি মানতের সময় সে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে থাকে এবং অসুস্থ অবস্থায়-ই নির্ধারিত সময় চলে যায় এবং তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট কোন মাসের মধ্যে নয়, বরং অনির্দিষ্টভাবে করে থাকে, তাহলে পুরো জীবন-ই তার সময়। যে কোন সময়ই-ই সে পালন করুক, তা কাযা হবে না, বরং আদায় করা হয়েছে বলা হবে (বাদায়েউস্ সানায়ে)।

রামাযানের শেষ দশদিনের ই'তিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। এ ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী। এই ই'তিকাফ শুরু করার পর ভঙ্গ করে দেওয়া হলে অথবা ভঙ্গ হয়ে গেলে, যে কয়দিনের ছুটে গেছে রোযাসহ সে কয়দিনের কাযা জরুরী। কিন্তু একদিনের ছুটলেও রামাযানের পর সতর্কতামূলক পুরো দশদিনের কাযা করে নেওয়া উত্তম (শামী, ২য় খণ্ড)।

## লাইলাতুল কাদ্‌রের ফযীলত ও তাৎপর্য

পবিত্র কুরআনে লাইলাতুল কাদরের ফযীলত সম্পর্কিত একটি পরিপূর্ণ সূরা রয়েছে। সূরাটির নাম 'সূরা আল-কাদ্‌র'। সূরাটিতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ
شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ
الْفَجْرِ .

আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কাদর - মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে আপনি জানেন? লাইলাতুল কাদ্‌র বা মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ্‌(হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি সেই রজনী, সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

এ সূরাটির শানে নুযূল সম্পর্কে বিখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনী ইসরাঈলের একজন মুজাহিদের অবস্থা উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি লাগাতার এক হাজার মাস পর্যন্ত জিহাদে মশগুল ছিলেন। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এ রাত হাযার মাসের চেয়েও উত্তম (মা'আরিফুল কুরআন)।

এই মহিমান্বিত রজনীকে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' নামে অভিহিত করার তাৎপর্য কী ? এ সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিম শরীফের টীকাকার ইমাম নববী (র.) লিখেছেন, এ রাতের নাম 'লাইলাতুল কাদ্‌র' এইজন্য রাখা হয়েছে যে কাদ্‌র মানে তাক্‌দীর বা ভাগ্য। আর এই রাতে মানুষের

www.pathagar.com

পরবর্তী এক বছরের তাক্দীর বা ভাগ্য, রিযিক, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি কতর্ব্যরত ফিরিশ্তাদের কাছে ন্যাস্ত করা হয়। অথবা কাদর মানে সম্মান ও মর্যাদা। আর যেহেতু এ রাতের সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশী, তাই এই রাতকে 'লাইলাতুল কাদ্র' বলা হয় (মুসলিম)।

আবূ বকর ওয়াররাক বলেছেন, কাদ্র মানে সম্মান ও মর্যাদা। এই রাতকে 'লাইলাতুল কাদ্র' এই জন্য বলা হয় যে, পূর্ববর্তী জীবনে আমল না করার কারণে যে মানুষের কোন সম্মান বা মর্যাদাই ছিল না, সেও এই রাতে তাওবা ইস্তিগ্ফার এবং ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে (মা'আরিফুল কুরআন)।

লাইলাতুল কাদরের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রামাযান মাসে রোযা রাখে, তার পিছনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কাদ্রে রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকে তার পিছনের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় (বুখারী)।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ লাইলাতুল কাদ্রে জিব্রাঈল (আঃ) একদল ফিরিশ্তা নিয়ে অবতরণ করেন এবং দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় যারা আল্লাহ্র যিকিরে মশগুলকে তাদের জন্য রহমতের দু'আ করেন।

'লাইলাতুল কাদ্র' কোন রাত এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা লাইলাতুল কাদ্র অনুসন্ধান কর রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে (মিশকাত)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদ্র অনুসন্ধান করতে চায় সে যে রামাযানের শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করে (মুসলিম)।

যির ইব্ন হুবাইশ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলে থাকেন, যে ব্যক্তি সারা বছর রাত জেগে ইবাদত করবে সে 'লাইলাতুল কাদ্র' পারে। (এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?) তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের উপর রহম করুন তিনি চাচ্ছেন মানুষ যেন সারা বছর লাইলাতুল কাদ্র পাওয়ার আশায় রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকে। অথচ তিনি তো অবহিত রয়েছেন যে, লায়লাতুল কাদ্র রামাযানেই হয়ে থাকে এবং তা রামাযানের শেষ দশকেই রয়েছে এবং তা অবশ্যই রামাযানের সাতাশতম রাতে। এরপরে তিনি শপথ করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, তা সাতাশতম রজনীতেই (মুসলিম)।

মোটকথা, লাইলাতুল কাদ্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে রামাযানের শেষ দশকের রোযার রাতসমূহে ইবাদতে মশগুল বাঞ্ছনীয়। তবে সাতাশতম রাতের ব্যাপারে নির্দিষ্ট রেওয়াতে পাওয়া যায় এবং এ মোতাবেক উম্মাতের আমল জারী রয়েছে।

www.pathagar.com

## লাইলাতুল কাদ্‌রের আমল

লাইলাতুল কাদ্‌রের আমল সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি লাইলাতুল কাদ্‌র পেয়ে যাই তবে সে রাতে আমি কী দু'আ করব ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন (মিশ্‌কাত)

এ রাতের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন ইবাদতের উল্লেখ নেই। তবে যেহেতু রাতটি খুবই মহিমান্বিত তাই এ রাতে বেশী বেশী করে নফল নামায, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, দরূদ, তাসবীহ্-তাহ্‌লীল,যিকির-আযকার, দান-খয়রাত, তাওবা-ইসতিগ্‌ফার করবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# যাকাত অধ্যায়

# كِتَابُ الزَّكوة

www.pathagar.com

## প্রথম পরিচ্ছেদ

# যাকাত

### যাকাতের সংজ্ঞা ও পরিভাষা

'যাকাত' (زكواة) একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া, বরকত লাভ হওয়া, প্রশংসা করা ইত্যাদি। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে এসব অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (শামী ২য় খণ্ড)।

শরীয়াতের পরিভাষায় 'যাকাত' বলা হয় নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (শতকরা ২.৫০ টাকা হারে) যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে প্রদান করা। নিসাবের মালিক ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করা এবং তা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এর ফরযিয়াত অস্বীকার করা কুফরী। ইসলামী শরীয়াতে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বছর অতিবাহিত হলে সাথে সাথে এর যাকাত আদায় করা ফরয। বিনা কারণে বিলম্ব করলে গুনাহ্গার হবে।

### যাকাত ফরয হওয়ার দলিল

দ্বিতীয় হিজরী সনে যাকাত ফরয হয়েছে। কুরআন হাদীস ও ইজমার দ্বারা যাকাতের ফরযিয়াত প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

তোমরা নামায কায়িম কর ও যাকাত আদায় করে দাও, আর যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' কর (২ ঃ ৪৩)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করুন। আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। আপনার দু'আ তাদের জন্য চিত্ত প্রশান্তি-কর, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ (৯ ঃ ১০৩)।

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ

www.pathagar.com

এবং তাদের ধনীদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক (৫১ ঃ ১৯)।

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

আর যারা সোনা রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না অর্থাৎ যাকাত দেয় না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন (৯ ঃ ৩৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

بُنِىَ الإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةَ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ و أَن مُحَمَّد رَسُول اللّٰه وإقَام الصَّلٰوة و إِيْتَاءِ الزَّكوة و صَوم رَمَضَان و حَج البَيت مَن استَطَاع إلَيه سَبِيلا

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর ঃ

১. এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল,
২. নামায কায়িম করা,
৩. যাকাত প্রদান করা,
৪. রামাযান মাসে রোযা রাখা ও
৫. বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য হজ্জ আদায় করা (বুখারী ও মুসলিম)।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

اعبُدُوا رَبَّكُم و صَلُّوا خَمسَكُم و صُومُوا شَهرَكم و حَجُّوا بَيتَ رَبِّكُم و أَدُّوا زَكَاةَ أَموَالِكم طِيبَةً بِهَا أَنفُسكُم تَدخُلوا جَنَّةَ رَبِّكم

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রামাযান মাসে রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ আদায় করবে। এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে (তিরমিযী)।

যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের ইজ্মা সংগঠিত হয়েছে (হিদায়া, ১মখণ্ড)।

## যাকাত ফরয হওয়ার হিক্মত ও উপকারিতা

যাকাত আদায়ের মধ্যে বহু হিক্মত ও উপকারিতা নিহিত আছে। যেমন – যাকাত আদায়ের দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং অন্তরের পবিত্রতা লাভ হয়। এতে মানুষের অন্তর থেকে কৃপণতার মনোভাব বিদূরিত হয়। ঈমানী শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। এবং ধন-সম্পদের মহব্বত ও মোহ কেটে যায়।

www.pathagar.com

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে হামদর্দী ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। একে অন্যের সুখে-দুঃখে সাহায্য সহযোগিতার অভ্যাস ও পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং ধনীদের সম্পদে গরীবের যে হক রয়েছে তা আদায় হয়। যাকাত দান করলে এর উসিলায় গুনাহ মাফ হয় এবং ধন সম্পদে বরকত হয়। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দেয়া নি'আমতের শুক্‌রিয়া আদায় হয় এর বরকতে যথাসময়ে বর্দ্ধিত হয় ও ফলন ভাল হয়।

## যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত সমূহ রয়েছে ঃ

১. আযাদ হওয়া অর্থাৎ কৃতদাস না হওয়া। কেননা ক্রীতদাস কোন সম্পদের মালিক হয় না। অর্থাৎ গোলাম হলে তার উপর যাকাত ফরয হবেনা, কেননা সে কোন মাল সম্পদের মালিক হয় না।

২. মুসলিম হওয়া অমুসলিমের উপর যাকাত ফরয হয় না,

৩. বালিগ ও জ্ঞানবান হওয়া। নাবালিগ ও পাগলের উপর যাকাত ফরয নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক যখনই প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন থেকে সম্পদের বছর গণনা আরম্ভ হবে। এবং বছরপূর্ণ হলে সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

৪. মাল-নিসাব পরিমাণ হওয়া, নিসাব পরিমাণ মাল না হলে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

৫. পূর্ণ মালিকানা থাকা। অর্থাৎ মালের উপর মালিকানা স্বত্ব ও দখল থাকতে হবে। মালিকানা স্বত্ব আছে কিন্তু দখল নেই অথবা দখল আছে কিন্তু মালিকানা স্বত্ব নেই এরূপ মালের যাকাত ফরয হবে না।

৬. মাল সম্পদ ঋণমুক্ত হতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ ঋণ যার তাগাদাকারী কোন মানুষ রয়েছে। এ জাতীয় ঋণ হতে মুক্ত হতে হবে। যদি মুক্ত না হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

৭. মাল-সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। যেমন বসবাসের গৃহ, পরিধানের পোযাক পরিচ্ছদ, গৃহস্থালীর আসবাব পত্র, যাতায়াতের যানবাহন, প্রয়োজনীয় অস্ত্র, প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এ সবের উপর যাকাত ফরয হয় না। অনুরূপ পারিবারিক সাজসজ্জার আসবাবপত্র (যা সোনা রূপার নয়) এবং হিরা মূল্যবান পাথর বা ব্যবসার জন্য নয় তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে এসব যদি ব্যবসার জন্যে হয় তাতে যাকাত ফরয হবে। শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি ও গ্রন্থাদি যা ব্যবসার জন্য নয় তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

৮. নেসাবের মাল ক্রমবর্ধনশীল হতে হবে। তা প্রত্যক্ষভাবে হোক যেমন- ব্যবসার মাল বা পরোক্ষভাবে হোক যেমন- সোনা রূপা বা তার দ্বারা প্রস্তুতকৃত অলংকার ইত্যাদি।

৯. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর ঐ সম্পদ একচন্দ্র বছর তার মালিকানায় থাকতে হবে। যদি বছরের প্রথম ও শেষে মাল নিসাব পরিমাণ থাকে কিন্তু বছরের মাঝখানে নিসাব হতে কিছু কমে যায় তাতেও যাকাত ফরয হবে। যদি কোন ব্যক্তি

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী মাস পরিবর্তন করে নেয় তা হলেও যাকাত দিতে হবে। সাহেবে নিসাব ব্যক্তি বছরের মধ্যখানে আরো কোন সম্পদের মালিক হলে ঐ সমস্ত সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়্যত করা শর্ত। অর্থাৎ যাকাত আদায় করার সময় বা যাকাতের মাল অন্য মাল থেকে পৃথক করার সময় যাকাত আদায়ের নিয়্যত করতে হবে। যাকাতদাতা যাকাতের মাল প্রদান করার সময় যদি যাকাতের নিয়্যত না করে থাকে পরে যাকে মাল দেওয়া হয়েছে তার মালিকানায় উক্ত মাল থাকা অবস্থায় যেন যাকাতের নিয়্যত করে নেয়, যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের নিয়্যাতে নিজের যাকাতের মাল বন্টন করার জন্য অন্য কারো হাওয়ালা করে তবে বন্টনকারী ব্যক্তি মাল বন্টনের সময় যাকাতের নিয়্যত না করলেও যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হয়ে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

নিয়্যতের ক্ষেত্রে অন্তরের ইচ্ছাই ধর্তব্য হবে। সুতরাং কেউ যদি অন্তরে যাকাতের নিয়্যত করে তা বন্টনের সময় মুখে অন্য কোন শব্দ যেমন, হেবা, ঋণ ইত্যাদি উচ্চারণ করে তবে এতেও যাকাত বিশুদ্ধ হবে। অথবা মালওয়ালা কোন অমুসলিমকে যাকাতের মাল সোপর্দ করেছে অথচ তা ফকীর মিস্‌কীনকে দেওয়ার জন্য নিয়্যত ছিল তাহলেও যাকাত আদায় হবে। কেননা আদেশদাতার নিয়্যতই প্রযোজ্য।

কোন ব্যক্তি যদি উকিলের নিকট যাকাতের মাল সোপর্দ করার সময় নিয়্যত করে যে ইহা নফল সাদাকা বা কাফ্‌ফারা। পরে উকিলের হাতে সে মাল থাকা অবস্থায় সে যাকাতের নিয়্যত করে নেয় অথচ উকিল তা জানল না বরং সে নফল বা কাফ্‌ফারার নিয়্যতেই যাকাতের মাল গ্রহীতাকে দিয়ে দিল তাহলেও যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

দুই ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে যাকাতের মাল বন্টন করার উকিল বানিয়েছে এবং তার কাছে উভয়েই যাকাতের মাল হস্তান্তর করে দিয়েছে। সে উভয়ের মাল একত্রিত করে ফেলে তাহলে এ দান তার নিজের পক্ষ হতে দান বলে গণ্য হবে। এবং তাদের যাকাত আদায় হবে না। কাজেই তাদের উভয়ের মালের জন্য দায়ী থাকবে। তবে যদি তারা উভয়ে পূর্ব হতেই একত্রিত করার অনুমতি দিয়ে থাকে অথবা একত্রিত করার পর ফকীর মিস্‌কীনকে দেওয়ার পূর্বে তারা অনুমতি প্রদান করে তাহলে যাকাত আদায় হবে। এ ক্ষেত্রে যদি স্পষ্ট অনুমতির পরিবর্তে অনুমতির ইঙ্গিতও পাওয়া যায় তাহলেও উভয়ের যাকাত আদায় সহীহ্ হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

কোন ব্যক্তি যদি ফকীর মিস্‌কীনের পক্ষ থেকে উকিল হয় আর সে যাকাতের মাল গ্রহণের পর মিলিয়ে ফেলে তাহলেও যাকাত আদায় হবে। একাধিক ফকীর ব্যক্তি যদি সম্মিলিতভাবে কোন এক ব্যক্তিকে যাকাত গ্রহণের উকিল বানায় এবং তার নিকট এ পরিমাণ মাল জমা হয় যে, তাদের মধ্যে এ মাল বন্টন করা হলে তারা প্রত্যেকেই নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়ে যায়, এর পরও উক্ত উকিল ব্যক্তির নিকট যাকাতের মাল প্রদান করা হলে যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় সহীহ্ হবে না। কিন্তু প্রত্যেকের মাল নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত দাতাদের

www.pathagar.com

যাকাত সহীহ্ হবে। আর যদি একাধিক ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে কোন এক ব্যক্তিকে উকিল নির্ধারণ করে তবে উকিলের নিকট জমাকৃত মাল প্রত্যেকের অংশে পূর্ণ নিসাব পরিমাণ হলে এ অবস্থায় উকিলের নিকট যাকাত প্রদান করলে যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় সহীহ্ হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

আর যদি যাকাত গ্রহণকারী ফকীরদের পক্ষ হতে উকিল না হয় বরং সে নিজেই স্বেচ্ছায় ফকীরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করে তাহলে তার নিকট জমাকৃত মাল নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয়ে গেলেও যাকাত দাতের যাকাত আদায় সহীহ্ হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

উকিল যদি তার নিজের অভাবগ্রস্ত বালিগ সন্তান বা স্ত্রীকে যাকাতের মাল দেয় তাতেও যাকাতদাতার যাকাত আদায় সহীহ্ হবে। উকিল যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সে তার নাবালিগ সন্তানকেও যাকাতের মাল দিতে পারবে। তবে সে নিজে খেতে পারবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

কিন্তু যদি মালদার ব্যক্তি যাকাতের মাল উকিলকে সোপর্দ করার সময় বলে যে, তুমি এমাল যেখানে ইচ্ছা বন্টন করতে পারবে। তবে সে নিজেও গ্রহণ করতে পারবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যাকাতদাতা যদি নির্ধারিত করে দেয় যে অমুককে যাকাত দিবে। তাহলে তাকেই দিতে হবে। অন্য কাউকে অথবা নিজের সন্তান বা স্ত্রীকে দিতে পারবেনা। তবে 'বাহরুর রাইক' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে না দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে দিলেও যাকাত আদায় সহীহ্ হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যাকাতদাতা ব্যক্তি উকিলের নিকট যে টাকা পয়সা দিয়েছে উকিল যদি তা নিজে রেখে দিয়ে নিজের মাল দ্বারা যাকাত আদায় করে এই নিয়্যতে যে যাকাত দাতার টাকা থেকে সে তা পূরণ করে নিবে তবে যাকাত দাতার যাকাত আদায় সহীহ্ হবে। আর যদি উক্ত টাকা নিজের জন্য খরচ করে পরে নিজের মাল থেকে যাকাত আদায় করে তাহলে আদায় সহীহ্ হবে না। বরং তা তার নিজের পক্ষ থেকে দান হিসেবে গণ্য হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যাকাতের নিয়্যতে অন্য মাল হতে যাকাতের মাল পৃথক করলেই তার দায়িত্ব পূর্ণ হবেনা বরং ফকীরকে দেওয়ার পর দায়িত্ব পূর্ণ হবে। যাকাতের নিয়্যতে অন্য মাল হতে যাকাতের মাল পৃথক করার পর সে মাল নষ্ট হয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে অথবা সে নিজে মারা গেলে যাকাত আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

যে মালের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়ে ছিল সে মাল সম্পূর্ণ সাদাকা করে দিলে তার যিম্মা যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য যদি মানতের নিয়্যত করে বা অন্য কোন ওয়াজিব সাদাকার নিয়্যত করে সম্পূর্ণ মাল দান করে দেয় তাহলে যা নিয়্যত করেছে তাই আদায় হবে এবং যাকাত ভিন্নভাবে আদায় করতে হবে (শামী ২য় খণ্ড)।

যদি পূর্ণ মালের কিছু অংশ যাকাতের নিয়্যত করা ব্যতিত সাদাকা করে দেয় তাহলে উক্ত মালের যাকাত তার যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট মালের যাকাত আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন গরীব লোকের কাছে কারো ঋণ পাওনা থাকে আর সে তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় তাহলে যে পরিমাণ ক্ষমা করেছে সেই পরিমাণ মালের যাকাত দিতে হবে না। অবশিষ্ট

www.pathagar.com

ঋণের যাকাত দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আর যদি কোন ঋণী লোকের নিকট কারো যখন পাওনা থাকে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পর সে উক্ত ঋণী ব্যক্তিকে ঋণের মাল দান করে দেয় সে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত উক্ত মালের যাকাত দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন বিত্তশালী ব্যক্তি যদি কোন ফকীরকে হুকুম করে যে, অমুকের নিকট যে ঋণ পাওনা আছে তা উসূল করে নিয়ে যাও এর দ্বারা সে যদি ঐ মালের যাকাত প্রদানের নিয়্যত করে যা তার কাছে মজুদ রয়েছে তাহলে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন বিত্তশালী ব্যক্তি কোন গরীব ব্যক্তির নিকট পাওনা ঋণ তাকেই হিবা করে দেয় এবং এর দ্বারা ঐ ঋণের যাকাত আদায় করার নিয়্যত করে যা সে অন্য লোকের কাছে পাওনা আছে তাহলে যাকাত আদায় হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অনুরূপভাবে গরীব ব্যক্তির নিকট পাওনা ঋণ তাকেই হিবা করে দিয়ে যদি ঐমালের যাকাতের নিয়্যত করে যা তার নিকট মজুদ আছে তবেও যাকাত আদায় হবে না। কিন্তু যদি যাকাতদাতা ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতাকে যাকাতের টাকা প্রদান করে এ টাকা হতে তার পাওনা উসূল করে নেয় তবে তার যাকাত সহীহ্ হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## যে সব সম্পদে যাকাত ফরয হয় না

ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অবশ্য ঘোড়া যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

গাধা, খচ্চর, সিংহ এবং শিকারী কুকুর যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে অন্যথায় যাকাত ওয়াজিব হবেনা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শুধু উটের বাচ্চা, গাভীর বাচ্চা, এবং বকরীর বাচ্চার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। বোঝা বহন বা কৃষি কাজে ব্যবহৃত পশু এবং গৃহপালিত পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ওয়াকফ্কৃত পশু, অন্ধ পশু এবং পা কাটা পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব নয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

যাকাত দেওয়া নিসাবের মালিক হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে জায়িয হবে না। অর্থাৎ মালিকে- নিসাব হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করার পর মালিকে নিসাব হলে ঐ মালের পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে। পূর্বের আদায়কৃত যাকাত যথেষ্ট হবে না (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## অগ্রিম যাকাত দেওয়া

বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অগ্রিম যাকাত দেওয়া জায়িয। যথা ঃ

১. অগ্রিম যাকাত দেওয়ার সময় নিসাবের মালিক থাকা।

www.pathagar.com

২. বছরের শেষে নিসাব পরিপূর্ণ থাকা।

৩. বছরের মাঝখানে ঐ নিসাবের সমুদয় মাল বিলুপ্ত না হওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড) ও শামী, ২য় খণ্ড)।

এক নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর ঐ নিসাবের অগ্রিম যাকাত দেওয়া যেমন জায়িয তেমনি একাধিক নিসাবের যাকাতও অগ্রিম দেওয়া জায়িয। যেমন – কোন ব্যক্তি দু'শ দিরহাম এর মালিক সে এক হাজার দিরহামের যাকাত অগ্রিম আদায় করলো, এরপর সে একহাজার দিরহামের মালিক হল এবং বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এক হাজার দিরহাম তার কাছে ছিলো তাহলে তার অগ্রিম আদায়কৃত যাকাত আদায় সহীহ্। আর যদি বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে এক হাজার দিরহামের মালিক না হয় তাহলে অগ্রিম আদায়কৃত যাকাত এক হাজারের যাকাত বলে গণ্য হবে না।

মালিকে-নিসাব হওয়ার পর একাধিক বছরের যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়িয আছে। যদি কোন ব্যক্তি এক হাজার টাকার মালিক হয় এবং এই নিয়্যতে যদি সে দুই হাজার টাকার যাকাত আদায় করে দেয় যে, যদি আমি চলতি বছর আর এক হাজার টাকার মালিক হই তবে এই যাকাত হবে এ বছরের। আর যদি এ বছর মালিক না হই তবে আদায়কৃত যাকাত হবে অগ্রিম হিসাবে পরবর্তী বছরের। এমতাবস্থায় চলতি বছর মালিক হলে চলতি বছরের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর মালিক না হলে পরবর্তী বছরের যাকাত অগ্রিম আদায় হয়ে যাবে।

## যাকাত আদায় করার নিয়ম

সরকারের পক্ষ হতে যাকাত উসূলকারী কর্মচারীগণ যাকাত দাতাদের কাছে গিয়ে তাদের থেকে সম্পদের হিসাব অনুযায়ী যাকাত উসূল করবে। ইসলামী সরকারের পক্ষ হতে যাকাত উসূলের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করা হবে এবং যাকাতদাতা লোকেরা সেখানে তাদের নিজ নিজ যাকাত পৌঁছে দিয়ে দিবে অথবা যাকাত উসূলকারীকে লক্ষ্য রাখতে হবে সে যেন যাকাত উসূলের ক্ষেত্রে উত্তমমাল গ্রহণ না করে। বরং যাকাত উসূলের ক্ষেত্রে মধ্যম ধরণের মাল নেওয়া দেওয়া হবে।

এ কাজের জন্য এমন ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করবেন যারা সৎ, দ্বীনদার এবং যাকাত বিষয়ের মাস'আলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। যদি ইসলামী সরকার না থাকে তবে প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ দায়িত্বে তার মালের যাকাত হক্‌দারদেরকে পৌঁছিয়ে দিবেন।

www.pathagar.com

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# যাকাতের নিসাব

### যাকাতের নিসাব

কোন আযাদ, জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) কিংবা সম মূল্যের টাকা বা ব্যবসায়িক মালের মালিক হয় তবে এ মালকে শরী'আতের পরিভাষায় 'যাকাতের নিসাব' বলা হয়। উক্ত মাল এক বছর কাল তার মালিকানাধীন থাকলে তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত পরিমাণ মালের মালিক হবে তাকে 'মালিকে-নিসাব' বা সাহিবে-নিসাব বলা হবে। অবশ্য এ মাল ঋণমুক্ত এবং তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। উক্ত মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (শতকরা ২.৫০) যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

কারো মালিকানায় নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য থাকলে এবং তা এক বছর স্থায়ী হলে তার উপর ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত আদায় করা ফরয। এ স্বর্ণ-রৌপ্য যে অবস্থায়ই থাকুক অলংকার আকারে ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত ব্যাংক কারো নিকট গচ্ছিত অথবা ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে কোন পাত্র ইত্যাদি আকারে থাকুক। মোটকথা যে অবস্থায়ই থাকুক অবশ্যই তার যাকাত আদায় করতে হবে। স্বর্ণ-রৌপ্য নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক যে পরিমাণই থাকুক তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয় ঐ স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা অথবা তার বাজার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাতের ক্ষেত্রে ওযনের হিসাবই ধর্তব্য হবে। ওযন হিসেবে নিসাব পরিমাণ কারও নিকট যদি কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও কিছু পরিমাণ রৌপ্য থাকে এবং এর কোন একটিও নিসাব পরিমাণ নয় সে ক্ষেত্রে উভয়টির সম্মিলিত মূল্য যদি রৌপ্যের অথবা স্বর্ণের কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর উভয়টির সম্মিলিত মূল্য যদি রৌপ্যের বা স্বর্ণের কোন একটির নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যখন কোন ব্যক্তি নিসাবের মালিক হবে তখন থেকে এক বছর অতিবাহিত হবার পর তাকে উক্ত মালের যাকাত আদায় করতে হবে। যদি বছরের মাঝে নিসাব পরিমাণ থেকে মাল কমে যায় তবুও তাকে এ বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের মাঝে নিসাব পরিমাণ হতে মাল কমে যাওয়ার কারণে যাকাত রহিত হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

অবশ্য বছরের মাঝখানে যদি তার সম্পূর্ণ মাল কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তবে পূর্বের হিসাব বাদ দিয়ে পুনরায় যখন নিসাবের মালিক হবে তখন হতে বছরের শুরু ধরতে হবে। এবং এ হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতব মিশ্রিত অলংকার বা অন্য কোন বস্তু থাকে এবং এর মধ্যে রৌপ্যের পরিমাণ বেশী হয় এমতাবস্থায় স্বর্ণ নিসাব পরিমাণ থাকলে স্বর্ণের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি রৌপ্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে এরও যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি এরূপ বস্তুতে রৌপ্যের চেয়ে স্বর্ণের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে পুরোটাই স্বর্ণের হুকুমে ধর্তব্য হবে এবং সে হিসেব অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কারো নিকট কিছু পরিমাণ ব্যবসার মাল এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকে এবং কোনটাই নিসাব পরিমাণ না হয় তবে এগুলোর মূল্য যদি রৌপ্য বা স্বর্ণের কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয় তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে অন্য ধাতব পদার্থ মিশ্রিত হলে তার হুকুম

স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে যদি অন্য কোন ধাতব পদার্থ মিশ্রিত হয় যেমন দস্তা, রাং ইত্যাদি তবে যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে সম্পূর্ণই স্বর্ণ বা রৌপ্য ধরে নিতে হবে। এবং নিসাব পরিমাণ হলে হিসেব করে এর যাকাত আদায় করতে হবে। যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণ কম হয় আর রাং বা দস্তার পরিমাণ বেশী হয় তাতে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। অবশ্য তা ব্যবসায়িক পণ্য হলে এর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য ও অন্য ধাতব পদার্থ সমান সমান হয় এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## অলংকারের যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার যদিও পরিধানের জন্য না হয় বরং ইজারা, ব্যবসা-বাণিজ্য বেচাকেনা সাময়িক প্রয়োজন বা ব্যবসার অযোগ্য হয় তাহলেও এসব অলংকারের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে (ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো নিসাব পরিমাণ হওয়া। কারো মালিকানায় যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ টাকা থাকে এবং তা এক বছর অতিবাহিত হয় তবে এ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## আসবাবপত্রের যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য যত আসবাব পত্র আছে যেমন – লোহা, পিতল, কাসা, রাং, কাপড়, জুতা, চিনা বাসন, কাঁচের বরতন, ডেগ-ডেগচী, বাড়ী, জমা-যমীন, গাড়ী এবং মণি-মুক্তার মূল্যবান হার ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করা হোক বা ঘরে রাখা হোক এর উপর

www.pathagar.com

যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি এগুলো বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে থাকে এবং এর মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছরান্তে এর যাকাত আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ব্যবসায়ী আসবাব পত্রের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মূল্যের হিসেব ধর্তব্য হবে। ওযনের হিসেবে নয় (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**খনিজ ও ভূগর্ভস্ত সম্পদের যাকাত**

ফিকহের পরিভাষায় ভূগর্ভস্ত সম্পদ তিন প্রকার ঃ

১. কানয, ২. মা'আদিন ও ৩. রিকায।

**কানয্ ( كنز )** ঃ যে সম্পদ মানুষ মাটির নীচে পুঁতে রাখে তাকে 'কানয্' বলে।

**মা'আদিন্ ( معدن )** ঃ যে সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা ভূগর্ভে সৃষ্টি করে রেখেছেন তাকে মা'আদিন বা খনিজ দ্রব্য বলা হয়।

**রিকায (ركاز)** ঃ রিকায বলতে উপরোক্ত উভয় প্রকার সম্পদকেই বুঝায় (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

মা'আদিন-খনিজ দ্রব্য সাধারণত তিন প্রকার। যথা ঃ

১. গলনযোগ্য, ২. তরল ও ৩. যা গলনযোগ্যও নয় এবং তরলও নয়।

গলনযোগ্য দ্রব্য ঃ যেমন – স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, শীশা, পীতল, পারদ ইত্যাদিতে খুমুস -এক পঞ্চামাংশ আদায় করা ওয়াজিব হবে। অবশিষ্ট চার অংশ যে পাবে সেই তার মালিক হবে।

তরল দ্রব্য ঃ যেমন – আলকাতরা, তৈল ইত্যাদি এবং যে সব খনিজ দ্রব্য তরল ও নয় আর গলনযোগ্যও নয়। চুনা,কয়লা, পাথর, বিট, লবণ, ইয়াকূত, হিরা ইত্যাদি এসব দ্রব্যে কিছুই ওয়াজিব নয়। বরং এগুলো যে পাবে সেই তার মালিক হবে।

কেউ যদি দারুল ইসলামে মালিকানা বিহীন ভূমিতে প্রোথিত সম্পদ পায় এবং তাতে যদি ইসলামী কোন নিদর্শন থাকে যেমন কালেমা লিখিত থাকা তাহলে এ সম্পদ লুক্তা অর্থাৎ হারানো প্রাপ্তি জিনিসের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে। যদি তাতে জাহিলি যুগের কোন নিদর্শন থাকে যেমন মূর্তি ও ক্রুশ চিহ্ন খচিত মুদ্রা তবে তাতে খুমুস ওয়াজিব হবে। বাকী চার অংশ যে পাবে সেই তার মালিক হবে। আর যদি এতে আদৌ কোন নিদর্শন না পাওয়া যায় তাহলে একে জাহিলী যুগের বস্তু ধরে নিতে হবে। এবং তার উপর খুমুস ওয়াজিব হবে। সমুদ্র হতে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন- মুক্তা,আম্বর মাছ ইত্যাদিতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। পাহাড়ে প্রাপ্ত ফিরোজা ইত্যাদি পাথরেও খুমুস ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত**

ব্যবসায়ী পণ্য যে প্রকারেরই হোক যদি এর মূল্য স্বর্ণ রা রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হয় এবং একবছর কাল স্থায়ী ও মুক্ত হয় তাহলে পূর্ণ মালের (শতকরা ২.৫০) চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী পণ্য বিভিন্ন প্রকারের হলে সবগুলোর সমন্বিত মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে এর যাকাত আদায় করতে হবে। মণিমুক্তা ইত্যাদির উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এগুলোর দ্বারা অলংকার তৈরী করলেও যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে ব্যবসায়ী পণ্য হলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### পশুর যাকাত

পশু নর হোক বা মাদী যদি দুধ পানের উদ্দেশ্যে বাচ্চা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বংশ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বা মোটা তাজা করে মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বনে জঙ্গলে বা মাঠে চরানো হয় তবে নিসাব পরিমাণ হলে এসকল পশুর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি বোঝা বহন বা আরোহণের উদ্দেশ্যে মাঠে বা জঙ্গলে চরানো হয় এবং দুধ বা বংশ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে এ সকল পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি ব্যবসা বা বেচা কেনার জন্য চরানো হয় তাহলে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে এর মূল্যের উপর যাকাত আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কিছুদিন বনে জঙ্গলে বিচরণ করে আহার গ্রহণ করে আবার কিছুদিন নিজের পক্ষ থেকে আহারের ব্যবস্থা করে এমতাবস্থায় যদি বছরের অধিকাংশ সময় বনে জঙ্গলে বিচরণ করে আহার গ্রহণ করে থাকে তবে সায়িমা (বিচরণ করে আহার গ্রহণকারী পশু) হিসেবে এর যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি অধিকাংশ সময় মালিকের তত্ত্বাবধানে রেখে আহারের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি অর্ধবছর বনে জঙ্গলে বিচরণ করে আহার গ্রহণ করে আর বাকী অর্ধ বছর মালিকের তত্ত্বাবধানে রেখে আহারের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ও যাকাত ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### গরু ও মহিষের যাকাত

যাকাতের ক্ষেত্রে গরু ও মহিষের হুকুম একই। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গরু ও মহিষের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছরের অধিক বয়সের হওয়া আবশ্যক। কোন ব্যক্তি যদি ত্রিশটি গরু বা মহিষের মালিক হয় এবং তার এ মালিকানা এক বছর স্থায়ী হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং এক বছর পুরা হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পন করেছে এমন একটি বাছুর যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। যদি চল্লিশটির মালিক হয় তবে একটি মুসিন্না অর্থাৎ দ্বিতীয় বছর পুরা হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে এমন একটি বাছুর যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

ষাটটির মালিক হলে একবছর পুরা হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন দু'টি বাছুর যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। ত্রিশটি থেকে উনচল্লিশটি পর্যন্ত এই পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে। ষাটটির পর প্রত্যেক ত্রিশটির মধ্যে একটি তাবী' বা তাবীয়া' ও প্রত্যেক চল্লিশটির মধ্যে একটি মুসিন্না বা মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে। সুতরাং সত্তরটির মধ্যে একটি তাবী' বা তাবীয়া' এবং একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। নব্বইটির মধ্যে তিনটি তাবী' বা তাবীয়া' ওয়াজিব হবে। একশটির মধ্যে দুটি তাবী' বা তাবীয়া' এবং একটি মুসিন্না বা মুসিন্না -এর

www.pathagar.com

ওয়াজিব হবে। একশ'র পর প্রতি দশকে হুকুম তাবী' বা তাবীয়া' থেকে মুসিন্না বা মসিন্নাহর দিকে পরিবর্তন হতে থাকবে। এমনিভাবে হিসাব করে গরু ও মহিষের যাকাত নির্ণয় করে তা আদায় করতে হবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড, আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

**উটের যাকাত**

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পাঁচটির কম উটের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় না। কোন ব্যক্তি যদি পাঁচটি উটের মালিক হয় এবং তা এক বছর কাল তার মালিকানায় থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং যা এক বছর পূরা হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পন করেছে এমন একটি বক্‌রী যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। এরপর হতে প্রতি পাঁচে একটি বক্‌রী ওয়াজিব হবে। এ হিসেবে বিশ পর্যন্ত চারটি বক্‌রী ওয়াজিব হবে এবং চব্বিশ পর্যন্ত এ চারটির হুকুমই বলবৎ থাকবে। পঁচিশটি হলে একটি বিনতে মাখায – দ্বিতীয় বছরে পদার্পন করেছে এমন একটি শাবক যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। এ হুকুম পঁয়ত্রিশটি উট পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ছয়ত্রিশ থেকে পয়তাল্লিশটি পর্যন্ত উটের যাকাত হিসেবে একটি বিনতে লাবুন – তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে এমন একটি উট শাবক আদায় করতে হবে। ছয়চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত উটের যাকাত হিসেবে একটি হিক্কা – চতুর্থ বছরে পদার্পন করেছে এমন একটি উট শাবক আদায় করতে হবে। একশট্টি থেকে পঁচাত্তরটি উটের যাকাত হিসেবে একটি জাযআ – পঞ্চম বছরে পদার্পন করেছে এমন একটি উট আদায় করতে হবে। ছিয়াত্তর থেকে নব্বইটি উটের যাকাত হিসেবে দুইটি বিনতে লাবূন আদায় করতে হবে। একানব্বই থেকে একশ' কুড়িটির উটের যাকাত হিসেবে দুইটি হিক্কা আদায় করতে হবে। একশ' কুড়ির পর হতে প্রতি পাঁচে একটি বকরী ওয়াজিব হবে এবং এ হুকুম একশ' চুয়াল্লিশ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ একশ' চুয়াল্লিশে দুইটি হিক্কা ও চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। একশ' পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত দুই হিক্কা ও একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। একশ' পঞ্চাশটির পর প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি করে বকরী ওয়াজিব হবে। এ হুকুম একশ' চুয়াত্তর পর্যন্ত বলবৎ থাকেব। একশ' পঁচাত্তর হতে একশ' চুরাশি পর্যন্ত তিন হিক্কা ও একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। একশ' ছিয়াশী হতে একশ' পঁচানব্বই পর্যন্ত তিন হিক্কা ও একটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। একশ' ছিয়ানব্বই থেকে দুইশ পর্যন্ত চার হিক্কা ওয়াজিব হবে।ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে দু'শর পর সর্বদা যাকাতের হিসাব একশ' পঞ্চাশ এর পর থেকে দুইশ' পর্যন্ত যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে সে নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করবে। এভাবে হিসাব করে সংখ্যা নির্ণয় করে উটের যাকাত আদায় করতে হবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাত**

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে ছাগল ভেড়া ও দুম্বার উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক বছর বয়সী হওয়া আবশ্যক। চল্লিশটির কম ছাগল ভেড়া ও দুম্বার উপর যাকাত ওয়জিব হয় না। যদি কোন ব্যক্তি চল্লিশটি সায়িমা (বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে ময়দানে বিচরণ করে আহার করে) ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার মালিক হয়

www.pathagar.com

এবং এগুলো একবছর কাল তার মালিকানায় থাকে তবে তার উপর একটি ছাগল যাকাত হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব হবে। একশ' বিশটি পর্যন্ত এই হুকুম বলবৎ থাকবে। একশ' একুশ হতে দুইশ' পর্যন্ত বকরীর জন্য দুইটি ছাগল যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। দুইশ' এক থেকে তিনশ' নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি ছাগল যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। আর চারশ' হলে চারটি ছাগল যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। চারশর পর প্রতি একশ'তে একটি করে ছাগল ওয়াজিব হবে। এভাবে হিসেব করে ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাত আদায় করতে হবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড, আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

### ঘোড়া খচ্চর ও গাধার যাকাত

ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা নর হোক বা মাদী এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি এসকল পশু ব্যাবসা বা বেচাকেনার জন্য হয় তাহলে যাকাতের ক্ষেত্রে এ সকল পশুর হুকুম বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায়। এর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তা হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এগুলো বনে জঙ্গলে বা মাঠে যেখানেই চরাক একই হুকুম প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### মালের মূল্য দ্বারা যাকাত প্রদান

যে মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সে মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা যায়। আর সে মালের মূল্য দ্বারাও যাকাত আদায় করা যায় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### বিভিন্ন দ্রব্য একত্রে হিসাব করে যাকাতের নিসাব নির্ণয়

যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য থাকে। যেমন – কিছু স্বর্ণ, কিছু রৌপ্য এবং কিছু ব্যবসায়ী দ্রব্য এবং সকল মালের মূল্য একত্রিত করার পর তা যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে এসকল দ্রব্যে যাকাত আদায় করাও জায়িয হবে। আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### নিসাবের উর্ধে কিছু পরিমাণ মাল থাকলে তার যাকাতের বিধান

যদি কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের মালিক হয় তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি কারো কাছে নিসাবের অতিরিক্ত অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সাড়ে সাত ভরি তোলা স্বর্ণের অতিরিক্ত স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের অতিরিক্ত স্বর্ণ রৌপ্য থাকে এবং ঐ অতিরিক্ত স্বর্ণ-রৌপ্য যদি নিসাবের এক পঞ্চমাংশের কম হয় তবে এ অতিরিক্ত অংশের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এবং হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নিসাব উর্ধ সম্পদ যদি

www.pathagar.com

এক পঞ্চমাংশের কমও হয় তবে তাতেও যাকাত ওয়াজিব হয়। এবং হিসাব করে সমুদয় সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড, শামী, ২য় খণ্ড ও বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

### বছরের মাঝখানে বর্ধিত মালের যাকাত

যদি কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ ব্যবসায়ী মালের মালিক হয়ে থাকে এবং বছর শেষ হওয়ার পূর্বে এ মালের দ্বারা ব্যবসার মাধ্যমে আরো মাল অর্জিত হয় তবে বছরান্তে সমস্ত মালের যাকাত দিতে হবে। আর যদি যাকাতের মাল সায়িমা পশু হয় এবং বছর শেষ হওয়ার পূর্বে ভিন্ন প্রকারের আরো পশু তার মালিকানায় আসে তবে এ বর্ধিত পশু মূল নিসাবের সাথে সংযোজিত হবে না। বরং এ বর্ধিত পশু যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছরান্তে এর যাকাত আদায় করতে হবে। নিসাব পরিমাণ মালের মালিক যদি বছর শেষ হওয়ার পূর্বে ব্যবসার মাধ্যমে নয় বরং অন্য উপায়ে ঐ জাতীয় আরো মালের মালিক হয় তবে বছরান্তে সম্পূর্ণ মালের যাকাত আদায় করতে হবে (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড ও বাহরুর রাইক)।

www.pathagar.com

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# যৌথ মালিকানা সম্পত্তির যাকাত

যৌথ মালিকানা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক মালিকের অংশে কি পরিমাণ সম্পত্তি পড়ে তা হিসেব করে দেখতে হবে। যাদের অংশ নিসাব পরিমাণ থেকে কম তাদের অংশে যাকাত ফরয হবে না। যাদের অংশ নিসাব পরিমাণ হবে তাদের উপর যাকাত ফরয হবে। যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে মোট সম্পত্তি হতে একসাথে যাকাত উসূল করা যেতে পারে। তারপর যে পরিমাণ যাকাত উসূল করা হলো মালিকগণ পারস্পরিক অংশ অনুপাতে তা নিজেদের দায়রূপে আদান প্রদান করে নিবেন (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ২য় খণ্ড)।

**প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা এবং সরকারী শিল্প ব্যবসা কোম্পানীর মালের যাকাত**

প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা এবং সরকারী শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যার মধ্যে ব্যক্তি মালিকানার কোন অংশীদারীত্ব নেই এতে যাকাত ফরয হবে না। তবে যে সকল সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যক্তি মালিকানার অংশীদারীত্ব থাকে তাতে শুধু ব্যক্তি মালিকদের অংশের উপর যাকাত ফরয হবে। সরকারী অংশের উপর যাকাত ফরয হবে না। ব্যক্তিমালিকগণ তাদের অংশের যাকাত একত্রে আদায় করতে পারেন অথবা নিজ নিজ অংশের যাকাত পৃথকভাবেও আদায় করতে পারেন। ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহ তা একক ব্যক্তি মালিকানাধীন বা যৌথ মালিকানাধীন হোক এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তারা ইচ্ছা করলে একত্রেও যাকাত আদায় করতে পারবেন এবং ইচ্ছা করলে নিজ নিজ যাকাত পৃথকভাবেও আদায় করতে পারবেন।

**শেয়ার -এর যাকাত**

আধুনিক অর্থনীতিতে শেয়ার ও বণ্ড একটি সুপরিচিত নাম। শেয়ার হলো বড় বড় কোম্পানীর বিরাট মূলধনের অংশের উপর মালিকানা অধিকার। প্রতিটি শেয়ার মূলধনের অংশ হিসেবে সমমূল্যের হয়ে থাকে। আর বণ্ড হলো, ব্যাংক কোম্পানী বা সরকার প্রদত্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি বিশেষ। যার মালিক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ সম্পদ পাওয়ার অধিকারী হয় (ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১৩)।

মিল, কারখানা, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের শেয়ার বাজারে ছাড়ার পর ক্রেতাগণ দু'টো উদ্দেশ্যে ঐ শেয়ার ক্রয় করে থাকে ঃ

১. নিজেরা ঐ শেয়ার ক্রয় করে আবার তা শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করবে এই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ তাদের ব্যবসায় হলো শেয়ারগুলো নগদ মূলে ক্রয়-বিক্রয় করা। শেয়ারগুলোই তাদের

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী পণ্য স্বরূপ।

২. কেউ কেউ শেয়ারের ক্রয় করে এই শেয়ারে মাধ্যমে মূল কোম্পানীর অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্যে। বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় নয় বরং মূল প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হওয়া তাদের উদ্দেশ্য।

যে সকল শেয়ার ক্রেতা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কে তাদের ব্যবসারূপে গ্রহণ করে। এবং বিক্রয়ের জন্যেই শেয়ার ক্রয় করে থাকে, শেয়ারের মূল্যই তাদের ব্যবসায়ী সম্পদ। সুতরাং তাদের মালিকানাধীন শেয়ারের মূল্যকে ব্যবসায়ী সম্পদ হিসেবে ধরে নিয়ে বছরান্তে যথা নিয়মে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

আর যারা মূল প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়ার জন্যে শেয়ার ক্রয় করে তাদের হিসাব হবে মূল প্রতিষ্ঠানের হিসাব -এর সাথে। অর্থাৎ মূল প্রতিষ্ঠানের কারখানা, মেশিনারী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্য বাদ দিয়ে নগদ সম্পদ ও লাভের অংশ হিসাব করে নিজেদের শেয়ার অনুপাতে যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয় সে পরিমাণ সম্পদে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। কারখানার দালান কোঠা ইত্যাদি ও মেশিনারী যন্ত্রপাতিতে যাকাত ফরয হবে না (আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪ খণ্ড পৃঃ ৩০৪-৩০৫)।

### বণ্ডের যাকাত

সুদভিত্তিক অর্থনীতি নির্ভর ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বণ্ড এবং অনৈসলামী বীমা কোম্পানীর শেয়ার বাবদ প্রাপ্ত লাভ সুদ হিসেবে গণ্য বিধায় সরাসরি হারাম ও অবৈধ। হারাম ও অবৈধ হওয়ার কারণে লাভের সম্পূর্ণ অংশ সাওয়ারের নিয়্যত ছাড়া গরীব মিস্কীনদের দান করে অথবা জনহীতকর কাজে ব্যয় করে দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যক (শামী, ২য় খণ্ড)।

এ সকল বণ্ডের আসল ও মূলধনের ওপর যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে।

### পোলট্রি ফার্ম ও মৎস্য প্রকল্পের যাকাত

পোলট্রি ফার্মে মুরগীর ঘর, মৎস্য প্রকল্পে মাছের পুকুর এবং এতদ্ সংশ্লিষ্ট সাজ-সরঞ্জামে যাকাত নেই। মুরগী কিংবা মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করার সময় যদি সেগুলোকেই বিক্রি করার নিয়্যত থাকে তাহলে সেগুলোর মূল্যের উপর বছরান্তে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। আর যদি ওগুলোকে বিক্রি করা নয় বরং ওগুলোর ডিম ও বাচ্চা বিক্রির নিয়্যত থাকে তবে সেগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না। বরং আয়ের উপর বছরান্তে যাকাত ফরয হবে।

মাছ কিংবা মাছের পোনা ক্রয় করে পুকুরে ছাড়লে এগুলো বিক্রি করার নিয়্যত থাকলে এগুলের মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। আর সেগুলোর ডিম বা পোনা বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের নিয়্যত থাকলে সেগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না। আয়ের উপর বছর শেষে নিয়মানুযায়ী যাকাত ফরয হবে (আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪খণ্ড, পৃঃ ৩১০)।

www.pathagar.com

## ভাড়া দেওয়া বাড়ী ও আসবাব পত্রের যাকাত

ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত বাড়ী কিংবা ক্রয়কৃত বাড়ী ও দালান কোঠায় যাকাত নেই। অর্থাৎ সেগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরয হয় না। বরং ভাড়া বাবদ যা আয় হয় তাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হয়। যে সব দালান কোঠা বা জমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয় (বসবাস বা ভাড়ার উদ্দেশ্যে নয়) এসবের মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ আবাস গৃহের আসবাব পত্র ইত্যাদি উপরও যাকাত ফরয হয় না। যে সমস্ত আসবাব পত্র ভাড়া দেওয়া হয় যেমন ঃ দোকান, গাড়ী, রিক্সা, নৌজান, ডেকোরেশনের আসবাবপত্র ইত্যাদির মূল্যের উপর যাকাত ফরয নয়। কারণ এগুলো বিক্রয়ের জন্য নয় বরং ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য, তাই এগুলোর আয়ের উপর যাকাত ফরয হবে।

## ঋণের উপর যাকাত

অপরের নিকট পাওনা টাকার উপর যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে তা চার প্রকার ঃ

১. হাওলাত বাবদ যে টাকা কাউকে নগদ প্রদান করা হয়েছে, অথবা ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য যা বাকী রয়েছে এসব অর্থের উপর একবছর অতিবাহিত হবার পর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে আদায়ের ক্ষেত্রে এক নিসাবের পঞ্চমাংশ হস্তগত হলে এ অংশের যাকাত যথানিয়মে আদায় করতে হবে। আরো অতিরিক্ত টাকা হস্তগত হলে নিসাব মত যাকাত আদায় করতে থাকবে। একে 'দায়নে কাবী' (শক্তিশালী ঋণ) বলে।

২. এমন পণ্যের মূল্য যা মূলত ব্যবসায়ের জন্য ছিল না, কোন কারণবশত বিক্রয় করা হয়েছে। এ অর্থ এক নিসাব পরিমাণ একত্রে উসূল হলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে বিশুদ্ধ মতে উসূলের পর হতে বছর গণনা করা হবে না বরং মালিকের মালকানার সময় হতে বছর ধর্তব্য হবে। এবং হিসাব করে অতীত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। আর এ অর্থ কিস্তিতে কিস্তিতে উসূল হলে এবং তা নিসাব পরিমাণ না হলে এ অর্থের যাকাত ফরয হবে না। একে মধ্যম পর্যায়ের ঋণ বলে। এমন অর্থ বা কোন পণ্য বা দ্রব্যের বিনিময়ে নয় যেমন মহিলাদের মহরের অর্থ। ঐ অর্থ উসূল ও হস্তগত হওয়ার পর যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা এক বছর হাতে থাকে তবেই তার উপর যাকাত ফরয হবে। একে দুর্বল ঋণ হবে।

হারানো অর্থ, প্রোথিত অর্থ, সমুদ্রে পড়ে যাওয়া মাল, এমন হাওলাত বা ঋণ গৃহীতা অস্বীকার করেছে এবং এ ঋণের ব্যাপারে কোন দলীল প্রমাণ নেই অথবা ছিনতাই হয়ে যাওয়া মাল যার ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই এ জাতীয় অর্থ সম্পদকে 'মালে বিমার' বলা হয়। মাল হস্তগত হওয়ার পর অতীত বছরগুলোতে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। অবশ্য হস্তগত হওয়ার পর বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

পাওনা টাকা নিসাব পরিমাণ হলে তা উসূল হওয়ার পূর্বে যদি এই টাকার যাকাত আদায় করা হয় তবে যাকাত আদায় হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যাকাত

সরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং বেসারকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য

www.pathagar.com

রয়েছে। তাই উভয়ের বিধি-বিধানেও পার্থক্য রয়েছে। সরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ক্ষেত্রে সরকার হল শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। আর কর্মচারী হলো নিয়োগপ্রাপ্ত।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থ এবং তার কর্তৃত্ব থাকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের (সরকারের) হাতে। এর উপর কর্মচারীদের কোন দখল বা কর্তৃত্ব চলে না। ঐ অর্থ সরকারের নিকট কর্মচারীদের একপ্রকার ঋণ। এতে কর্মচারীদের দখল ও কর্তৃত্ব না থাকায় তাতে যাকাত ফরয হবে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থ হাতে আসার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং ভবিষ্যতে নিসাবের উপর বছর পূর্ণ হলে যাকাত ফরয হবে। কারণ ফিক্হের ভাষায় এটি একটি দুর্বল ঋণ, যেমন স্বামীর উপর স্ত্রীর দেন-মোহর ইত্যাদি জাতীয় ঋণ।

অবশ্য এই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থ সরকারী কর্তৃত্বে থাকাকালে তা দিয়ে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কোন ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে অংশ গ্রহণ করে এবং এই সূত্রে বীমা কোম্পানী তার ফাণ্ডের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তাহলে বীমা কোম্পানী হবে তার উকিল। উকিলের কর্তৃত্ব গ্রহণ মূলতঃ মক্কেলের কর্তৃত্ব গ্রহণ বিদায় ধরে নিতে হবে যে, কর্মচারীই ঐ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে ঐ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের উপর যাকাত ফরয হবে।

যে সব বেসরকারী কোম্পানীতে কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড একটি পৃথক বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আর সে বোর্ডে কর্মচারীদের প্রতিনিধি থাকে। এই বোর্ড যেহেতু কর্মচারীদের উকিল বা প্রতিনিধি সেহেতু বোর্ড কর্তৃক ঐ অর্থ গ্রহণ করা মূলতঃ কর্মচারী কর্তৃক গ্রহণ করা। সুতরাং এ প্রকার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যথানিয়মে প্রতি বছর যাকাত ফরয হবে (আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

### ব্যাংকে গচ্ছিত, রক্ষিত ও জমাকৃত মালের যাকাত

ব্যাংকে গচ্ছিত ও জমাকৃত মাল মূলতঃ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট আমানত। এই অর্থ সম্পদে মালিকের মালিকানা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ব্যবহারের অধিকারও থাকে। কজেই ব্যাংকে গচ্ছিত রক্ষিত ও জমাকৃত অর্থ সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে এবং বছরান্তে তা আদায় করতে হবে (জাদীদ ফিকহী মাসাইল, ১ম খণ্ড)।

তিন, পাঁচ, সাত বছর বা কোন নির্ধারিত মেয়াদের শর্তে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা জমা করার যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে ঐ নিয়মে ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। বছরান্তে হিসাব করে এর যাকাত আদায় করা উত্তম। যদি প্রতিবছর আদায় না করে থাকে তবে টাকা প্রাপ্তির পর বিগত বছর সমূহের যাকাত একত্রে আদায় করতে হবে, উল্লেখ্য যে এভাবে ফিক্সড ডিপোজিট রেখে মুনাফা গ্রহণ সুদের অন্তর্ভুক্ত যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম (জাদীদ ফিকহী মাসাইল, ১ম খণ্ড)।

### ব্যাংক বা সরকারী তহবিল থেকে প্রদত্ত ঋণের হুকুম

ব্যাংক বা সরকারী তহবিল থেকে প্রদত্ত ঋণের উপর যাকাতের হুকুম সাধারণ ঋণের মতই। অর্থাৎ এই গৃহীত ঋণের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে সেই অতিরিক্ত

www.pathagar.com

সম্পদের যাকাত দিতে হবে। ঋণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে যাকাত দিতে হবে না।

## ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স ট্রাষ্টের যাকাত

ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স ট্রাষ্ট হলো ব্যবসায়ী কোম্পানী। সাধারণত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে এগুলো গঠিত হয়। শুধু সরকারী উদ্যোগে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু বেসরকারী উদ্যেক্তাদের অংশীদারিত্বে এগুলো পরিচালিত হয়। যে সকল ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স ট্রাষ্ট শুধু সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোতে যাকাত ফরয হবে না। কারণ সরকার কোন ব্যক্তি সত্তা নয়। শুধু বেসরকারী অংশীদারিত্বে গঠিত ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে অংশীদারদের অংশ অনুপাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। তবে ইচ্ছা করলে সম্মিলিতভাবে কিংবা পৃথকভাবে যাকাত আদায় করার ইখ্‌তিয়ার আছে।

সরকারী ও বেসরকারী উভয় অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স ট্রাষ্টের সরকারী অংশে যাকাত ফরয হবে না। শুধু বেসরকারী অংশীদারদের অংশ অনুপাতে তাদের অংশে যাকাত ফরয হবে (আহ্‌সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স ট্রাষ্ট যদি সুদ ভিত্তিক হয় তবে সেগুলোর লেনদেন ও আয় উপার্জন হারাম। হারাম মালে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, যাকাতও ফরয হয় না। বরং সম্পূর্ণ মাল সাদাকা করে দেয়াই আবশ্যক। বিনিয়োগ কৃত হালাল পুঁজিতে যাকাত ফরয হবে। হালাল ও হারাম মাল মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার পর উভয়টিকে পৃথক করার কোন অবকাশ না থাকলে তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যাকাত ফরয হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## মেশিনারী সম্পদের যাকাত

যে সকল সম্পদে যাকাত ফরয হয় সেগুলো হলো পশু সম্পদ, ব্যবসায়ী পণ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ টাকা। এগুলোর উপর যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত হলো, বছর অতিক্রান্ত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ মূল্যমানের হওয়া, যেমন রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণ মুদ্রা, পালনযোগ্য হওয়া পশু সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদে ব্যবসায়ের নিয়্যত থাকা (শামী, ২য় খণ্ড)।

কারখানার মেশিনারী ও আবাসগৃহ যেহেতু উল্লেখিত শর্তভূক্ত সম্পদ নয় সেহেতু এগুলোতে যাকাত ফরয হবে না। অনুরূপ শিল্পী ও প্রকৌশলীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উপরেও যাকাত ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

বসবাসের গৃহ, পরিধেয় বস্ত্র, গৃহের আসবাব পত্র, আরোহণের পশু, সেবাগ্রহণ নিমিত্ত রাখা ক্রীতদাস, ব্যবহার্য অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতিতে যাকাত ফরয হবে না। তদ্রূপ পরিবারের জন্য সঞ্চিত খাদ্য শস্য এবং সাজ সজ্জার জন্যে রাখা তৈজসপত্র যদি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য না হয় তাতেও যাকাত ফরয হবে না। কারীগর এবং পেশাজীবী লোকদের যন্ত্রপাতির বিধানও তাই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## যাকাত এবং ট্যাক্স

যাকাত ও ট্যাক্স এক নয়। যাকাত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি মালি ইবাদত। আর ট্যাক্স হল রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক ব্যবস্থা। কর বা ট্যাক্স রাষ্ট্র বা সরকার দেশের নাগরিকদের উপর বিভিন্নভাবে ধার্য করে এবং এই অর্থ দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে।

পক্ষান্তরে যাকাত হল মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের সম্পদে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফকীর মিসকীন সহ আট শ্রেণীর প্রাপকের একটি অধিকার। এর পরিমাণ ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। সুতরাং ট্যাক্স যাকাতের বিকল্প নয়। ট্যাক্স প্রদানের দ্বারা যাকাতের ফরয আদায় হবে না। নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত ইনকাম ট্যাক্স, ভ্যাট, গিফ্‌ট ট্যাক্স, প্রপার্টি ট্যাক্স, রেভিনিয়ু ইত্যাদি পরিশোধের দ্বারা যাকাত আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হজ্জ, বিবাহ-শাদী, লেখাপড়া ইত্যাদি কাজের জন্য জমাকৃত অর্থের যাকাত

হজ্জ, বিয়ে-শাদী, লেখাপড়া বা যে কোন উদ্দেশ্যে কেউ তার অর্থ সম্পদ বা যে কোন স্থানে স্বনামে বেনামে জমা রাখলে উক্ত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে এর উপর যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে এবং বছরান্তে মালিক এ মালের যাকাত আদায় করবে।

## বেনামী সম্পদের যাকাত

রাষ্ট্রীয় কর থেকে বাঁচার জন্যে কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অন্যের নামে সম্পদ ক্রয় কিংবা জমা রাখা হলেও তাতে মূল মালিকের মালিকানা বাতিল হয় না। সুতরাং এই বেনামী সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তার উপরেও যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে এবং বছরান্তে তা আদায় করতে হবে।

## সিকিউরিটি মানি বা যামানতের টাকার উপর যাকাত

সিকিউরিটি মানি বা যামানতের টাকা জমাকৃত ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের নিকট মালিকের ঋণরূপে গণ্য হবে। তাই মালিকের কাছে ফেরত আসার আগেও প্রতি বছর যথা নিয়মে তাতে যাকাত ফরয হবে। অবশ্য মালিকের হাতে আসার পূর্বে যাকাত আদায় করা বাধ্যতামুলক নয়। বরং হস্তগত হওয়ার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। যদি হস্তগত হওয়ার পূর্বে অন্য খাত থেকে উক্ত যাকাত আদায় করে দেয় তবে তা আদায় হবে। যদি ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় তাহলে এ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হারাম মালের যাকাত

হারাম উপায়ে তথা চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি উপায়ে অর্জিত সম্পদে মূলত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না বিধায় ঐ মালে যাকাত ফরয হয় না। বরং ঐ মাল তার প্রকৃত মালিকের নিকট অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। যদি মালিক বা তার ওয়ারিশদের সন্ধান পাওয়া না যায় তবে উক্ত মাল সাদাকা করে দিতে হবে। কিন্তু এতে সাওয়াবের নিয়্যত করা যাবে না।

www.pathagar.com

হারাম মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবুও তাতে যাকাত ফরয হবে না, কারণ তার সবটাই সাদাকা করে দেওয়া ফরয (শামী, ২য় খণ্ড)।

কিন্তু হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ যদি ব্যক্তির হালাল সম্পদের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, পৃথক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে হারাম মালে সেই ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাতে যাকাত ফরয হবে এবং সমুদয় সম্পত্তির যাকাত দিতে হবে। আর যদি পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে হারাম মাল পৃথক করার পর হালাল মাল নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## নোট চেক ইত্যাদি দ্বারা যাকাত প্রদান

কাগজী নোট দ্বারা যাকাত প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হবে। পূর্বে যখন মুদ্রার লেনদেন ও প্রচলনই ছিল আর কাগজী নোট ছিল তার রশিদ বা সনদ। তখন কাগজী নোট দ্বারা যাকাত প্রদান ও তা আদায় প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুদ্রার লেনদেন নেই বললেই চলে। কাগজী নোটই মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য। কাগজী নোট থাকলেই তাকে ধনী বলে গণ্য করা হয়, তার উপর যাকাত, হজ্জ ফরয হয়। তাই বর্তমানে কাগজী নোট দ্বারা যাকাত প্রদান করা হলে তা আদায় হবে।

নিসাবের মালিক ব্যক্তি নোট বা মুদ্রার পরিবর্তে চেকের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করলে যখন ঐ চেক ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে তখনই মালিকের যাকাত আদায় হবে তার পূর্বে নয়। প্রদত্ত চেক যদি কোন কারণে ভাঙ্গানো সম্ভব না হয় অথবা চেক হারিয়ে বা পুড়ে বা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে মালিকের যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় ঐ যাকাত আদায় করতে হবে।

## মনিঅর্ডার যোগে যাকাত প্রেরণ

ডাকঘরে যাকাতের টাকা প্রদান পূর্বক যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোন বক্তির নামে যদি তা মনিঅর্ডার করা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ওই টাকা নগদ বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না। কারণ যাকাত আদায় হওয়ার জন্যে তামলীক বা মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনিঅর্ডারের টাকা হস্তগত করলে মালিকের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কোন কারণে মনিঅর্ডারের টাকা ঐ ব্যক্তির হাতে না পৌছলে মালিকের যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত বাবদ প্রদত্ত টাকা শুধু নিজের মালিকানা থেকে বের করে দিলেই যাকাত আদায় হবে না বরং হক্‌দারের হাতে অর্পন করলে তখন তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

www.pathagar.com

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## যাকাত প্রদানের মাসরাফ (খাত)

যাকাতের মাল যাদেরকে দেওয়া জায়িয শরিয়াতের পরিভাষায় তাদেরকে যাকাতের 'মাসরাফ' (খাত) বলা হয়। পবিত্র কুরআনে যাকাতের মাসরাফ আটটি নির্ধারিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

সাদাকাহ (যাকাত) তো কেবল ফকীর, মিস্কীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, গোলাম আযাদ করার জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহ্র বিধান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় (৯ ঃ ৬০)।

**যাকাতের খাত সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা**

১. ফকীর ঃ ফকীহ্গণের মতে যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় সেই ফকীর। যদি কারো কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে যার তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হয় তবে এ অবস্থাতে ও সে ফকীর হিসাবে গণ্য হবে।

২. মিস্কীন ঃ মিসকীন বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার কিছুই নেই এবং সে মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায়। খোরাক পোষাকের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৩. আমিল ঃ যাকাত সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। যাদেরকে সরকার যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন তাদেরও তাদের সহযোগীদেরকে যাকাতের মাল থেকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে যার দ্বারা যাকাত উসূল কালীন সময়ে তাদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যথেষ্ট হয়। তবে তাদের এ ব্যয় বহন মধ্যম পর্যায়ের হতে হবে। যদি এমন হয় যে, আমিলদের পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে যাকাতের কোন অর্থ অবশিষ্ট না থাকে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে উসূলকৃত যাকাতের অর্ধেকের বেশী দেওয়া যাবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

www.pathagar.com

আমিল যদি হাশেমী গোত্রের হয় তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ থেকে ভাতা প্রদান করা বৈধ নয়। হাঁ, যদি অন্য ফাণ্ড থেকে তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তবে তা জায়িয হবে। আমিল মালদার হলেও তাকে যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলূব ঃ চিত্ত আকর্ষণ-ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য যাদেরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া হত। এই মাসরাফটি সাহাবা কেরামের ঐকমত্যের মাধ্যমে রহিত হয়েছে। তাই তাদেরকে যাকাতের অংশ প্রদান করা জায়িয নেই।

৫. গোলাম আযাদ করা ঃ গোলাম বলতে 'মুকাতাব'-আযাদী চুক্তিতে আবদ্ধ গোলামকে বুঝানো হয়েছে। তার এই আযাদ হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়িয। যদি সে মুকাতাব ধনী হয় তবুও। তবে তার মনিব যদি হাশেমী হয় তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া জায়িয হবে না।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঃ এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার নিকট এ পরিমাণ মাল আছে তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট মাল নিসাব পরিমাণ হয় না তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়িয। অনুরূপ এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার অন্যের কাছে টাকা পাওনা আছে কিন্তু সে তা আদায় করতে পারছে না, এমতাবস্থায় তাকেও যাকাত দেওয়া জায়িয। ফকীরকে যাকাত দেওয়ার চেয়ে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৭ আল্লাহ্র পথে ঃ ঐ সমস্ত মুজাহিদ যারা অভাবের দরুন আল্লাহ্র পথে জিহাদে শরীক হতে পারছে না, তাদেরকে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়িয। অনুরূপ দীনি ইল্ম শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীদেরকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়িয (শামী, ২য় খণ্ড)।

৮. মুসাফির ঃ যে ব্যক্তি সফরে আছে এবং তার হাতে বর্তমানে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। এমতাবস্থায় তাকে প্রয়োজন মাফিক যাকাত দেওয়া জায়িয। তবে যাকাত নেয়ার চেয়ে সম্ভব হলে কর্য করাটা উত্তম। যদি কোন ব্যক্তি নিজের এলাকাতেই কোন কারণে নিজের সম্পত্তি ও অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্যেও প্রয়োজন পরিমাণে যাকাত গ্রহণ করা জায়িয। যদি এমন হয় যে, যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ খরচ হবার পূর্বেই মুসাফির কিংবা রিক্তহস্ত ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদ পেয়ে যায় এমতাবস্থায় যাকাতের টাকা সাদাকা করে দেওয়া উত্তম, ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**যাকাতের মাসরাফ (খাত) সীমিত হওয়ার দলীল**

যাকাত প্রদানের খাত সর্বমোট আটটি। এ সম্পর্কে আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ .

যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্যে এবং যাদের চিত্ত

www.pathagar.com

আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্যে। দাস মুক্তির জন্যে, ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্যে (৯ ঃ ৬০)।

আয়াতটির শুরুতে ' إنما ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী এ শব্দটি সীমিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় বিধায় আয়াতের স্পষ্টভাষ্য এই দাঁড়ায় যাকাত প্রদানের খাত শুধু এই আটটি ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমিত থাকবে। তা অন্যত্র ব্যবহার করা যাবে না।

## মাসরাফের প্রত্যেক প্রকারের লোককে যাকাত প্রদান করা ফরয কি - না?

পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত প্রত্যেক খাতে যাকাতের অর্থ দেয়ার ব্যাপারে যাকাত দাতার সম্পূর্ণ ইখ্‌তিয়ার রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে মাসরাফের প্রত্যেক প্রকারের লোককে অল্প অল্প করে যাকাত দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে শুধু এক প্রকারের লোককেও দিতে পারেন। প্রত্যেক প্রকারের লোককে যাকাত প্রদান করা ফরয নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## মাসরাফের বাইরে যাকাত প্রদান করা

মাসরাফের বাইরে মারফত প্রদান করা জায়িয নয়। দিলে যাকাত আদায় হবে না। হ্যাঁ, যদি যাকাত দাতা খোঁজ-খবর নিয়ে, যাচাই-বাছাই করে তার জানামতে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যাকাত দিয়ে থাকে আর পরবর্তীতে দেখা যায় যে, যাকে যাকাত দেওয়া সে যাকাতের মাসরাফ নয়, তাহলে দাতার যাকাত আদায় হয়ে যবে। যেমন যাকাত দেয়ার পর দেখা গেল যাকাত গ্রহীতা হাশেমী বংশের। তবে যাকাত গ্রহীতা যখন প্রাপ্তঅর্থ যাকাত একথা জানতে পারবে তখন তাকে সে অর্থ ফেরৎ দিতে হবে। কাফিরকে যাকাত প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হবে না। যাচাই-বাছাই, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যদি যাকাত দিয়ে দেয় আর পরবর্তীতে প্রকাশ পায় যে, যাকাত গ্রহীতা মাসরাফ ছিল না তাহলে যাকাত আদায় হবে না। তবে প্রকাশ না পেলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## যারা যাকাত পাওয়ার অধিক হক্‌দার

উল্লিখিত আটটি মাসরাফের যে কাউকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এতে সন্দেহ নেই। তবে এর মধ্যে শরীয়াতের নিগূঢ় হিক্‌মতের ভিত্তিতে কোন কোন মাসরাফ যাকাতের অধিক হক্‌দার বিবেচিত হয়। যেমন -

১. অনাত্মীয় গরীব, মিস্‌কীনের তুলনায় আত্মীয় গরীব মিস্‌কীন অধিক হক্‌দার। আত্মীয়ের মধ্যে সর্বাধিক হক্‌দার যাকাত দাতার আপন ভাই, তারপর বোন, তারপর ভাই বোনের সন্তানগণ, তারপর চাচা, তারপর ফুফু, তারপর মামা, তারপর খালা, তারপর রক্তসম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয় এবং তাদের পরবর্তী হক্‌দার প্রতিবেশী মাসরাফগণ। প্রতিবেশীদের মধ্যেও মহল্লার অসহায়রা শহরের অন্যান্যদের চেয়ে বেশী হক্‌দার।

২. সাধারণ মূর্খ ফকীর মিস্‌কীনের চেয়ে দীনদার এবং দীনি শিক্ষার শিক্ষার্থীগণ যাকাত পাওয়ার অধিক হক্‌দার। কারণ এ উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে একজন অসহায় ব্যক্তিকে যাকাত

www.pathagar.com

দেয়ার পাশাপাশি একজন দীনদার ও একজন আত্মীয়কেও সহযোগিতা করা হচ্ছে। যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটি আলাদা সাওয়াবের কাজ (শামী, ২য় খণ্ড)।

৩. দারুল ইসলামের অসহায় মিস্‌কীন দারুল হারবের মিস্‌কীনের চেয়ে যাকাত প্রাপ্তির বেশী হক্‌দার (শামী, ২য় খণ্ড)।

৪. ঋণগ্রস্ত অভাবী সাধারণ অভাবীর চেয়ে যাকাতের বেশী হক্‌দার (শামী, ২য় খণ্ড)।

## এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ যাকাত দেওয়া জায়িয?

এক ব্যক্তিকে নিসাব পরিমাণের চেয়ে কম যাকাত দেওয়া জায়িয। নিসাব পরিমাণে দেওয়া মাকরূহ, তবে দিয়ে থাকলে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি যাকাত গ্রহিতা ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া যায় যে, ঋণ আদায় করার পর তার নিকট দুইশ' দিরহামের বেশী অবশিষ্ট না থাকে। অনুরূপ যদি সে ব্যক্তির সন্তানাদি থাকে এবং প্রদত্ত যাকাতের অর্থ সন্তানাদির মধ্যে বন্টন করলে তারা কেউই নিসাব পরিমাণ পায় না তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে পরিমাণ যাকাত দেওয়া জায়িয আছে। নিসাবের বেশী হলেও এতে কোন আপত্তি নেই। তবে একজনকে কমপক্ষে এতটুকু যাকাত দেওয়া মুস্তাহাব যেন ঐদিন তাকে আর অন্যের নিকট হাত পাততে না হয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

## জনকল্যাণমূলক কোন কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয়

হানাফী মাযহারের মতে যাকাত আদায় হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, যাকাত শরীয়াত নির্ধারিত মাসরাফের কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

তাই মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, পুল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ এবং পুকুর, খাল খনন ইত্যাদি জনহিতকর কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়িয নয়। কেননা, কাউকেই এসব কাজে ব্যয়িত অর্থের মালিক বানানো হয় না। ধনী গরীব সকলেই এগুলো সমভাবে ব্যবহার করে থাকে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলাও জায়িয নয়। তবে যদি যাকাতের টাকা দিয়ে ঔষধ খরিদ করা হয় এবং তা অসহায় গরীব রোগীদের মধ্যে ফ্রি বিতরণ করা হয় তবে তাতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

তবে যাকাতের অর্থ দিয়ে রক্ত খরিদ করা জায়িয নেই। এবং তা কাউকে দান করাও জায়িয নেই। অনুরূপভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে চিকিৎসালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় অথবা চিকিৎসক বা অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন দেওয়া ও জায়িয নেই (আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

## যাকাত আদায়কারীকে পারিশ্রমিক প্রদানের বিধান

যাকাত আদায়কারী বলতে মুসলিম শাসক কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিকেই বুঝায়। বর্তমান কালেও যদি কোন মুসলিম শাসক যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন তাহলে তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া জায়িয। যাতে যাকাত আদায়কারী এবং তার সহকর্মীগণ যাকাত উসূল কালীন সময়ে

www.pathagar.com

মধ্যম ধরনের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। যাকাতের অর্থ থেকে এ পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া জায়িয (আহ্সানুল ফাতাওয়া)।

অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রদত্ত পারিশ্রমিক যেন উসূলকৃত যাকাতের অর্থেকের বেশী না হয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

## কমিশনের ভিত্তিতে যাকাত উসূল করা

কমিশনের ভিত্তিতে যাকাত উসূল করা জায়িয নয়। কারণ, 'আকদ্' (চুক্তি) বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, পারিশ্রমিক জ্ঞাত হওয়া আর কমিশনের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই কমিশনের ভিত্তিতে যাকাত উসূল করা জায়িয নয়।

## যাকাত আদায় ও উহার নিয়মাবলী

প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যাকাত আদায় করা উত্তম। যাকাত পাওয়ার হক্‌দার লোকদের নিকট যাকাতের অর্থ সরাসরি পৌছে দেওয়া উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কাউকে উকীল বানানোর সময় কাকে যাকাতের অর্থ দিতে হবে তা নির্ধারণ করে না দেওয়া হয় তাহলে উকীল তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকেও সে অর্থ দিতে পারবে। আর যদি তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং উকীল নিজেও গরীব হয় তাহলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকেও যাকাতের অর্থ দিতে পারবে। উকীলের জন্য তার দরিদ্র স্ত্রীকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়িয (শামী, ২য় খণ্ড)।

উকীল যাকাতের অর্থ নিজের জন্যে খরচ করতে পারবেন (আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

তবে মক্কেল যদি তাকে এভাবে বলে দেয় যে, 'তুমি যাকে ইচ্ছা যাকাত দিতে পারবে' সে ক্ষেত্রে উকীল অভাব গ্রস্ত হলে নিজেও তা গ্রহণ করতে পারবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## উসূলকৃত যাকাতের বন্টননীতি

যাকাতের সম্পূর্ণ অর্থ একই সাথে বন্টন করা যায় আবার যাকাত প্রাপকদের প্রয়োজন মাফিক কিছু কিছু করেও বন্টন করা যায়। এ ক্ষেত্রে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে যাকে যাকাত দেওয়া হবে তাকে কমপক্ষে এতটুকু পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যেন তাকে ঐ দিনই ভিক্ষার হাত বাড়াতে না হয়। আবার এই পরিমাণ দেওয়াও সমীচীন নয় যে, তার উপর যাকাত ওয়াজীব হয়ে যায়। যাকাতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা যাকাতের নির্ধারিত ক্ষেত্রের বাইরে প্রদান করা না হয়। কারণ যাকাতের অর্থ নির্ধারিত ক্ষেত্র বা মাসরাফের বাইরে খরচ করা কোন অবস্থাতেই জায়িয নয় (ফাতাওয়া মাহমুদিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড)।

বলাবাহুল্য, যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। তাই যাকাতের অর্থ বন্টনের সময় যারা যাকাতের অধিক হক্‌দার তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যারা অধিক অসহায় ছিন্নমূল পর্যায়ের নাগরিক তারা যেন যাকাত থেকে বঞ্চিত না হয়। যাকাতের উপর ভিত্তি করে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য গড়ে উঠে।

www.pathagar.com

## এক এলাকার যাকাতের টাকা অন্য এলাকায় বন্টন

এক এলাকা থেকে উসূলকৃত যাকাতের অর্থ অন্য এলাকায় বন্টন করা মাকরূহ তানযীহী। তবে যদি অন্য এলাকায় যাকাত তাদের নিকট আত্মীয় থাকে কিংবা নিজের এলাকার গরীবদের তুলনায় অন্য এলাকায় অধিকতর অসহায় থাকে অথবা যদি অন্য এলাকায় দীনি শিক্ষার্থী থাকে তবে অন্য এলাকায় যাকাতের অর্থ প্রদান করলে মাকরূহ হবে না। অন্য এলাকায় যাকাত বন্টন করার দ্বারা যদি  সাধারণ মুসলমানদের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হয় তাহলেও অন্য এলাকায় যাকাত প্রদান করা যাবে। এতে মাকরূহও হবে না। নিকটাত্মীয়গণ নিজ শহরের অসহায়-গরীব, দুঃখীদের চেয়ে অধিক হক্‌দার যদি তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় (আহ্‌সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

## অমুসলিমকে যাকাত প্রদান

অমুসলিমকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. কাফিরে হরবী অর্থাৎ দারুল হরব বা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী কাফির। এ ধরণের কাফিরকে যাকাত দেওয়া জায়িয নেই।
২. যিম্মী কাফিরকে যাকাত দেওয়া জায়িয নেই। অবশ্য তাদেরকে নফল দান খয়রাত করা জায়িয আছে।
৩. হরবী মুস্তাকিন অর্থাৎ দরুল হরবের যে কাফির নিরাপত্তা ভিসা গ্রহণ করে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করে।এমন কাফিরকেও যাকাত দেওয়া বৈধ হবেনা। (আলমগিরী, ১ম খণ্ড)।

## যাকাত না দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন

যাকাত ফাঁকি দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে মাকরূহ। যেমন কোন ব্যক্তির নিকট যাকাতের পশু ছিল, বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন পূর্বে সে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবেনা। (শামী, ২য় খণ্ড)।

কারো নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ ছিল। বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে পারিবারিক খরচ নির্বাহ করার জন্য তা বিক্রি করে দিলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## যাকাতের ফরযিয়াত অস্বীকার করার শাস্তি

যাকাত ইসলামী শরী'আতে ফরয–অবশ্য পালনীয় ইবাদত। এবং ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। যাকাতের ফরয হওয়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিলের দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই যাকাত অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির এবং তাকে হত্যা করা হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

### সরকারকে প্রদত্ত টেক্স যাকাতে গণ্য হবে কি?

সরকারকে প্রদত্ত টেক্স যাকাত হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা –

১. যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। পক্ষান্তরে টেক্স একটি রাষ্ট্রীয় দেওয়, যা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

২. যাকাত শরী'আতের পক্ষ হতে নির্ধারিত মালী ইবাদত। এতে কম-বেশী করার অধিকার কারো নেই। পক্ষান্তরে টেক্স সরকারের পক্ষ হতে নির্ধারিত। এতে সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৩. শরী'আতের পক্ষ হতে নির্ধারিত যাকাত মাফ করার কারো অধিকার নেই। কিন্তু টেক্স সরকার প্রয়োজনে মাফ করতে পারে। (শামী, ২য় খণ্ড)।

### যাকাত আদায় না করে মারা গেলে

কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর আদায় করার পূর্বে সে যদি মারা যায় তবে মরার পূর্বে অসিয়্যত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে তার পরিত্যাক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে যাকাত আদায় করা হবে। আর অসিয়্যত না করে গেলে উত্তরাধিকারদের উপর তার পক্ষ হতে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করে দেওয়া ভাল (শামী, ২য় খণ্ড)।

### সংগৃহীত যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং কাউকে ঋণ দেওয়া

কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত যাকাতের টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়িয নেই। উসূলকৃত যাকাতের টাকা কাউকে ঋণ দেওয়াও জায়িয নেই।

### যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়িয নয়

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদেরকে যাকাতের মাল দেওয়া জায়িয নয় ঃ

১. বনী হাশিম অর্থাৎ হযরত আলী, আব্বাস, জাফর, আকীল এবং হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) -এর বংশধরকে যাকাত দেওয়া জায়িয নয় (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

২. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা জায়িয নয়।

৩. অনুরূপ তার নাবালিগ সন্তানকেও যাকাত দেওয়া জায়িয নয়।

৪. যাকাত দাতার পিতা, পিতামহ ও তার পিতৃপুরুষদের কাউতে যাকাত দেওয়া জায়িয নয়।

৫. অনুরূপ নিজ সন্তান সন্ততি ও অধস্তন সন্তানাদির কাউকে যাকাত দেওয়া জায়িয নয়।

৬. স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়িয নয়।

৭. যাকাত দাতার নিজের যে কোন প্রকার গোলাম বাঁদীকে (কৃতদাসকে) যাকাত দেওয়া জায়িয নয়।

৮. যাকাতের অর্থ দ্বারা গোলাম বাঁদীকে পূর্ণ শরীক করে অথবা আংশিক শরীক করে আযাদ

www.pathagar.com

করাও জায়িয নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া ১ম, খণ্ড)।

৯. ধনী মুজাহিদকে যাকাত দেওয়া জায়িয নয় (বজলুল মাজহুদ, ফতহুল কাদীর, হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

১০. নিরাপত্তা লাভ করে কোন কাফির ইস্‌লামী রাষ্ট্রে অবস্থান করলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়িয নেই।

১১. মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য যাকাত দেওয়া জায়িয নেই (নুরুল ইযাহ্‌, ১৬২ পৃঃ।

১২. মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ, পুল নির্মাণ, পানির ব্যবস্থার জন্য কূপ খনন বা নলকূপ বসানো, পানির ঘাট, রাস্তা সংস্কার করানো এবং হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি কাজে যাকাত দেওয়া জায়িয নেই। কেননা যাকাত আদায় সহীহ্‌ হওয়ার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে মালিক বানিয়ে দেওয়া অপরিহার্য। আর উল্লিখিত কাজসমূহে তামলীকে শাখ্‌সী (ব্যক্তি মালিকানা) হয় না। তাই যাকাত আদায় সহীহ্‌ হবে না। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# উশ্‌র ও খারাজ

### উশ্‌র কি ?

গরীব মুসলমানদের সাহায্যার্থে ইসলামী শরী'আত জমি এবং বাগানের উৎপাদিত ফসল ও ফল-ফলাদির উপর যে দেয় ধার্য করেছে তার নাম 'উশ্‌র'।

বস্তুত 'উশ্‌র'(عُشْر) আরবী শব্দ। এর অর্থ দশমাংশ। পরিভাষায় العُشْر علم لما يَأْخُذ العَاشِر। - উশ্‌রী যমীনের উৎপাদিত ফসল থেকে'আশির'(عَاشِر) যে দশমাংশ মাল উসূল করে থাকে তাকে 'উশ্‌র' বলা হয়। উশরকে সাদাকাহ্ এবং যাকাতও বলা হয়।

### উশরী যমীনের পরিচিতি

ফকীহ্‌গণের মতে, কোন দেশ যদি শান্তি চুক্তির ভিত্তিতে বিজিত হয় এবং সাথে সাথে এর অধিবাসীগণও মুসলমান হয়ে যায় তবে তাদের যমীন তাদের মালিকানায়-ই থাকবে। শরী'আতে এ সকল ভূমি উশরী ভূমি হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং এর উপর উশ্‌র ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে কোন দেশ যদি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হওয়ার পর মুসলিম শাসক ঐ দেশের ভূমি মালে গণীমত বন্টনের নিয়মানুসারে পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ যোদ্ধাদেরকে বন্টন করে দেয় এবং অপর এক ভাগ (১/৫) রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আওতায় রেখে দেয়। তবে যোদ্ধাদের মালিকানাধীন ভূমি উশ্‌রী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের ভূমি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে তাদের উপর উশ্‌র ধার্য করে দিয়ে ছিলেন।

এ ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের সময় যে ভূমি কারো মালিকানাধীন ছিল না এবং আবাদযোগ্যও ছিল না।এরূপ ভূমি যদি মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশে কোন মুসলমান আবাদ করে অথবা কোন বসত বাড়ীকে চাষী জমি বা বাগানে রূপান্তরিত করা হয় তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে এর নিকটবর্তী ভূমি যদি উশ্‌রী ভূমি হয় তবে এ ভূমিগুলোও উশরী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। অন্যথায় হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ সকল ভূমি যদি পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হয় তবে তা উশ্‌রী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর উক্তিটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে অনাবাদি ভূমি কোন অমুসলিম আবাদ করলে বা কোন বসত বাড়ীকে বাগান অথবা চাষী ভূমিতে রূপান্তরিত করলে তা খারাজী জমি হিসাবে গণ্য হবে (শামী, ৪র্থ খণ্ড ও জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, ২য় খণ্ড)।

অনুরূপভাবে যে সকল দেশ যুদ্ধ করে জয় করা হয়েছে, ঐ দেশের বাসিন্দাগণ যদি মুসলিম

www.pathagar.com

শাসকের নির্দেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম শাসক যদি গনীমতের মাল বন্টনের নিয়ম অনুযায়ী যোদ্ধাদের মাঝে ঐ ভূমি বন্টন করে দেন তবে উক্ত ভূমি উশ্‌রী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। পাহাড়ী জমি যেখানে পানি পৌছে না, সে ভূমিগুলোও উশ্‌রী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে (কাযী খান, ১ম খণ্ড)।

বৃষ্টির পানি, বড় বড় নদীর পানি,উশরী জমিতে খননকৃত কূপ এবং উশ্‌রী জমির প্রস্রবণের পানি উশ্‌রী পানি হিসাবে গণ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## উশ্‌র ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

উশ্‌র ওয়াজিব হওয়ার শর্ত চারটি ঃ

১. মুসলমান হওয়া, কাফিরের উপর উশ্‌র ওয়াজিব নয়,

২. ভূমি উশ্‌রী হওয়া,

৩. ভূমি হতে ফসল অর্জিত হওয়া,

৪. উৎপাদিত ফসল এমন হতে হবে যা এ জাতীয় ভূমি হতে সচরাচর উৎপাদন করা হয়। এবং যা দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে থাকে। উশ্‌র ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া এবং নিসাব পরিমাণ মাল হওয়া শর্ত নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও বাদাউস্‌ সানায়ে, ১ম খণ্ড)।

যে সকল ভূমির ফসল বৃষ্টি বা বর্ষার পানি দ্বারা উৎপাদন করা হয় পরিশ্রম করে পানি সিঞ্চন করে নয় সে সব ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ দশ মণ হলে এক মণ। আর যে সব ভূমির ফসল পরিশ্রম করে পানি সিঞ্চন উৎপাদন করতে হয় সে সব ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের একভাগ আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ বিশ মন হলে এক মণ দিতে হবে।

আর যদি কোন ভূমির ফসল বৃষ্টি ও সেচ ব্যবস্থা উভয়ের সমন্বয়ে উৎপাদিত দ্রব্য হয় তবে বৃষ্টির পানি অধিক হলে দশ ভাগের এক ভাগ, আর সেচের পানি অধিক হলে বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল আদায় করতে হবে। এমনিভাবে কোন ভূমির ফসল যদি বৃষ্টি, কূপ এবং নহরের পানির সমন্বয়ে উৎপাদিত হয় তবে সে ভূমির অর্ধেক উৎপন্ন দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ এবং বাকী অবশিষ্ট অর্ধেক উৎপন্ন দ্রব্যের বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হবে (জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, ২য় খণ্ড)।

## খারাজ

'খারাজ' (خَراج) আরবী শব্দ। এর অর্থ যমীর উৎপন্ন দ্রব্য। যমীনে উৎপাদিত ফসল, যমীনের ভাড়া, গোলামের উপার্জনের উপর নির্ধারিত ট্যাক্স ইত্যাদিকে খারাজ বলা হয়। পরিভাষায় মুসলিম শাসক কোন অধিকৃত এলাকার অমুসলিমদেরকে কর আরোপ করত নিজ নিজ ভূমি ভোগ দখলের অনুমতি প্রদান করলে ঐ করকে 'খারাজ' বলে। এবং ঐ যমীনকে খারাজী যমীন বলে। অনুরূপ কোন দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হওয়ার পর মুসলিম শাসক ঐ দেশের ভূমি যোদ্ধাদেরকে বন্টন না করে তা সেখানকার অমুসলিম অধিবাসীদের নিজ নিজ

www.pathagar.com

অধিকারে ছেড়ে দিলে ঐ ভূমিও খারাজী ভূমি হিসাবে গন্য হবে (কাযী খান, ১ম খণ্ড ও জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ্‌ ২য় খণ্ড)।

এমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের সময় যে ভূমি কারো মালিকানাধীন ছিল না, আবাদযোগ্যও ছিল না, এরূপ ভূমি যদি মুসলিম শাসকের অনুমতিক্রমে অমুসলিম কোন ব্যক্তি আবাদ করে তবে এ ভূমিও খারাজী ভূমি হিসাবে গন্য হবে (জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ্‌, ২য় খণ্ড)।

কোন দেশ যদি সন্ধিসূত্রে মুসলিম শাসনের অধিকারে আসে এবং এ দেশের বাসিন্দাগণ যদি অমুসলিম রয়ে যায় আর সে দেশের ভূমি যদি খারাজী পানির দ্বারা আবাদ করা হয় তবে সে ভূমিও খারাজী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে (কাযী খান, ১ম খণ্ড)।

### খারাজী পানি

যে সকল নহর বা কূপ রাষ্ট্রীয়ভাবে খনন করা হয় অথবা কোন দল নিজেদের শ্রম বা অর্থে খনন করে এবং তা তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকে তবে এ সকল পানি খারাজী পানি হিসাবে গণ্য হবে।

### বাংলাদেশের জমির হুকুম

বাংলাদেশের জমিকে এককভাবে উশ্‌রী বা খারাজী কোনটাই বলা যাবে না। মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হতে ধারাবাহিকভাবে যে জমি মুসলমানদের মালিকানায় চলে আসছে তা উশ্‌রী জমি বলে গণ্য হবে। অনাবাদী জমি যা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতিতে মুসলমানগণ আবাদ করেছে তা ও উশ্‌রী জমি হিসাবে গণ্য হবে। আর অমুসলিম লোকেরা তা আবাদ করে থাকলে তা খারাজী জমি হিসাবে গণ্য হবে। অমুসলিমদের নিকট হতে কোন মুসলমান কোন জমি খরীদ করলে তা খারাজী জমি হিসাবে গণ্য হবে (বাদায়েউস্‌ সানায়ে, ১ম খণ্ড ও জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ্‌, ২য় খণ্ড)।

### ফল ও ফসলের যাকাত

ফল ও ফসলের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল ঃ

১. ভূমি উৎপাদনশীল হওয়া,

২. ভূমি ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়া,

৩. মালিক মুসলমান হওয়া এবং ভূমি উশরী হওয়া ইত্যাদি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে উশ্‌রী যমীনের উৎপাদিত ফল ও ফসল যথা গম, যব, ধান, পাট, বীজ, সরিষা, কলাই, বুট, সুপারী নারিকেল, ইক্ষু, খেজুর, কলা ইত্যাদির উপর উশ্‌র ওয়াজিব। আর এটাই হল যমীনের যাকাত। এমনিভাবে পাহাড়ী গাছের ফল ফলাদির উপরও উশ্‌র ওয়াজিব। অনুরূপভঅবে কোন মুসলমান নিজের বাড়ী বা কোন কবরস্থানকে বাগান বানালে ঐ বাগান যদি উশ্‌রী পানি দ্বারা আবাদ করা হয় তবে বাগানের ফল ফলাদির

www.pathagar.com

উপর উশ্‌র ওয়াজিব হবে। বাড়ীতে উৎপাদিত ফল ফলাদির উপর উশ্‌র ওয়াজিব হয় না (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড ও হিদায়া, ২য় খণ্ড)।

উশ্‌রী জমির ফসল যদি অনিচ্ছাকৃত কোন কারণবশত নষ্ট হয়ে যায় তবে এ যমীনের উপর থেকে উশ্‌র মাফ হয়ে যাবে (বাদায়েউস্‌ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

## মধুর যাকাত

উশ্‌রী যমীন হতে মধু সংগ্রহ করা হলে তাতে উশ্‌র ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া, ২য় খণ্ড)।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মধুর উশ্‌র আদায় করার জন্য কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। কমবেশী যাই হোক উশ্‌রী যমীন হতে তা সংগ্রহ করা হলে তাতে উশ্‌র ওয়াজিব হবে (হিদায়া, ২য় খণ্ড)।

## শাকসব্জি ইত্যাদির যাকাত

উশ্‌রী জমি থেকে উৎপাদিত প্রত্যেক বস্তু যথা শাক-সবজি তরি-তরকারী ইত্যাদির উপর উশর ওয়াজিব। বৃষ্টি বা কুদরতী পানি দ্বারা শাক্‌ সবজী আবাদ হলে এক-দশমাংশ উশ্‌র আদায় করতে হবে। আর বালতি ঢোল ইত্যাদির দ্বারা পানি সিঞ্চন করে আবাদ করা হলে বিশ ভাগের এক ভাগ উশ্‌র আদায় করতে হবে। এমনিভাবে আখরোট এবং বাদামের উপরও উশর ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া, ২য় খণ্ড)।

## ইজারা দেওয়া জমির ফসলের যাকাত

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি উশ্‌রী জমি ইজারা (ভাড়া) দেওয়া হয় তবে ঐ জমির উৎপাদিত ফসলের উর উশ্‌র ওয়াজিব হবে। এবং ইজারাদাতা মালিক তা আদায় করবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইজারা গ্রহণকারীর উপর তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি ফসল কাটার পূর্বেই ফসল নষ্ট হয়ে যায় তবে ইজারা দাতার উপর উশর ওয়াজিব হবে না। এবং যদি ফসল কাটার পর তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইজারাদাতা ব্যক্তিকে উশ্‌র আদায় করতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে কোন অবস্থাতেই উশ্‌র ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## খারাজী জমির ফসলের যাকাত

খিরাজ দুই প্রকার ঃ

১. খারাজে মুকামামা,

২. খারাজে মুওয়াকাফ।

ফসলের অংশ বিশেষ ধার্য করত খারাজ আদায় করাকে 'খিরাজে মুকামামা' বলে। আর খারাজী ভূমির উপর নগদ অর্থ ধার্য করে খারাজ আদায় করাকে খিরাজে মুওয়াকাফ বলে।

www.pathagar.com

ফকীহগণের মতে বিজয়লগ্নে জমির উপর যে প্রকার খারাজ ধার্য হবে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা জায়িয হবে না। খারাজে মুকামামার ক্ষেত্রে ফসলের এক পঞ্চমাংশের কম এবং অর্ধাংশের অধিক খারাজ ধার্য করা জায়িয নয়। খারাজ মুওয়াকাফের ক্ষেত্রে শাসক উৎপাদন অনুপাতে এই পরিমাণ খারাজ ধার্য করবেন যাতে জমির মালিকের উপর যুলুম না হয় (জাওয়াহিরুল ফিক্হ, ২য় খণ্ড)।

যদি খারাজী জমি প্লাবিত হয়ে যায় বা জমিতে পানি পৌছানোর কোন উপায় না থাকে বা অন্য কোন বিপর্যয়ের দরুন জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব না হয় বা জমি চাষাবাদ উপযোগী না থাকে বা কেউ জমি চাষ করতে বাধা দেয় মোটকথা পুরো বছর যদি জমিতে কোন ধরণের ফসল উৎপাদন না হয় তবে এ ধরণের ভূমি হতে খারাজ মাফ হয়ে যাবে। অবশ্য জমি চাষাবাদ উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা করে চাষ না করলে খারাজে মুকামামা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু খারাজে মুওয়াকাফ মাফ হবে না (জাওয়াহিরুল ফিক্হ, ২য় খণ্ড)।

## ওয়াক্ফকৃত ভূমির ফসলের যাকাত

ওয়াক্ফকৃত ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপরও উশর ওয়াজিব। কেননা উশ্‌র ওয়াজিব হওয়ার জন্য ভূমির মালিক হওয়া শর্ত নয় বরং উৎপাদিত ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। কারণ উশ্‌র ফসলের উপর ওয়াজিব হয় জমির উপর নয় (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

www.pathagar.com

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# সাদাকাতুল ফিত্‌র

### সাদাকুতুল ফিত্‌র-এর পরিচিতি

'সাদাকাহ্‌' আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ দান। পরিভাষায় –

هِيَ الْعَطِيَّةُ الَّتِيْ يُرَادُ بِهَا الثَّوَابُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ যে দান দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট সাওয়াবের আশা করা যায় তাকে সাদাকাহ্‌ বলে। 'আল-ফিত্‌র' (الفطر) আরবী শব্দ। ফকীহ্‌দের পরিভাষায় তা হল– রোযা না রাখা। এ অর্থেই ব্যবহার হয় 'ঈদুল ফিত্‌র' (কাওয়াঈদুল ফিক্‌হ)।

পরিভাষায় 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' বলা হয় নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের উপর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যে দেয় ওয়াজিব হয়।

আল্লামা যুবায়দী (র.) বলেন, যেহেতু 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' রামাযান শেষে রোযা ভঙ্গের দরুন ওয়াজিব হয়, তাই তাকে 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' বলা হয়। এর অপর নাম 'যাকাতুল ফিত্‌র'।

মূলত পবিত্র মাহে রামাযানের রোযা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পাক বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন তার শুকুর হিসাবে এবং রোযা পালনের মূল উদ্দেশ্য সাধনে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' ওয়াজিব করা হয়েছে।

ওয়াকী ইব্‌নুল জার্‌রাহ্‌ (র.) বলেন, 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' রামাযানের ক্ষতি পূরক তেমনিভাবে সিজ্‌দায়ে সাহু নামাযের ক্ষতিপূরক।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের উপর সাদ্‌কায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এক খুত্‌বায় ইরশাদ করেন ঃ

আযাদ, গোলাম, ছোট বড় প্রত্যেকের পক্ষ থেকে তোমরা আধা সা' গম, বা এক সা' যব বা এক সা' খেজুর 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' হিসাবে আদায় করবে (আবূ দাঊদ)।

### যাদের উপর সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব

আযাদ মুসলমান যিনি জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যথা আবাস গৃহ, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের সরঞ্জামাদী, খাদ্যদ্রব্য, যুদ্ধের বাহন যথা ঘোড়া, উট ইত্যাদি, অস্ত্র সস্ত্র ও খিদমতের দাস ব্যতীত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক তার উপর 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' ওয়াজিব (ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্তে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেই 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' ওয়াজিব হবে (নূরুল ঈযাহ্)।

সাদাকাতুল ফিত্‌রের মাল মালেনামী অর্থাৎ বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। যদি কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পূর্বেই 'সাদাকায়ে ফিত্‌র' আদায় করে দেয় এবং পরে সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তবে তার আদায়কৃত ফিত্‌রা বৈধ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাদাকায়ে ফিত্‌র নিজের পক্ষ থেকে ও নিজের নাবালিগ সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব। সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার পর মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে সাদাকার হুকুম বাতিল হবে না বরং তা আদায় করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে তুলে দেয় তবে পিতার উপর ঈদের দিন তার ফিত্‌রা আদায় করা ওয়াজিব নয়। (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির উপর তার দাদা-দাদী, নানা-নানী, মাতা-পিতা, প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে সাদাকা আদায় করা ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

একজনের 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' এক জনকে অথবা কয়েকজনকে বন্টন করে দেওয়া জায়িয আছে। যেমনিভাবে অনেক জনের সাদাকা একজনকে দেওয়া জায়িয (ইমদাদুল ফাতাওয়া, ২য় খণ্ড ও ফাতাওয়ায়ে মাহ্‌মূদীয়া ৩য় খণ্ড)।

অনুমতি ব্যতিরেকে এক জনের সাদাকা অন্য জনের আদায় করা জায়িয নেই (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

## যাদের ফিত্‌রা আদায় করা ওয়ালীর উপর ওয়াজিব

বিত্তহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়ালীর উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে প্রাপ্তবয়স্ক, মতিভ্রম ও পাগল সন্তানের সাদাকা আদায় করাও ওয়ালীর উপর ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং স্ত্রী ও পিতা-মাতার সাদাকা আদায় করা ওয়ালীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এক ভাইয়ের সাদাকায়ে ফিত্‌র অন্য ভাইয়ের আদায় করা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে কোন নিকট আত্মীয়ের ফিত্‌রা আদায় করা অন্য আত্মীয়ের উপর ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যার উপর 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' আদায় করা ওয়াজিব ছিল সে যদি তা আদায় করার পূর্বেই মারা যায় তবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে 'সাদাকায়ে ফিত্‌র' আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তার উত্তরসূরীরা যদি সাদাকা আদায় করে দেয় তবে আদায় হয়ে যাবে। উত্তরসূরীরা নিষেধ করলে জোরপূর্বক তাদের থেকে সাদাকা আদায় করে করা জায়িয হবে না। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি এ ব্যাপারে ওয়ারিসদের অসিয়্যত করে গিয়ে থাকে তবে তার মালের এক

www.pathagar.com

তৃতীয়াংশ হতে 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' আদায় করা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সময়

ঈদের দিন সুব্‌হে সাদিকের সময় সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয়। সুতরাং কেউ যদি সুবহে সাদিকের পূর্বেই ইন্‌তিকাল করে তবে তার সাদাকা আদায় করা ওয়াজিব নয়। সুবহে সাদিকের পূর্বে যদি কোন বিত্তবান লোকের সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে তার সাদাকা ও আদায় করতে হবে। যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তি সুব্‌হে সাদিকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার উপর সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি সুবহে সাদিকের পর কোন বিত্তবান লোকের সন্তান ভূমিষ্ট হয় অথবা কোন কাফির সুব্‌হে সাদিকের পর ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের উপর সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ফকীর সুবহে সাদিকের পূর্বে নিসাবের মালিক হয়ে যায় তবে তার উপরও সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি কোন ধনী ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে গরীব হয়ে যায় তবে তার উপর সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, শামী, ২য় খণ্ড ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

ফিত্‌রা এবং রোযা দু'টি পৃথক পৃথক ইবাদত। তাই কেউ যদি বার্ধক্যজনিত কারণে বা অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে রোযা রাখতে না পারে তবে তার থেকে সাদাকায়ে ফিত্‌র রহিত হবে না। বরং তাদের উপর সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### সাদাকাতুল ফিত্‌র ঈদের নামাযের আগে বা পরে দেওয়ার হুকুম

কোন ব্যক্তি যদি ঈদের নামাযের আগে রামাযানের মধ্যে সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করে দেয় তবে তাও জায়িয আছে। ঈদের দিন তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। আর যদি ঈদের নামাযের আগে আদায় না করে তবে তার সাদাকায়ে ফিত্‌র মাফ হবে না। অন্য সময় তা আদায় করতে হবে। অবশ্য নামাযের আগে আদায় করা মুস্তাহাব (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

### সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার নিসাব ও পরিমাণ

কোন ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণ যথা আবাস গৃহ, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্য দ্রব, ঘরের সরঞ্জামাদি এবং খিদমতের গোলাম ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা এর সমমূল্যের কোন সম্পদের মালিক থাকলে তার উপর 'সাদাকায়ে ফিত্‌র' ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, শামী, ২য় খণ্ড ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

'সাদাকাতুল ফিত্‌র' ওয়াজিব হওয়ার জন্য মালে-নামী অর্থাৎ বর্ধনশীল মাল হওয়া শর্ত নয়। পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয়। বরং ঈদুল ফিত্‌রের দিন সুবহে সাদিকের সময় উপরোক্ত পরিমাণ মালের মালিক থাকলে সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায়ের মুস্তাহাব তরীকা

ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে 'সাদাকায়ে ফিত্‌র' আদায় করা মুস্তাহাব। কোন কারণবশত সাদাকা আদায় না করতে পারলে পরে আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঈদের নামাযের পূর্বেই সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করতেন (হিদায়া, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

ফকীহ্‌গণের মতে সাদাকায়ে ফিত্‌র বছরের যে কোন সময় আদায় করা জায়িয আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও বাদায়েউস্ সানায়ে)।

## সাদাকাতুল ফিত্‌র -এর পরিমাণ এবং যে যে জিনিষ দ্বারা তা আদায় করা যায়

সাদাকায়ে ফিত্‌র গম, যব, খেজুর এবং কিসমিস দ্বারা আদায় করা জায়িয আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাদাকায়ে ফিত্‌র যদি গম বা গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা আদায় করা হয় তবে আধা সা' অর্থাৎ এক কেজি সাড়ে সাত শ' গ্রাম আদায় করতে হবে।

আর যদি খেজুর বা যব বা যবের আটা বা কিশমিশ দিয়ে সাদাকা আদায় করা হয় তবে এক সা' অর্থাৎ তিন কেজি চার শ' গ্রাম আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

গমের আটা ও **গমের ছাতু গমের** অন্তর্ভূক্ত এবং যবের আটা ও যবের ছাতু যবের হুকমে অন্তর্ভূক্ত। রুটি দিয়ে সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা জায়িয নেই। তবে মূল্য হিসাব করে তা দিয়ে আদায় করলে আদায় সহীহ্ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায়ের ক্ষেত্রে গমের তুলনায় আটা এবং আটার তুলনায় তার মূল্য দ্বারা আদায় করা উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি সাদাকাতুল ফিত্‌র গম বা যব ব্যতীত অন্য কোন শস্য যেমন ধান, চাউল, বুট, কলাই ইত্যাদি দিয়ে আদায় করতে হয় তবে আধা সা' গমের মূল্য পরিমাণ চাউল, ধান, বুট দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করলে আদায় সহীহ্ হবে। মূল্য হিসাব না করে অনুমান করে আদায় করলে সাদাকা আদায় হবে না (ফাতাওয়ায়ে মাহ্‌মূদীয়া, ৩য় খণ্ড)।

## অমুসলিমকে সাদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান

কোন অমুসলিম ব্যক্তি বিধর্মী রাষ্ট্রের প্রজা হলে সর্ব-সম্মতিক্রমে তাদেরকে সাদাকায়ে ফিত্‌র প্রদান করা জায়িয নেই, আর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হলে তাদেরকে ফিত্‌রা দেওয়া জায়িয। তবে মুসলমানকে দেওয়া উত্তম। ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজাদেরকে সাদাকায়ে নফল দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

# নফল সাদাকাত

### নফল সাদাকাতের পরিচিতি

সাদাকা ঈমানের সত্যতার প্রমাণ এবং বিচার দিনের সত্যতা, যথার্থতার স্বীকৃতি। তাই নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ اَلصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ -সাদাকা অকাট্য দলীল।

কুরআন ও হাদীসে 'সাদাকা' শব্দটি যেমন যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রূপ নফল সাদাকা অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ 'যাকাত' শব্দটিও উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ফিক্হ -এর পরিভাষায় শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত দেয় আদায় করাকে 'যাকাত' এবং নফল দান করাকে 'সাদাকা' বলা হয়।

কুরআন ও হাদীসে যাকাত দানের বিষয় যেমন তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ নফল সাদাকার বিষয়েও উৎসাহিত করা হয়েছে।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَّ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে তাদের উপমা একটি শষ্য বীজ যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে একশ' শষ্য কণা। আল্লাহ্ বহুগুণে বৃদ্ধি করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ প্রচুর্যময় সর্বজ্ঞ (২ ঃ ২৬১)।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

যারা ব্যয় করে তাদের ধন সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য রয়েছে সাওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবেনা (২ ঃ ২৭৪)।

নবী কারীম (সা.) বলেন ঃ তোমরা দান কর। কেননা তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার সাদাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু এমন কাউকে খুঁজে পাবেনা যে তা গ্রহণ করবে। (সাক্ষাৎপ্রাপ্ত) ব্যক্তি বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে তবে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আর আমার প্রয়োজন নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

www.pathagar.com

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি। এক টুক্‌রা খেজুর দান করে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক (বুখারী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা.) -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কোন ধরণের দানে অধিক সাওয়াব রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় এবং দারিদ্রের আশংকা করছ, ধনী হওয়ার আশা পোষণ করছ, এমতাবস্থায় যে দান করবে। (দানের ব্যাপারে) আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবেনা, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপররের জন্যই হয়ে গেছে (বুখারী)।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যদি কোন স্ত্রী লোক স্বামীর সম্পদ বিনষ্ট করার উদ্দে'শ্য ছাড়া স্বামীর খাদ্য সামগ্রী থেকে কিছু দান করে তবে সে সাওয়াব লাভ করবে এবং তার স্বামীও সাওয়াব পাবে। কারণ সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে (বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন আল্লাহ্‌র বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফিরিশ্‌তা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ্! দাতাকে উত্তম বিনিময় দান আর অপরজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ্! কৃপণের সম্পদকে ধ্বংস কর (বুখারী)।

## রামাযান মাসে দান খয়রাতের বিশেষ ফযীলত

রামাযান মাস সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ মাস। এ মাসে রহমত বরকত ও কল্যাণের মাস। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। এ মাসের একটি নফল একটি ফরযের সমতুল্য এবং একটি ফরয সত্তরটি ফরযের সমতুল্য। কাজেই এ মাসে দান খয়রাতের ফযীলত সর্বাধিক।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকরাম (রা.) বলেন, লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন।বিশেষত রামাযান মাসে যখন জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দানশীলতা আরো অধিক বেড়ে যেত। জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁর সাথে রামাযানের প্রতি রাতে সাক্ষাৎ করতেন ও কুরআনের দাওর করাতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণ বিতরণ প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল (বুখারী)।

হযরত সালমান ফারিসী (রা.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ মাসে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল আমল করবে সে ঐ ব্যক্তির সমান সাওয়াব লাভ করবে যে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করেছে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয কাজ করবে সে ঐ ব্যক্তির সমান সাওয়াব লাভ করবে যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করেছে (মিশ্‌কাত)।

## সমস্ত মাল সাদাকা করা

দান-খয়রাত করা উত্তম আমল এবং কৃপণতা নিন্দনীয়। তবে সমস্ত মাল দান করে নিঃস্ব হয়ে যাওয়াও পছন্দনীয় নয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

তুমি তোমার হাতকে তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখনা এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত ও করোনা তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে (সূরা বণী ইসরাইল ঃ ২৯)।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করেনা এবং কার্পণ্য করেনা। বরং তাদের ব্যয় হয়ে থাকে এতদুয়ের মাঝামাঝি পন্থায় (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৭)।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)'-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি ডিমাকৃতি এক টুকরা স্বর্ণ নিয়ে তাঁর নিকট এসে বললো হে আল্লাহ্র রাসূল! এই স্বর্ণের টুকরাটি আমি খনি হতে পেয়েছি। আপনি তা সাদাকা স্বরূপ গ্রহণ করুন। এ ছাড়া আমার আর কিছুই নেই (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এরপর লোকটি তা তাঁর ডান দিকে এসে একই কথা বলল। তিনি এবারও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এরপর সে তাঁর বাম দিকে এলে তিনি এবারও তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন। এরপর সে তাঁর পেছন দিক থেকে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা গ্রহণ করে তার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তা যদি তার দেহে লাগত তবে অবশ্যই সে আঘাত পেত অথবা বলেছেন আহত হতো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার মালিকানার সমস্ত মাল নিয়ে এসে বলে এটা সাদাকা, তারপর সে মানুষের নিকট হাত পেতে সাহায্য চায়। (অথচ এরূপ করা উচিত নয়)। সাদাকা তাই যা প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল হতে দেওয়া হয় (আবূ দাঊদ)।

হযরত সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে সমস্ত সম্পদ দান করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে নিষেধ করেন। তিনি দুই তৃতীয়য়াংশ অতঃপর অর্ধেক দান করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাও নিষেধ করেন। তারপর এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদাকা করতে চাইলে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) অনুমতি দেন এবং বলেন পরিমাণে তাও বেশী। তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে এমন অবস্থায় রেখে যাওয়া যে তারা মানুষের নিকট হাত পাততে বাধ্য হয় এর চেয়ে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)।

কোন ব্যক্তি যদি ঋণমুক্ত হয় এবং তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তবে সে তার সমস্ত সম্পদ দান করতে পারবে।

## দান করার উত্তম পদ্ধতি

প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয়ভাবেই দান করা জায়িয। তবে নফল দান খয়রাত গোপনে করাই উত্তম।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

তোমরা যদি প্রাকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। এবং তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়ে সম্যক অবগত (সূরা বাকারা ঃ ২৭১)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

যারা নিজেদের ধন সম্পদ রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে তাদের পূণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না (সূরা বাকারা ঃ ২৭৪)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হাকিম ইব্ন হিসাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ হতে দান করা উত্তম সাদাকা এবং যাদের ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব তোমার উপর তাদের থেকে সাদাকা আরম্ভ করবে (বুখারী)।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কাকে হাদিয়া দেব? তিনি বললেন ঃ যার ঘরের দরজা তোমার ঘরের অধিক নিকটে (বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন প্রকার দান উত্তম? তিনি বললেন ঃ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির দান। তুমি তোমার দান তোমার পোষ্যদের দিয়ে শুরু করবে (আবূ দাউদ)।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ কোন অভুক্ত মানুষকে তৃপ্তি সহকারে আহার করান উত্তম (বায়হাকী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা.) নিকট এসে বলল, আমার কাছে একটি দীনার আছে, আমি তা কোন্ কাজে ব্যয় করব? তিনি বললেন ঃ এটি তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার কাছে আরো একটি আছে নবী (সা.) বলেন ঃ এটি তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল আমার নিকট আরো একটি আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ এটি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট আরো একটি আছে। নবী (সা.) বললেন ঃ এটি তুমি তোমার খাদিমের জন্য ব্যয় কর। অতঃপর লোকটি বলল, আমার নিকট আরো দীনার আছে এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ তুমি অধিক জান যে তা কোথায় ব্যয় করবে (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, গোপনে, প্রকাশ্যে, স্বচ্ছল ও অভাবগ্রস্ত তথা সর্বাবস্থায় দান করা যায়। পোষ্যদেরকে দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে অনুপ্রাণিত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এবং সাথে সাথে নিজ স্বচ্ছলতার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**যে সব কারণে দানের ফযীলত নষ্ট হয়ে যায়**

মানব জীবনে দান খয়রাতের গুরুত্ব অপরিসীম আর দান খয়রাতের দ্বারা অনেক বড় বড় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন কারণে দানের সাওয়াব থেকে দাতা বঞ্চিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

হে মু'মিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃন পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তা পরিষ্কার করে রেখে দেয়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবেনা। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى وَ اللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ

যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা করা উত্তম। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত পরম সহনশীল (সূরা বাকারা ঃ ২৬৩)।

উল্লিখিত আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, দান খয়রাত খালিসভাবে আল্লাহ্র জন্যই হতে হবে। তা খোটা দেওয়া ও পীড়াদান থেকে মুক্ত হতে হবে। অন্যথায় দান খয়রাতের সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে যাবে। দানের সাথে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দানের সাওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে দান করা উচিত নয়। এরূপ করা হলে সে দান বাতিল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে (সূরা আল-বায়্যিনা ঃ ৯৮, ৫)।

অতএব যে কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হবেনা তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাতে সাওয়াবও পাওয়া যাবে না। মহানবী (সা.) দান খয়রাতের সাওয়াব

www.pathagar.com

বিনষ্ট হওয়ার কারণ চিহ্নিত করে বলেছেন ঃ খোটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মানবতার কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে করেছেন ধনী ও নির্ধন। ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব ও অভাবগ্রস্তের অধিকার। তাই ধনী ব্যক্তিরা দান-খয়রাত করবে, তা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُورًا

আহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার করায় এবং বলে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দশ্যেই আমরা তোমাদের আহার করাই আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও না (সূরা দাহর ঃ ৮, ৯)।

প্রয়োজনে অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দেওয়ার জন্য ইসলামে উৎসাহিত প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ○

লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, তারা কী ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনাতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে নফল সাদাকার বেলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা ব্যয় করতে পারবে। তবে সন্তানদেরকে কষ্টে ফেলে এবং তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সাদাকা করার উচিত নয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দীনার আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ এটি তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার কাছে আরো একটি আছে, নবী (সা.) বলেন ঃ এটি তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট আরো একটি আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ এটি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট আরো একটি আছে, নবী (সা.) বললেন ঃ এটি তুমি তোমার খাদিমের জন্য ব্যয় কর। অতঃপর লোকটি পুনরায় বলল, আমার নিকট আরো দীনার আছে এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ তুমি অধিক জান যে তা কোথায় ব্যয় করবে (তাফসীরে তাবারী)।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ প্রথমে নিজের জন্য খরচ কর। অতঃপর স্ত্রীকে দাও। এরপর যদি থাকে তবে পরিবারবর্গকে দাও। তারপর যদি থাকে তবে আত্মীয়-স্বজনকে দাও এবং এভাবে অগ্রসর হও (তাফসীরে ইব্ন কাসীর)।

অন্য হাদীসে আছে, হে আদাম সন্তান! প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা তোমার জন্য

www.pathagar.com

অধিক কল্যাণকর এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য অকল্যাণকর। প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করাতে তুমি নিন্দিত হবে না এবং যাদের ভরণপোষণ তোমার দায়িত্বে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ হতে তাদেরকে প্রথমে দান করবে (মুসলিম)।

উক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে এবং নবী কারীম (সা.) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করতে উৎসাহিত করেছেন। সূরা হুমাযা এবং তাকাসূরে সম্পদ সঞ্চয় করে যাকাত ও অন্যান্য দান থেকে বিরত থাকাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের দান খয়রাতের ব্যাপারে বিশেষত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

**সৎ লোকদেরকে দান করা**

দান করার যত খাত রয়েছে এর যে কোন খাতে দান করলেই সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে সৎলোকদেরকে দান করায় রয়েছে অধিক সাওয়াব। কেননা যারা সৎ ও মুত্তাকী তাঁরা আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত। তাঁদেরকে সাহায্য করলে তাঁরা আরো অধিক সৎকাজ করার সুযোগ পাবে। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে সৎ পরহেযগার ও মুত্তাকী লোকদেরকে দান করার ব্যপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

لَا تُصَاحِبْ إِلَا مُؤْمِنًا وَ لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تقى

মু'মিন ব্যতীত কাউকে সাথী বনাবে না এবং পরহেযগার লোক ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায় (মিশকাত)।

দীনের কাজে নিয়োজিত লোকদেরকে দান করার ব্যাপারে কুরআন মজীদে হুকুম করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

দান সাদাকা এমন অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য যারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে (জীবিকার সন্ধানে) দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারবে না, যাঞ্চা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে। আপনি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচ্ঞা করে না। যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)।

উক্ত আয়াতে যে সকল লোক দীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে উপার্জন করতে সক্ষম হয় না তাদেরকে দান সাদাকা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, নেক ও সৎ লোকদেরকে দান করা উত্তম।

www.pathagar.com

## ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দান সাদাকা

ঋণের কারণে যারা দেউলিয়া তথা সর্বসান্ত হয়ে গেছে তাদের উপর দান খয়রাত করা ওয়াজিব নয়। তবে এ অবস্থায় দান খয়রাত করা নিষেধও নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম ঋণগ্রস্ত অবস্থায় দান করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য দান করার চেয়ে ঋণ আদায় করার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক। কেননা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদে পাওনাদারদের হক রয়েছে। তাই প্রথমে ঋণ আদায় করা অপরিহার্য।

নবী কারীম (সা.) ঋণকে খুবই ভয় করতেন। তিনি এর ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ শাহাদতের কারণে যাবতীয় পাপ মোচন হয় কিন্তু ঋণ মাফ হয় না (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক সাহাবীর জানাযায় নবী কারীম (সা.) অংশগ্রহণ করে জানাতে পারেন তিনি ঋণগ্রস্ত। অতঃপর তিনি তার জানাযা না পড়িয়েই চলে আসেন। তারপর আল্লাহ্ যখন তাঁকে ব্যাপক বিজয় দান করেন তখন তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আমি তার চেয়েও আপন। কেউ যদি ঋণ রেখে যায় তবে তা আমাদের দায়িত্বে আর কেউ ধন-সম্পদ রেখে যায় তবে তা তার ওয়ারিসদের জন্য (আবূ দাঊদ)।

## হারাম মাল থেকে দান করা

আল্লাহ্ তা'আলা পূত পবিত্র মহান সত্তা। তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন এবং অপবিত্রতাকে ঘৃণা করেন। হালাল বস্তু পবিত্র এবং হারাম বস্তু অপবিত্র। তাই হালাল তিনি বস্তু দান করলে তা কবূল করেন এবং হারাম বস্তু কবূল করেন না। কাজেই কোন মু'মিন ব্যক্তির হারাম বস্তু গ্রহণ ও দান উভয়ই শরী'আত পরিপন্থী কাজ। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ পবিত্রতা ছাড়া সালাত সহীহ্ হয় না এবং হারাম পন্থায় অর্জিত মালের দান কবূল করা হয়না (তিরমিযী)।

নবী করীম (সা.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন ঃ আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি কেবল পবিত্র জিনিষই কবূল করেন। (বুখারী)

তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করেন। পরে তা দান করে দিল সে কোন সাওয়াব পাবে না। হারাম উপার্জনের গুনাহ তার উপর বোঝা হয়ে চাপবেই (সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান)।

তিনি আরো বলেছেন ঃ বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান খয়রাত করে তা কবূল করা হবে না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকত ও হয়না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায় তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয়। প্রকৃতকথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা নির্মূল করেন না। বরং অন্যায়কে দান দ্বারা দূরীভূত করেন। প্রকৃতপক্ষে ময়লা আবর্জনা ময়লা আবর্জনাকে দূর করতে পারে না (মুসনাদে আহ্মদ)।

www.pathagar.com

# হজ্জ অধ্যায়

# كِتَابُ الحَجِّ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# প্রথম পরিচ্ছেদ

# হজ্জ

## হজ্জের সংজ্ঞা

হজ্জ ইসলামের পঞ্চ রুকনের একটি অন্যতম রুকন। যারা আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে সামর্থবান তাদের উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। হজ্জের আভিধানিক অর্থ, কোন মহৎ কাজের জন্য ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

শরী'আতের পরিভাষায় হজ্জের সংজ্ঞা হল ঃ

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِى زَمَانٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ

আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শরী'আতের নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান তথা বায়তুল্লাহ্ শরীফ এবং সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহ নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে ইসলামের পরিভাষায় হজ্জ বলা হয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীন কাল হতেই আল্লাহ্র প্রেমিক বান্দাগণ বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ ও যিয়ারত করে আসছেন।

হযরত আদম (আ.) আল্লাহ্ পাকের হুকুমে জিব্রাইল (আ.) বাতলানো পদ্ধতি মোতাবেক এ ঘরের তাওয়াফ ও যিয়ারত করেন। এর পর থেকে এই ঘরের তাওয়াফ ও যিয়ারত জারী থাকে। হযরত নূহ্ (আ.)-এর সময়কাল তুফানে এই ঘর লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপা পড়ে যায়। এর পর আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.) -কে কা'বাঘর পুনঃনির্মাণের নির্দেশ দেন। পবিত্র কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করেই হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই বায়তুল্লাহ্ বা কা'বা শরীফের ঐতিহাসিক পটভূমি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা আবশ্যক।

পবিত্র কা'বা ঘর কখন নির্মিত হয়েছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) -এর প্রথম নির্মাতা। আবার অনেকে বলেন, হযরত আদম (আ.) -ই এই ঘর প্রথম নির্মাণ করে ছিলেন। ফিরিশতা কর্তৃক এই ঘর প্রথম নির্মিত হয়েছিল এরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। তবে কা'বা ঘরই যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ পবিত্র কুরআনে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতো বাক্কায় (মক্কায়) তা বরকত ময় ও বিশ্বজগতের দিশারী (৩ ঃ ৯৬)।

জান্নাত থেকে হযরত আদাম (আ.) দুনিয়াতে আগমনের পর তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট ইবাদতের জন্য একখানা ঘর নির্মাণের ফরিয়াদ জানালে আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ কা'বাঘর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন।এরপর হযরত জিব্রাঈল (আ.) -এর স্থান ও নক্শা পেশ করলেন এবং হযরত আদম (আ.) সেই মোতাবেক কা'বাঘর নির্মাণ করেন (শোয়াবুল ঈমান)।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের পুনঃনির্মাণের কাজ সমাধা করার পর জিব্‌রাঈল হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে এই পবিত্র গৃহের তাওয়াফ ও হজ্জ করার জন্য বললেন। এবং হযরত ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আ.) উভয়েই তাওয়াফ সহ হজ্জের যাবতীয় কর্মকান্ড সমাধা করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করলেন হে ইব্‌রাহীম! তুমি বিশ্বময় হজ্জের ঘোষণা ছড়িয়ে দাও। একথা শুনে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! গোটা বিশ্বে কেমন কর আমি আওয়াজ পৌছাব? আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ তুমি ঘোষণা কর আমি পৌছিয়ে দিব। হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.) একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করলেন। মহান রাব্বুল আলামীন পাহাড়-পর্বত; সাগর মহাসাগর ও মরু বিয়াবান তথা মানব-দানবের গোটা জনপদ তার সামনে তুলে ধরলেন।তিনি ডানে বামে পূর্বে পশ্চিমে ফিরে হজ্জের ঘোষণা করলেন। বললেন ঃ

أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَأَجِيْبُوا رَبَّكُم

হে লোক সকল! বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) -এর এই আহ্বান ধ্বনি সমগ্র বিশ্বজগতে গুঞ্জরিত হল। এমন কি পিতৃঔরষে ও মাতৃগর্ভে যারা ছিল তাদেরকেও ঐ আহ্বান শুনিয়ে দেওয়া হল। প্রতিটি মানুষ যাদের তাক্‌দীরে হজ্জ লিখা আছে তারা সকলে উচ্চস্বরে লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করে এ আহ্বানের উত্তর প্রদান করল। সেদিন কেউ সাড়া দিয়েছেন একবার আবার কেউ একাধিকবার। যারা একবার সাড়া দিয়েছেন তাদের একবার হজ্জ নসীব হয়েছে বা হবে। আর যারা একাধিকবার সাড়া দিয়েছেন তাদের একাধিকবার হজ্জ নসীব হয়েছে বা হবে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পর যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন – তাঁদের সকলেই বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত করেছেন এবং হজ্জের যাবতীয় কাজ সমাধা করেছেন (তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর)।

জাহিলিয়্যাতের যুগেও লোকেরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং যিয়ারত করত। কিন্তু তারা তা করত নিজেদের স্ব-কপোলকল্পিত পন্থায়। ভ্রান্তধারণার বশবর্তী তারা বহু জাহিলী রুসূম রেওয়াজ ও বহু জাহিলী কর্মকান্ড হজ্জের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল - হজ্জের মৌসূমে কুরাইশগণ অন্যান্য হাজীদের ন্যায় আরাফায় না গিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করত। তারা বলত আমরা হাকেম অর্থাৎ বীর বাহাদুর, শাসক আমাদের একটা স্বাতন্ত্র ও আভিজাত্য রয়েছে। তাই অন্যান্যদের ন্যায় আমরা সেখানে যেতে

www.pathagar.com

পারি না। বস্তুত তখনকার দিনের হজ্জ ছিল এক গোত্রের উপর অন্য গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কৌলিন্য প্রকাশ করার অন্যতম অনুষ্ঠান। কালের বিবর্তনে হজ্জ তার আপন পবিত্রতা, ভাবগাম্ভীর্য, মহিমা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলল।তামাশা এবং অশ্লীল চিত্তবিনোদন সর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হল। কুরাশরা অকুরায়শ নারী-পুরুষদের উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাঘর তাওয়াফ করতে বাধ্য করত। ইসলাম জাহিলী যুগের এসব কুসংস্কার চিরতরে বন্ধ করে দেয় এবং হজ্জকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী তাক্ওয়া ভিত্তিক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের পবিত্র ইবাদতে পরিণত করে।

পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَ لَافُسُوْقَ وَ لَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ

হজ্জ হয় সুবিদিত মাসে। এরপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তারজন্য হজ্জের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয় (২ ঃ ১৯৭)।

**হজ্জ কখন ফরয হয়েছিল?**

হজ্জ কোন সনে ফরয হয় এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে কেউ বলেন অষ্টম হিজরীতে। আবার কেউ বলেন নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশে হজ্জ পালন করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ম হিজরীতে।

আল্লামা ইব্ন কাইয়েম (র.) বলেন ঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

এই আয়াত নাযিলের মাধ্যমে হজ্জ ফরয হয়। আর এ আয়াত নাযিল হয় নবম হিজরীর শেষ দিকে। সুতরাং নবম হিজরীর শেষভাগে হজ্জ ফরয হয় ইহাই হচ্ছে বিশুদ্ধমত। এই আয়াত নাযিলের পরে দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হজ্জ আদায় করেন, তাই 'বিদায় হজ্জ' নামে খ্যাত। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম হিজরীর হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কিত অভিমতগুলি সম্পর্কে আল্লামা ইব্ন কাইয়েম (র.) বলেন, এর কোনটির সমর্থনেই কোন দলীল নেই (আসাহহুস্ সিয়ার)।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়া সামর্থ আছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য (৩ ঃ ৯৭)।

নবম হিজরী সনে হযরত আবূ সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবাগণ হজ্জ পালন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে তিনি এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক ব্যক্তি হজ্জ পালন করতে পারবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ বায়তুল্লাহ্ শরীফের

www.pathagar.com

যিয়ারত করতে পারবে না। এরপর দশম হিজরী সনে নবী করীম (সা.) সাহাবাগণের এক বিরাট জামা'আতসহ হজ্জ পবিত্র হজ্জ আদায় করেন। এভাবে সদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ এক সংস্কারের মাধ্যমে হজ্জকে আবার ইব্‌রাহীমী রূপের দিকে ফিরিয়ে আনা হল। ফলে হজ্জ যাবতীয় জাহিলী কর্মকান্ড এবং শিরক্ ও বিদ্'আত হতে মুক্ত হয়ে তাওহীদের প্রতীক এক পবিত্র ইবাদত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

## হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল

হজ্জ একটি ফরয ইবাদত। এর ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সে ঘরের হজ্জ করা তার উপর ফরয। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখপেক্ষী নন (৩ ঃ ৯৭)।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীনকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে (২২ ঃ ২৭)।

বহু হাদীসে হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল ঃ

عَنِ ابنِ عُمرَ رَضِىَ اللّٰه عنه قَال قَالَ رسُول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بُنِىَ الاِسلَامُ على خَمسٍ شَهَادَة أن لَا إلٰه إلَّا اللّٰه و أن مُحَمدا رسُول اللّٰه و إقَام الصَّلٰوة و إيتَاءِ الزَّكٰوة و حَج البَيتِ و صَوم رَمَضَان

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর ঃ

১. আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দান, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রামাযান মাসে রোযা রাখা (বুখারী)।

অপর এক হাদীসে আছে ঃ

اعبُدوا رَبكم و صَلوا خَمسَكم صُومُوا شَهركم و حَجوا بَيت رَبكم وَ أدوا

زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রামাযানে রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাদের মালের যাকাত আদায় করবে তাহলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আল্লামা কাসানী (র.) বলেন ঃ

وَ أمَّا الإجْمَاعُ فلان الأمة اجمعت على فَرِيضته

হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজ্মা তথা ঐক্যমত সংঘটিত হয়েছে।

### হজ্জের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একাধিক হাদীসে হজ্জের ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

عن أبِى هُرَيرة رَضِى الله عنه قَال قَال رسُول الله صلى الله عليه و سلم أى الأعمَال أفضَل قَال إيمَان بالله وَ رسُوله قيل ثم مَا ذَا قَالَ جِهَاد فِى سَبِيل الله قِيلَ ثم مَاذَا قَالَ حَج مَبرُور

হযরত আবূ হুরায়ারা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সা.) কে প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হল, অতঃপর কোনটি? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, এরপর কোনটি ? উত্তর দিলেন, হজ্জে মাবরুর মাকবুল হজ্জ।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

عَن أبِى هُرَيرة رَضِى الله عنه قَال سَمِعْت النَّبى صلَّى الله عليه و سلم يَقُول مَن حَج لِلّه فلَم يَرفث و لَم يَفسق رَجَعَ كيَوم وَ لدته أمه

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং স্ত্রী সম্ভোগ ও কবীরা গুনাহ হতে বিরত রইল, সে মাতৃগর্ভ হতে সদ্য প্রসূতের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

ألعمرة إلى العُمرة كفارة لما بَينهَا و الحج المبرور لَيس لهُ جزاء إلاّ الجَنة

উমরার দ্বারা এক উমরা থেকে আর এক উমরার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। জান্নাতই হলো মাকবুল হজ্জের একমাত্র পুরস্কার (বুখারী ও মুসলিম)।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরও বলেন ঃ

مَا سبح الحاج من تسبيحة و لا هلل من تهليل و لا كبر عن تكبيرة إلا بشر بها تكبيرة

হজ্জ পালনরত অবস্থায় হাজী ব্যক্তির প্রতিটি তাসবীহ্, তাহ্লীল ও তাকবীর পাঠের জন্য বিশেষ সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে (ইসবাহানী)।

اُلحج يشفع فى اُربع مِائة اُو قَال من اُهل بُيته و يخرج عن ذُنوبه ليوم و لدته اُمه

হাজী ব্যক্তির তার পরিবার পরিজনের মধ্য হতে চারশ' ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করতে পারবেন। হাজী ব্যক্তি হজ্জ পালনের দ্বারা সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যান (বায্যার)।

**হজ্জের তাৎপর্য ও গুরুত্ব**

আল্লাহ্ তা'আলা হাকীম ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কাজই হিকমত ও রহস্য থেকে খালি নয়। প্রজ্ঞাবান আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীগণ গবেষণামূলক গ্রন্থে হজ্জের অনেক কল্যাণ ও হিকমতের কথা আলোচনা করেছেন। বস্তুত নামায, রোযা ও যাকাতের বিধান প্রবর্তনে যেমন বহু হিকমত ও রহস্য রয়েছে। এ ভাবে হজ্জের হুকুম প্রবর্তনের মধ্যে বহু হিকমত, কল্যাণ ও রহস্য নিহিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দু'টি বিষয় সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

**১. হজ্জ পরকালের সফরের এক বিশেষ নিদর্শন ঃ**

গবেষক আলিমগণ হজ্জের সফরকে আখিরাতে সফরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা মানুষ যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে যেন পরকালের সফরে বের হয়। মৃত্যুর সময় যেমন বাড়ী ঘর দোকান সকল ত্যাগ করতে হয়। অনুরূপ হজ্জের সময়ও এ জাতীয় সব কিছু ছেড়ে যেতে হয়। যানবাহনে আরোহন হাজীকে খাটিয়ায় সাওয়ার হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইহ্রামের দু'টুকরা শেত শুভ্র কাপড় হজ্জ যাত্রীর মনে কাফনের কাপড়ের কথা জাগ্রত করে দেয়। ইহ্রামের পর 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলা কিয়ামতের দিন আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়ার সমতুল্য। বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করা আরশে আযীমের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাফা ও মারওয়ার সায়ী হাশরের ময়দানে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করার সমতুল্য। সেদিন যেমন মানুষ দিশেহারা হয়ে নবীগণের নিকট দৌড়াদৌড়ি করবে অনুরূপভাবে হাজীগণ সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ে দৌড়াদৌড়ি করে থাকে। আরাফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থান হাশরের ময়দানের নমূনা বলে অনুভূত হয়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপের আশা ও ভয়ের এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয় এই ময়দানে। এক কথায় হজ্জের প্রতিটি আমল থেকেই আখিরাতের সফরের চিত্র ভেসে উঠে হাজী সাহেবের সামনে।

www.pathagar.com

**২. হজ্জ আল্লাহ্র ইশক ও মহব্বত প্রকাশ করার এক অপরূপ দৃশ্য:**

হজ্জ হল, আল্লাহ্র ইশ্ক ও মহব্বত প্রকাশ করার এক অপরূপ দৃশ্য। অর্থাৎ প্রেমাস্পদের আকর্ষণে মাতোয়ারা হয়ে প্রেমিক যেমন তার বাড়ীর দিকে ছুটে চলে তেমনি হাজীর অন্তরাত্মায় যখন ইব্রাহীম প্রেমের অনির্বান দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে তখনই সে প্রকৃত প্রেমাস্পদ মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেম পিয়াসায় মাতাল হয়ে ছুটে চলে যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। কখনো মক্কায়, কখনো মদীনায়, কখনো মিনায়, কখনো আরাফায়, কখনো মুযদালিফায় উপস্থিত হয়ে হাজী কান্নাকাটি ও গড়াগড়ি করছে মহান আল্লাহ্র দরবারে। এক দণ্ডও দাঁড়াবার সুযোগ নেই তাঁর কোথাও। এভাবে ছুটাছুটি করে উত্তপ্ত হৃদয়ের প্রশান্তি লাভের লক্ষ্যেই সে সদা সচেষ্ট। হজ্জের প্রতিটি আমলেই আমরা দেখতে পাই প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা বন্ধু-বান্ধব বাড়ী-ঘর এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া ছেড়ে দিয়ে প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া এবং তাঁরই তালাশে বন-জংগল, পাহাড়-পর্বত এবং সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পবিত্র মক্কা-মদীনার অলিতে গলিতে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করা এ একমাত্র প্রেমিকেরই কাজ।

ইহ্রাম বাঁধা প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। না আছে মাথায় টুপী না শরীরে জামা, না সুন্দর পোষাক, না আছে সুগন্ধি বরং ফকীরের বেশে পাগলের মত সদা চঞ্চল ও উদাসীন মনে সেলাইবিহীন শ্বেত শুভ্র কাপড়ে আচ্ছাদিত মুহরিমের যে কি এক অপূর্ব দৃশ্য। এলোকেশে পাগলের বেশে 'লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক' বলতে বলতে ছুটে চলছে তারা মাহবূবের দেশ পবিত্র মক্কা ও মদীনায়। 'প্রভু হে বান্দাহ্ হাযির, হাযির আমি তোমার দরবারে' এ বলে চীৎকার করে হাজী পবিত্র মক্কা মদীনায় পৌছে মনে করে আমি জান্নাতে পৌছে গেছি। কারণ বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ একটি অন্তর যখন প্রিয়তমের নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তখন তার আবেগ সমুদ্র কত যে তরঙ্গায়িত হতে থাকে তা প্রেম-পাগল মজনু ব্যতীত কারো বুঝা বড়ই দায়।

এভাবে হজ্জে আসওয়াদে চুমু খাওয়া, মুলতাযাম জড়িয়ে ধরা, কা'বার চৌকাঠে মাথা ঠুকে চীৎকার করা এবং মধু মক্ষিকার ন্যায় বায়তুল্লাহ্র চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করা সবই ইশ্কে ইলাহীর অনুপম দৃশ্য। তারপর সাফা মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করা, মিনায় যাওয়া, আরাফায় গমন, সন্ধ্যার পর মুযদালিফায় রাত কাটিয়ে সূর্যোদয়ের পর আবার মিনায় ফিরে আসা ইত্যাদি আমলসমূহে রয়েছে প্রেমের সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

প্রেম ও ভালবাসার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সময়। কেননা প্রেমিকের পাগলামী যখন চরমে পৌছে তখন প্রেমাস্পদকে লাভ করার পথে যেই বাধা হয় তাকেই সে এলোপাতাড়ি পাথর মারতে থাকে। অনুরূপ জামরাতে এসে হাজীও তাই করে থাকে। এখানে এসে আক্ল ও বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়ে যায় হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছাসের কাছে। এরপর পশু কুরবানী করে প্রেমানুরাগের শেষ মঞ্জিল অতিক্রম করে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে আসে হাজী স্বীয় মুসাফিরখানায়। তখন ত মাহবূবের দেশে ফের যাওয়ার অনির্বাণ শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে তার হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে। মোটকথা আল্লাহ্ প্রেমিক মানুষ প্রেমের অমীয় সুধা পান করার লক্ষ্যেই বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে বের হয় এবং এটাই হজ্জের প্রধানতম উদ্দেশ্য (ফাযায়েলে হজ্জ)।

www.pathagar.com

## হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হজ্জের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে তা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হল ঃ

হজ্জ এমন এক বসন্ত মৌসুম যার আগমনে নতুন প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহ্। বিভিন্ন দেশ থেকে লাখো লাখো মানুষ হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে ছুটে আসে। যারা হজ্জে গমন করে তারা তো ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত থাকেই। অধিকন্তু তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা হাজীদের বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য বাড়ী থেকে স্টেশন পর্যন্ত যায়। বিমান বন্দর পর্যন্ত যায়, আবার অভ্যর্থনা করে এবং হাজীদের থেকে হজ্জের বিস্তারিত অবস্থা শুনে এতে তাদের মধ্যেও ধর্মীয় দিক থেকে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে থাকে। এভাবে হাজীদের কাফেলা যে স্থান দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে তাদের দেখে এবং তাদের লাব্বায়িক আওয়াজ শুনে সেখানকার কত মানুষের দিল অলৌকিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং কত মানুষের নিদ্রিত আত্মায় হজ্জ করার উৎসাহ জেগে উঠে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিভিন্ন দেশ হতে আগত হজ্জ যাত্রীদের শারীরিক কাঠামো ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন কিন্তু মীকাতের নিকটে এসে তারা নিজেদের পোষাক খুলে একই পোষাক পরিধান করে। তখন তাদের মধ্যে একই আল্লাহ্র গোলামীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সকলের মুখে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ বাতাশ মুখরিত করে তুলে। লাব্বায়িক-এর উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন কিন্তু বক্তব্য একই। অতঃপর মক্কা-মদীনার পবিত্র ভূমিতে সব দেশের কাফেলা একত্রিত হয় এবং সকলে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে। ইমামও এক এবং নামায পড়ার ভাষাও এক। এইভাবে সমবেত মুসলিম জনতা ভাষা,জাতি এবং দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিরাট সুযোগ পায়।

প্রকৃতপক্ষে হজ্জের এ বিশ্ব সম্মেলন হল ঃ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই -এর বাস্তব নমুনা। ক্রমে এ চেতনা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

হজ্জের সময় বিভিন্ন দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ মক্কা ও মদীনা শরীফে সমবেত হওয়ার সুযোগে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয় আলোচনা করতে পারেন।

হজ্জের মৌসুমে আলিম-উলামা এবং হাজী ও মুবাল্লিগগণ মক্কা-মদীনায় একত্রিত হয়ে থাকেন। তাই এ সময় উম্মাহ্র সঠিক অবস্থা পর্যালোচনা করা, তাদেরকে শিরক ও বিদ'আতের অভিশাপ হতে মুক্ত করা এবং মুসলিম বিশ্বে তালীম ও তাবলীগী মিশন প্রেরণের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

হজ্জের মাধ্যমে সম্ভবত ভৌগলিক আঞ্চলিক ভাষা ও বর্ণগত বৈষম্যের সফল অবসান সম্ভব।

হজ্জ যেহেতু মুসলিম উম্মাহ্র এমন এক বিশ্বসম্মেলন যেখানে সবশ্রেণীর মানুষই এসে সমবেত হন। তাই এ-ই সময়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনের এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহ

www.pathagar.com

মিটিয়ে লড়াই ঝগড়ার পরিবর্তে ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

হজ্জের সময় বিশ্বের মুসলমানদের পারস্পরিক খোঁজ-খবর নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ আসে। তাই দরিদ্র দেশ সমূহের মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও এ সময় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

হজ্জ সম্মেলন মুসলিম উম্মাহ্র এক বৃহত্তম প্রদর্শণী। এ উৎসব সম্মেলনের মাধ্যমে উম্মাহর শান শওকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো সংহত হয়। দিকে দিকে উম্মাহ্র সুখ্যাতিও গৌরব ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও বহু কল্যাণ, উপকারিতা এবং হিকমত হজ্জের মধ্যে নিহিত রয়েছে ( ফাযায়েলে হজ্জ)।

### হজ্জ সম্পর্কিত পরিভাষা

হজ্জের মাসা'আলা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অত্র গ্রন্থে এমন কিছু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এমন কতিপয় স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝা কষ্টকর। তাই এরূপ কিছু পরিভাষা এবং স্থানের ব্যাখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

**ইহ্রাম ( إِحْرَام )** ঃ ইহ্রাম অর্থ নিষিদ্ধ করা। হাজী যখন ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়টি আদায় করার নিয়্যতে তালবিয়া পড়ে তখন তার উপর কতিপয় হালাল এবং মুবাহ্ কাজও ইহ্রামের কারণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এজন্যই একে ইহ্রাম বলা হয়। ইহ্রাম অবস্থায় হাজী যে দু'টো চাদর ব্যবহার করে একেও রূপক অর্থে ইহ্রাম বলে।

**ইস্তিলাম (إِسْتِلَام)** ঃ ইসতিলাম অর্থ হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বা হাত দ্বারা স্পর্শ করা অথবা হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীকে শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা।

**ইযতিবা (إِضْطِبَاع)** ঃ ইহ্রামের চাদর ডান বগলের নীচের দিক দিয়ে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর রেখে দেওয়াকে ইযতিবা বলা হয়।

**আফাকী (اٰفقى)** ঃ মিকাতের বাইরের লোকদেরকে আফাকী বলে। যেমন বাংলাদেশ পাকিস্তান, ভারত, ইরাক ও ইরান ইত্যাদি।

**আইয়ামে তাশরীক (اُيَام تَشْرِيق)** ঃ ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কয়দিন ফরয নামাযান্তে 'তাকবীরে তাশরীক' পাঠ করা হয় এই দিনগুলোকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

**আইয়ামে নহ্র (اُيَام نَحر)** ঃ ১০ই যিলহজ্জ হতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত এই তিন দিনকে 'আইয়ামে নহর' বলা হয়।

www.pathagar.com

**ইফরাদ (إِفْرَاد)** ঃ ইফরাদ অর্থ শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধা এবং শুধু হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করা।

**ইশ্‌'আর (إِشْعَار)** ঃ ইশ'আর অর্থ কুরবানীর পশুর পরিচয়ের জন্য পশুর কাঁধের ডান পার্শ্বে এমন হাল্‌কা যখম করে দেওয়া যাতে শুধু চামড়া কাটবে কিন্তু গোশ্‌ত অক্ষত থাকবে।

**বায়তুল্লাহ্ (بَيت الله)** ঃ অর্থাৎ কা'বা শরীফ। ইহা মক্কা মু'আয্‌যমায় মসজিদে হারামের মধ্যখানে অবস্থিত। একটি মহা পবিত্র ঘর এবং দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদতখানা। বায়তুল্লাহ্ শরীফ মুসলমানদের কিব্‌লা এবং অত্যন্ত বরকতময় ও পবিত্রময় স্থান।

**বত্‌নে উরানা ( بطن عُرنة )** ঃ ইহা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি ময়দান। হজ্জের সময় এখানে অবস্থান দুরাস্ত নয়। কেননা এ স্থানটি আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থিত।

**তাজলীল (تجلِيل)** ঃ কুরবানীর পশুকে কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করা।

**তাসবীহ্ (تَسبِيح)** ঃ অর্থ 'সুবহানাল্লাহ্' বলা।

**তাকলীদ (تَقلِيد)** ঃ জুতা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদির নির্মিত রশি দ্বারা হারের মত বানিয়ে তা কুরবানীর পশুর গলায় পরানো।

**তাকবীর (تَكبِير)** ঃ 'আল্লাহু আকবার' বলা।

**তামাত্তু (تمتع)** ঃ হজ্জের মাস সমূহে প্রথমে উমরা পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং এরপর ঐ সময়ের মধ্যে হজ্জের জন্য পুনরায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ আদায় করা।

**তালবিয়া (تلبِيه)** ঃ لَبَّيكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيكَ لَبَّيكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ إِنَّ الحَمدَ وَ النِّعمَةَ لَكَ وَ المُلكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ - পাঠ করা।

**তহলীল (تَهلِيل)** ঃ 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করা।

**জমরাত ( جمرَات )** ঃ মিনায় তিনটি স্থানে উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রয়েছে। সেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এগুলোর মধ্যে মসজিদ খায়ফের নিকটবর্তী পূর্বদিকে অবস্থিত জমরাকে 'জমরায়ে উলা' বলা হয়। এর পরবর্তীটি যা মধ্যস্থানে অবস্থিত একে 'জমরায়ে উস্‌তা' বলে। এর পরেরটিকে 'জমরাতুল কুব্‌র জমরায়ে আকাবা অথবা জমরাতুল উখ্‌রা বলে।

www.pathagar.com

**জুহ্ফা (جُحفه)** ঃ মক্কা হতে তিন মঞ্জিল দূরে রাবিগ নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত। উহা সিরিয়াবাসী এবং ঐ পথে মক্কা শরীফ আগমনকারী লোকদের মীকাত।

**জান্নাতুল মু'আল্লা ( جَنة المُعلى )** ঃ এটা মক্কা শরীফের একটি কবরস্থান। উম্মাহাতুল মু'মিনীন খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা.)-এর কবর এই কবরস্থানে।

**জাবালে সাবীর (جَبل ثَبير)** ঃ মিনার একটি পাহাড়ের নাম।

**জাবালে আবূ কুবায়স (جَبل اُبى قُبيس)** ঃ ইহা বায়তুল্লাহ্ শরীফের সামনে অবস্থিত। কারো কারো মতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ পাহাড়টিই সৃষ্টি করেছেন।

**জাবালে রহমত (جَبل رَحمَت)** ঃ আরাফাতের একটি পবিত্র পাহাড়ের নাম।

**জাবালে কুযাহ (جَبل قزح)** ঃ মুযদালিফার একটি পাহাড়।

**হজরে আসওয়াদ ( حَجر اَسوَد )** ঃ কালো পাথর। এটি জান্নাতের একটি পাথর। জান্নাত থেকে আনার সময় তা দুধের মত সাধা ছিল। কিন্তু আদম সন্তানের গুনাহ একে কালো বানিয়ে ফেলেছে। ইহা বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব দক্ষিণ কোণের দেওয়ালে এক মানুষের সিনা বরাবর উঁচুতে স্থাপিত আছে। আর চারপাশে রূপার বৃত্ত লাগানো আছে।

**হরম (حَرم)** ঃ মক্কা মুকাররমার চারদিকে নির্দিষ্ট ভূমিকে 'হরম' বলে। এর চতুর্দিকের সীমানায় বিশেষ চিহ্ন স্থাপিত আছে। হরমের সীমানার ভিতর কোন প্রাণী শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা এবং পশুকে ঘাস খাওয়ানো সবই হারাম।

**হরমী (حَرمِى)** ঃ ঐ ব্যক্তি যিনি হরমের সীমানার মধ্যে বসবাস করেন।

**হিল (حِل)** ঃ হরমের সীমানার বাইরে কিন্তু মীকাতের অভ্যন্তরে যে ভূমি রয়েছে একে 'হিল' বলে। হরমের অভ্যন্তরে যে কাজ নিষিদ্ধ এখানে তা বৈধ।

**হলক (حَلق)** ঃ মাথা মুড়ান।

**হাতীম ( حَطيم )** ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর দিকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত কিছু জায়গা। একে হাতীম, হিজর এবং খাতীরাও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কুরায়শগণ যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ পুনঃনির্মাণ ইচ্ছা করলেন তখন তারা সবাই একমত হয়ে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কেবল হালাল টাকা এ কাজে ব্যয় করা হবে। কিন্তু টাকা পয়সা তাদের হাতে কম ছিল। এ কারণে উত্তর দিকে

www.pathagar.com

সাবেক বায়তুল্লাহ্ হতে কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ-ই ছেড়ে দেওয়া অংশকেই হাতীম বলা হয়। শরয়ী পরিমাণ অনুসারে আসল হাতীম ছয় হাতের মত জায়গা। বর্তমানে আরো কিছু বেশী জায়গা জুড়ে বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে।

দম (دَم) ঃ হজ্জ সম্পর্কিত ব্যাপারে উট,বকরী, দুম্বা ইত্যাদি পশু যবেহ্ করাকে দম বলে। দম দুই প্রকার ঃ দমে জেনায়েত ও দমে শোকর।

দমে শোকর (دَم شُكر) ঃ তামাত্তো ও কিরাণ হজ্জ আদায়কারীকে যে দম আদায় করতে হয় তাকে 'দমে শোকর' বলে।

দমে জেনায়েত (دَم جِنَايت) ঃ ইহ্রাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে উট, বকরী দুম্বা ইত্যাদি যবাহ্ করাকে 'দমে জেনায়েত' বলে।

যুল-হুলায়ফা ( ذُوالحُليفة) ঃ মদীনা মুনাওওয়ারা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এটি মদীনাবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারী লোকদের মীকাত। একে 'বীরে আলী'ও বলা হয়।

যাতু-ইরক (ذَات عِرق) ঃ এ স্থানটি মক্কা শরীফ হতে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত। ইরাকবাসী এবং ঐ মক্কা আগমনকারী লোকদের মীকাত।

রুকনে ইয়ামনী ( رُكن يمانى ) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ। যেহেতু এটি ইয়ামনের দিকে অবস্থিত তাই একে 'রুকনে ইয়ামনী' বলা হয়।

রুকনে ইরাকী ( رُكن عِرَاقى ) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণ যা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

রুকনে শামী ( رُكن شَامى ) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোন যা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।

রমল ( رَمل ) ঃ তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে, কাঁধ দুলিয়ে ছোট পদক্ষেপে দ্রুত চলা।

রমী (رَمى) ঃ কংকর নিক্ষেপ করা।

যমযম (زَمزَم) ঃ মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম। বর্তমানে তা কূপের আকারে আছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং বিবি হাজেরার জন্য প্রবাহিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

**সায়ী (سَعْى)** ঃ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌড়ান।

**শাওত (شَوط)** ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করা।

**সাফা (صَفا)** ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছোট একটি পাহাড়। এখান থেকেই সাঈ আরম্ভ করতে হয়।

**তাওয়াফ (طَواف)** ঃ বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিক সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

**আরাফাত (عرفَات)** ঃ মক্কা শরীফ হতে প্রায় নয় মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি বিরাট ময়দান। ৯ই যিলহজ্জ হাজীরা এখানে উকূফ বা অবস্থান করে থাকেন।

**কিরান (قِرَان)** ঃ হজ্জ এবং উমরা উভয়ের জন্য এক সাথে ইহ্রাম বেঁধে প্রথমে উমরা এবং পরে হজ্জ আদায় করা।

**কারিন (قَارِن)** ঃ ঐ হাজী সাহেবান যিনি কিরান হজ্জ করেন।

**কারন (قَرن)** ঃ মক্কা শরীফ হতে প্রায় বিয়াল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়। এ স্থানটি নজদে ইয়ামন ও নজদে হিজায এবং নজদে তিহামা অঞ্চল হতে পবিত্র মক্কা আগমনকারী লোকদের মীকাত।

**কস্‌র (قَصر)** ঃ চুল ছাটা বা ছোট করা।

**মুহ্‌রিম (مُحرم)** ঃ যিনি ইহ্‌রাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তি।

**মুফরিদ (مُفرد)** ঃ শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যে যিনি ইহ্‌রাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তি।

**মীকাত (مِيقَات)** ঃ মক্কা শরীফ আগমনকারী ব্যক্তির যে স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব ঐ স্থানকে মীকাত বলে।

**মীকাতী (مِيقَاتى)** ঃ যারা মীকাতে অভ্যন্তরে বসবাস করেন এমন লোক।

**গারে হেরা (غَار حِراء)** ঃ জাবালে নূরের একটি গুহা। জাবালে নূর মক্কা মুকাররমা হতে মিনায় যাওয়ার পথে বাম দিকে অবস্থিত। এ গুহায় নবী করীম (সা.) নবূওয়াত লাভের পূর্বে ধ্যান মগ্ন থাকতেন। এখানেই সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়।

**গারে সাওর (غَار ثُور)** ঃ ইহা মক্কা মুকাররমা হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি পর্বতগুহা। হিজরতের সময় নবী করীম (সা.) এবং হযরত আবূ বকর (রা.) এখানেই তিনরাত অবস্থান করেছিলেন। গুহাটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এর উচ্চতা প্রায় দেড় মাইল।

www.pathagar.com

**মীযাবে রহমত (ميزاب رحمت)** ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের ছাদে একটি নল লাগোনো আছে। বৃষ্টি হলে এখান দিয়ে ছাদের পানি নীচে গড়িয়ে পড়ে। এতে বহু বরকত রয়েছে। এ স্থানটি হাতীমের উপরে অবস্থিত।

**মাতাফ (مطاف)** ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকস্থ তাওয়াফ করার স্থান। এ স্থানে মরমর পাথর বাঁধানো রয়েছে।

**মাকামে ইব্রাহীম (مقام إبراهيم)** ঃ একটি জান্নাতী পাথরের নাম। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর দাঁড়িয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। ইহা মাতাফের পূর্ব পার্শ্বে মিম্বর এবং যমযমের মধ্যবর্তী স্থানে একটি জালি বিশিষ্ট গম্বুজের মধ্যে সংরক্ষিত।

**মুলতাযাম (ملتزم)** ঃ হজরে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেওয়াল। একে জড়িয়ে ধরে দু'আ করা সুন্নাত।

**মিনা (منى)** ঃ মক্কা মুআয্যমা হতে তিন মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি শহর। এখানেই কুরবানী করা হয় এবং কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এ স্থানটি হরমের সীমানার অন্তর্ভূক্ত।

**মসজিদে খায়ফ (مسجد خيف)** ঃ মিনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। ইহা মিনার উত্তর দিকে যাব পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

**মসজিদে নামিরা (مسجد نمرة)** ঃ আরাফাত ময়দানের একটি বড় মসজিদ। এ মসজিদ থেকেই ইমামুল হাজ্জ খুত্বা দেন।

**মসজিদে মাস'আরুল হারাম (مسجد مشعر الحرام)** ঃ মুযাদালিফায় অবস্থিত একটি মসজিদ।

**মসজিদে আয়েশা (مسجد عائشة)** ঃ মসজিদে হারাম হতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে হরম সীমার বাইরে তানঈম নামক স্থানে অবস্থিত। উমরা পালনকারীগণ এখানে এসে সাধারণত উমরার ইহ্রাম বেঁধে থাকেন।

**মসজিদে কু'বা (مسجد قباء)** ঃ ইহা মদীনা শরীফে নির্মিত প্রথম মসজিদ। মসজিদে নব্বী থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

**মসজিদে কিব্লাতাইন (مسجد قبلتين)** ঃ ইহা মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর পশ্চিমে আকীপ উপত্যকার নিকটবর্তী একটি টিলার উপর অবস্থিত। কিব্লা পরিবর্তনের ঘটনাটি এ মসজিদে সংঘটিত হওয়ায় একে 'মসজিদে কিব্লাতাইন' (দুই কিব্লার মসজিদ) বলা হয়।

www.pathagar.com

**মুয্‌দালিফা (مُزْدَلِفَة)** ঃ মিনা ও আরাফাতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ময়দান। মিনা হতে তিন মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত। ৯ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাতে হাজীগণের এ ময়দানে অবস্থান করতে হয়।

**মুহাস্‌সার (مُحَسِّر)** ঃ মুযদালিফা সংলগ্ন একটি জায়গা। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় দৌড়িয়ে পথ অতিক্রম করতে হয়। এখানেই আল্লাহ্ তা'আলা আসাহাবে ফীলের উপর আযাব অবতীর্ণ করেছিলেন।

**মারওয়া (مَرْوَة)** ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব উত্তর কোণের নিকটে ছোট একটি পাহাড়। এখানে পৌছে সায়ী সমাপ্ত হয়।

**মীলাইনে আখ্‌যারাইন (مِيلَيْن أَخْضَرَيْن)** ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে নিদিষ্ট একটি স্থান। সাঈকারীদের এ স্থানটি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করতে হয়। স্থানটির দুই পার্শ্বের দেয়ালে সবুজ বাতিদ্বারা চিহ্নিত করা আছে।

**মক্কী (مَكِّى)** ঃ পবিত্র মক্কার অধিবাসী।

**মাদানী (مَدَنِى)** ঃ পবিত্র মদীনার অধিবাসী।

**মাওফিক (مَوْقِف)** ঃ অর্থ হজ্জের আহকাম পালন করার সময় উকূফ বা অবস্থান করার জায়গা। এর দ্বারা আরাফা এবং মুযদালিফা অবস্থানের জায়গাকে বুঝানো হয়ে থাকে।

**উকূফ (وُقُوف)** ঃ থামা বা অবস্থান করা। হজ্জের আহ্‌কাম পালনের ক্ষেত্রে 'উকূফ' মানে আরফা এবং মুযদালিফার বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে অবস্থান করা।

**হাদী (هَدى)** ঃ হাজী সাহেবগণ কুরবানী করার জন্য যে পশু সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলে।

**ইয়াওমুত্ তারবিয়া (يَوم التَّرْبِيَة)** ঃ ৮ই যিলহাজ্জ।

**ইয়াওমুল আরাফা (يَوم العَرَفَة)** ঃ ৯ই যিলহাজ্জ যেদিন হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। এবং হাজী সাহেবগণ আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন।

**ইয়ালামলাম (يَلَمْلَم)** ঃ পবিত্র মক্কা হতে দক্ষিণ দিকে দুই মনযিল দূরে ইয়ামনে অবস্থিত একটি পাহাড়। ইদানিং একে সা'দিয়াও বলা হয়। ইয়ামানবাসী বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হতে আগত হাজীদের মীকাত।

www.pathagar.com

## হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি ঃ

১. মুসলমান হওয়া,

২. জ্ঞানবান হওয়া,

৩. বালিগ হওয়া,

৪. আযাদ হওয়া,

৫. আর্থিক দিক থেকে হজ্জ পালনে সক্ষম হওয়া,

৬. হজ্জ ফরয হওয়ার ইল্ম থাকা,

৭. হজ্জের সময় হওয়া (শামী, ২য় খণ্ড)।

১. হজ্জ ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত মুসলমান হওয়া। কাফিরের উপর হজ্জ ফরয নয়। হজ্জ করার পর কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং পরে পুনরায় মুসলমান হয় তবে সে অবস্থায় সে হজ্জ করতে সক্ষম হলে পুনরায় হজ্জ করা তার উপর ওয়াজিব।

২. জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়। সুতরাং পাগলের উপর হজ্জ ফরয নয়। অর্ধ উন্মাদ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয কিনা এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৩. হজ্জ ফরয হওয়ার তৃতীয় শর্ত বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। নাবালিগের উপর হজ্জ ফরয নয়। কোন নাবালিগ যদি বালিগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ করে তবে এতে তার ফরয হজ্জ আদায়ে হবে না। হজ্জ নফল হিসাবে গন্য হবে। কোন নাবালিগ যদি ইহরাম বাঁধার পর আরাফায় অবস্থানের আগে বালিগ হয় এবং সে যদি ঐ ইহ্রামের দ্বারাই হজ্জ সম্পন্ন করে তবে তার সে হজ্জ নফল হজ্জ হিসাবে গণ্য হবে। তবে বালিগ হওয়ার পর যদি নতুন করে লাব্বায়িক পড়ে এবং নতুন করে ইহ্রাম বেঁধে নেয় এরপর আরাফায় অবস্থান করে তবে সমস্ত ইমামের মতে এ হজ্জ ফরয হজ্জ হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে কোন পাগল যদি সুস্থ হয় তবে সে পুনরায় ইহ্রাম বাঁধবে। যদি কোন বালক ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে চলে যায় এরপর মক্কায় তার স্বপ্ন দোষ হয় তবে এখানেই ইহ্রাম বেঁধে সে যদি হজ্জের আহ্কাম সমূহ আদায় করে তবে তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করাতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৪. হজ্জ আদায়ের অন্যতম শর্ত হল, আযাদ হওয়া। সুতরাং গোলাম বা ক্রীতদাসের উপর হজ্জ ফরয নয়। এমনকি মক্কাতে থাকলেও গোলামের উপর হজ্জ ফরয হয় না। কেননা গোলাম হল অন্যের মালিকানাধীন ব্যক্তি। গোলাম যদি আযাদ হওয়ার পূর্বে মনীবের সাথে হজ্জ করে তবে তার সে হজ্জ নফল হজ্জ হিসাবে গণ্য হবে। আযাদ হওয়ার পর পুনরায় ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। যদি পথে ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে আযাদ হয় এবং পরে ইহ্রাম বেঁধে। হজ্জ আদায়ে করে তাহলে ফরয হজ্জ আদায় হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৫. যারা পবিত্র মক্কা বা এর আশে-পাশে বসবাস করেনা তাদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য

www.pathagar.com

সক্ষমতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাওয়ারী এবং এ পরিমাণ টাকা পয়সা থাকা শর্ত যদ্দারা মক্কা শরীফ যাওয়া এবং পুনরায় বাড়ী ফিরে আসা সম্ভব । সফরের জন্য যে সাওয়ারী এবং টাকা পয়সার কথা বলা হয়েছে তা নিম্ন বর্ণিত প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত হতে হবে। যেমন- বসবাসের বাড়ী, পরিধানের কাপড়, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, হজ্জ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার পরিজন এবং চাকর-বাকরদের যাবতীয় খরচপত্র, ঋণ, সাওয়ারী, বাসস্থান মেরামত করার খরচ পত্র এবং স্বীয় পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

আবশ্যকীয় মালামাল বলতে ব্যবসায়ীর জন্য এই পরিমাণ বাণিজ্য পণ্য যদ্দারা সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কৃষকের জন্য কৃষির বলদ ও অন্যান্য উপকরণাদি এবং আলিমের জন্য প্রয়োজনীয় কিতাবাদি বুঝানো হয়েছে। এই আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ হতে অতিরিক্ত সম্পদ থাকা হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। পেশাজীবি ব্যক্তিদের বেলায় পেশার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তার আবশ্যকীয় মালামালের মধ্যে গণ্য হবে। হজ্জের জন্য মাল সামান বলতে সেই মাল সামানকে বুঝানো হয়ে থাকে যা হালাল উপায়ে অর্জিত এবং নিজে এর নিরঙ্কুশ মালিক। ঋণ নিয়ে এ পরিমাণ সম্পদের মালিকানা হলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। সাওয়ারীর মালিক হওয়া আবশ্যক নয়। ভাড়া করা সাওয়ারী বা যানবাহন পাওয়া গেলেও হজ্জ ফরয হবে।

মক্কার অধিবাসী এবং যেসব লোক মক্কার আশেপাশে বসবাস করে তারা যদি পদব্রজে সফর করতে সক্ষম হয় তবে তাদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সাওয়ারী বা যানবাহন শর্ত নয়। কিন্তু তারা যদি পদব্রজে সফর করতে অক্ষম হয় তবে বাইরের লোকদের ন্যায় তাদের জন্য ও যানবাহন এবং সাওয়ারী শর্ত। প্রয়েজনীয় পাথেয় থাকা মক্কার অধিবাসীদের জন্যও শর্ত। যদি বাইরের কোন দরিদ্র লোক কোনক্রমে মীকাত পর্যন্ত পৌছে যায় এবং বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পদব্রজে সফর করতে সক্ষম হয় তবে তার জন্যও মক্কাবাসীর মত সাওয়ারী শর্ত নয়। শুধু বাহন খরচ বা পাথেয় থাকা শর্ত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

পাথেয় বলতে মধ্যম ধরণের পাথেয়কে বুঝানো হয়েছে। যদি কোন লোক কাউকে হজ্জের জন্য টাকা পয়সা দান করে তবে তা কবুল করা না করা তার ইখ্তিয়ার। দাতা অপরিচিত কোন ব্যক্তি হোক বা আপন আত্মীয়-স্বজন হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কেউ যদি হজ্জ আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় খরচের অর্থ কাউকে দান করে এবং সে তা কবুল করে নেয় তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। যদি কারো নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ী অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব পত্র থাকে অথবা যদি কোন আলিমের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিতাবাদি থাকে অথবা কারো নিকট যদি এমন ভূমি বা বাগ-বাগিচা থাকে যার আমদানীর প্রতি সে মুখাপেক্ষী নয়। এরূপ সম্পদ বিক্রি করে যদি হজ্জ সমাপন করার পাথেয় সংগ্রহ হয়ে যায় তবে তা বিক্রি করে হজ্জ করা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হজ্জ করতে পারে এ পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর কেউ যদি বিয়ে করার ইচ্ছা করে তবে সে প্রথমে সে হজ্জ আদায় করে নিবে। কেননা হজ্জ এমন একটি ফরয যা আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দার উপর অপরিহার্য করে দিয়েছেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

যদি কারো এমন ঘর থাকে যে ঘরে সে বসবাস করে না এবং এমন গোলাম থাকে যার থেকে সে খিদমত গ্রহণ করে না তবে তার উপর ওয়াজিব হল এগুলো বিক্রি করে হজ্জ করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কারো নিকট যদি অব্যবহৃত কাপড় থাকে এবং তা বিক্রি করে যদি হজ্জ করা সম্ভব হয় তবে এ কাপড় বিক্রি করে হজ্জ করা তার উপর ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কারো এমন বড় ঘর থাকে যার একাংশ তার বসবাসের জন্য যথেষ্ট এবং বাকী অংশ বিক্রি করে সে হজ্জ করতে পারে তবে হজ্জ করার জন্য অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা তার উপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে কারো যদি বসবাসের জন্য এমন বড় ঘর থকে যা বিক্রি করে ছোট একখানা ঘর করা যায় এবং অতিরিক্ত টাকা দিয়ে হজ্জ ও করা যায় তবে এ ক্ষেত্রে বড় ঘরটি বিক্রি করে হজ্জ করা তার জন্য আবশ্যক নয়। যদি বিক্রি করে হজ্জ আদায় করে তবে তা উত্তম হবে। হজ্জের জন্য বসবাসের বাড়ী বিক্রি করে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করা আবশ্যক নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কারো নিকট এ পরিমাণ শস্য থাকে যা তার সারা বছরের জন্য যথেষ্ট। তবে তা বিক্রি করে হজ্জ পালন করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি এক বছরের খোরাকীর চেয়েও অতিরিক্ত শস্য থাকে এবং তা বিক্রি করে হজ্জ আদায় করা সম্ভব হয় তবে এগুলো বিক্রি করে হজ্জ করা ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ব্যবসায়ী ব্যক্তি যদি ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তবে সে যদি এ পরিমাণ মালের মালিক হয় যে, হজ্জের যাবতীয় খরচ বহন করতে পারে এবং ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের এবং পরিবার পরিজনের পূর্ণ ব্যয়ও বহন করতে পারে। আর এ কারণে তার মূলধনে কোন লোকসান না হয় তাহলে হজ্জ করা তার উপর ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না।

হজ্জে গমন ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি এ পরিমাণ ভূমির মালিক হয় যে, এর থেকে সামান্য বিক্রি করলে তার আসা যাওয়ার খরচ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত তার নিজের ও পরিবারের যাবতীয় খরচ হয়ে যবে। আর যে পরিমাণ ভূমি থাকবে তাতে সে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। অন্যথায় তার উপর হজ্জ ফরয হবে না।

যদি কোন কৃষক এ পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় যে যাতায়াত খরচ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের ও পরিবারের খরচ বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতি তথা গরু বাছুর ইত্যাদি তার নিকট থেকে যায় তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে অন্যথায় ফরয হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সরকারী ট্যাক্স, মু'আল্লিমের ফী এবং আনুসাংগিক প্রয়োজনীয় দেয় যা হাজীকে অবশ্যই আদায় করতে হয় সবকিছুই পাথেয় এবং রাহখরচের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। উপহার সামগ্রী এবং তবাররুক ক্রয় বাবদ যে টাকা ব্যয় হবে তা রাহখরচের মধ্যে গণ্য হবেনা। অনুরূপ মদীনা শরীফ সফরের খরচও রাহখরচের মধ্যে গণ্য হবে না।

মদীনা শরীফ যাওয়ার টাকা না থাকার অজুহাতে হজ্জ থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়। তবে যার সমর্থ আছে তার জন্য হজ্জের সফরে মদীনা শরীফ যিয়ারত করা অবশ্য কর্তব্য।

কোন ব্যক্তি প্রচুর সম্পদের মালিক ছিল এবং তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল। কিন্তু

www.pathagar.com

গড়িমসি করে সে হজ্জ আদায় করেনি। পরে নিঃস্ব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তর যিম্মায় হজ্জ বাকী থেকে যাবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ আদায় করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। হারাম মাল দ্বারা হজ্জ করা হারাম। কেউ যদি এ ধরণের টাকা দ্বারা হজ্জ করে নেয় তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তা কবুল হবে না। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন ব্যক্তির উপার্জিত মাল হালাল হওয়া সম্পর্কে যদি সন্দেহ হয় তবে সে ঋণ নিয়ে হজ্জ করবে এবং উক্ত মাল দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৬. হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য এর ইল্‌ম থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে বসবাস করে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে দারুল ইসলামে বসবাস করছে। এরূপ ব্যক্তি হজ্জ ফরয হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকুক অথবা না থাকুক উভয় অবস্থাতেই তার উপর হজ্জ ফরয হবে। এ ক্ষেত্রে জন্মগত মুসলমান এবং পরে মুসলমান হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরে মুসলমান হয়েছে এরূপ ব্যক্তিকেও জানে বলে ধরে নেয়া হবে। যদি দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অথবা এক জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দারুল হরবে অবস্থানকারী কোন মুসলমানকে হজ্জের যিয়ারত সম্বন্ধে অবহিত করে তবে তার উপরও হজ্জ ফরয হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সংবাদদাতার ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ বালিগ এবং আযাদ হওয়া আবশ্যক নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

৭. হজ্জ ফরয হওয়ার আরেকটি শর্ত হল হজ্জের সময় হওয়া। হজ্জের মাস হল, শাওয়াল যিলক্বদ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। হজ্জের সময় আগেই যদি কারো মধ্যে হজ্জের শর্তাবলী পাওয়া যায় তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। সুতরাং কেউ যদি হজ্জের মৌসুম আসার পূর্বে যাবতীয় টাকা কোন কাজে খরচ করে ফেলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। কিন্তু টাকা না থাকলে আর হজ্জ করতে হবে না। এ মনোভাব নিয়ে টাকা পয়সা খরচ করে ফেলা মাকরূহ (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হজ্জ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

যে সব শর্ত পাওয়া গেলে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হয় তা পাঁচটি ঃ

১. শারীরিক সুস্থতা,

২. রাস্তাঘাট নিরাপদ হওয়া,

৩. কারাবন্দী না হওয়া। (এই তিনটি শর্ত পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান)।

৪. মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা অন্য কোন মাহ্‌রাম সংগে থাকা,

৫. মহিলাদের ইদ্দত পালনের অবস্থা হতে মুক্ত হওয়া। শেষোক্ত দু'টি শর্ত শুধু মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য (শামী, ২য় খণ্ড)।

এগুলো এমন ধরণের শর্ত যে তা পাওয়া যাওয়ার উপরই হজ্জ আদায় ওয়াজিব হয়। যদি হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত এবং আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত একই সাথে পাওয়া যায় তবে

www.pathagar.com

নিজেকেই হজ্জ করতে হবে। কিন্তু যদি ফরয হওয়ার শর্তাবলী পুরাপুরি পাওয়া যায় আর আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তবলী থেকে কোন একটি না পাওয়া যায় তবে এ অবস্থায় নিজে গিয়ে হজ্জ করা ওয়াজিব হবে না। বরং নিজের পক্ষ হতে অন্য কারো মাধ্যমে হজ্জ করিয়ে নেয়া অথবা হজ্জ করানোর অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও পীড়িত অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্থ অথবা খোঁড়া বা অন্ধ অথবা নিজে সফর করতে অক্ষম, কিন্তু হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত তার মধ্যে বিদ্যমান এমন ব্যক্তির উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। তাঁদের মতে এ ধরণের লোক যদি নিজে হজ্জ করতে না পারেন তার উপর বদলী হজ্জ করানো অথবা হজ্জের অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। আর নিজে হজ্জ সমাপন করে নেয় তবে তাতেও হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন কোন আলিমের মতে এ ধরণের লোকের উপর হজ্জ ওয়াজিব নয় এবং বদলী হজ্জ করানো অথবা এর অসিয়্যত করে যাওয়াও ওয়াজিব নয়।

উপরোক্ত মতবিরোধ তখনই প্রয়োজ্য হবে যদি কোন মানুষ দৈহিকভাবে অক্ষম হওয়ার পর হজ্জ করার মত আর্থিক সামর্থ অর্জন করে। কিন্তু যদি সুস্থ্ থাকা অবস্থায় কারো উপর হজ্জ ফরয হয় এবং পরে অসুস্থ বা অপরাগ হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতভাবে তার উপর হজ্জ করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় সে স্বয়ং হজ্জ করতে অপরাগ হলে অন্য কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করাবে অথবা অসিয়্যত করে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

মাযূর অবস্থায় কেউ যদি অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করায় তবে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, রাস্তাঘাট নিরাপদ হওয়া। ফকীহ্ আবুল লায়স (র.) -এর মতে রাস্তা যদি সাধারণত নিরাপদ থাকে তবে হজ্জ ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকে কিন্তু রাস্তাঘাট নিরাপদ না হয় যেমন কোন যালিমের অত্যাচারের ভয়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয় ইত্যাদি বিরাজমান থাকে তবে এ অবস্থায় হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যদি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাস্তাঘাট নিরাপদ না হয় তবে বদলী হজ্জের অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। যদি অধিকাংশ কাফেলা নিরাপদে পৌছে যায় এবং ঘটনাক্রমে দু' একটি কাফেলা লুণ্ঠিত হয় তবে পথঘাট নিরাপদ আছে বলে গণ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ কারাবন্দী থাকে অথবা শাসনকর্তা যদি কাউকে হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে বাধা প্রদান করে তবে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। এরূপ অবস্থায় যদি শেষ জীবন পর্যন্ত হজ্জে গমনের কোন সুযোগ না পাওয়া যায় তবে মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ্জ করানোর অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। যদি কারো নিকট লোকের ধনসম্পদ পাওনা থাকে এবং এ জন্য তার জেল হয়ে যায় আর সে ব্যক্তি আর্থিকভাবে এমন স্বচ্ছল হয় যে তার উপর হজ্জ করা ওয়াজিব এবং লোকের হক আদায় করতেও সে সক্ষম তবে এ অবস্থা ওযর হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবেনা। বরং হজ্জ করা তার প্রতি ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

www.pathagar.com

আবাসস্থল থেকে মক্কা শরীফ যদি তিন দিনের দূরত্বের পথ হয় তবে হজ্জ সফরে মহিলাদের সাথে স্বামী বা কোন মাহরম পুরুষ থাকা ফরয। যুবতী কিংবা বৃদ্ধ সবার ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য । যদি তিন দিনের কম দূরত্বের পথ হয় তবে মহিলারা মাহ্‌রাম ব্যতীত ও হজ্জ করতে পারবে। স্বামী অথবা ঐ লোক যার সাথে আত্মীয়তা ও দুগ্ধ সম্পর্ক অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে কখনও বিবাহ শাদী জায়িয হয় না এমন ব্যক্তিকে মাহ্‌রাম বলে। মাহ্‌রাম আমানতদার এবং বালিগ হওয়া শর্ত। মাহ্‌রাম ব্যক্তি আযাদ হওয়া শর্ত নয়। গোলাম ও মাহ্‌রাম হতে পারবে।

কোন বালক যদি বুদ্ধিমান হয় এবং বালিগ হওয়ার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যায় তবে সে বালিগের মতই বিবেচিত হবে। এবং তার সাথে হজ্জ করা জায়িয হবে। স্বীয় গোলাম মহিলার জন্য মাহ্‌রাম হিসাবে বিবেচিত হবে না। বালকের স্বপ্নদোষ না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মাহ্‌রাম হতে পারবে না।

হজ্জ যাত্রী মহিলা নিজের মাল হতে সাথী মাহ্‌রাম পুরুষের ব্যয়ভার বহন করবে। যাতে সেও তার সাথে হজ্জ করতে পারে। মাহ্‌রাম পাওয়া গেলে মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী অনুমতি না দিলেও হজ্জে যাওয়া জায়িয হবে। নফল হজ্জ হলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া হজ্জের সফরে বের হতে পারবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন মহিলার স্বামী না থাকে অথবা স্বামী থাকলেও সে যদি স্ত্রীর সাথে হজ্জে যেতে রাজী না হয়, এমনিভাবে তার যদি কোন মাহ্‌রাম ব্যক্তিও না থাকে অথবা মাহ্‌রাম পুরুষ আছে কিন্তু ঐ মহিলার সাথে হজ্জে যেতে রাজী না হয় তবে উক্ত মহিলার উপর হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। জীবনের শেষ পর্যায়েও যদি এ মহিলা হজ্জ করতে না পারে তবে কারো দ্বারা বদলী হজ্জ আদায় করার অসিয়্যত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। যদি কোন মহিলা স্বামী অথবা মাহ্‌রাম ছাড়াই হজ্জ করে তবে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সে গুনাহ্‌গার হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

কোন মহিলা তার মাহ্‌রাম ও স্বামীকে তার সঙ্গে হজ্জে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে না। মাহ্‌রামদের জন্যও তখনই মহিলাদের সাথে হজ্জে গমন করা জায়িয হবে যদি তারা ফিত্‌না এবং কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশংকা হতে মুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার মনে এ সন্দেহ প্রবল হয় যে, সফরের সময় একান্ত নিরিবিলি পরিস্থিতিতে অথবা কোন কার্য উপলক্ষে স্পর্শ লাগার কারণে কামভাব জাগ্রত হয়ে যেতে পারে তাহলে উক্ত মাহ্‌রমের জন্য মহিলার সঙ্গে হজ্জে যাওয়া জায়িয হবে না। নপংসুক মহিলার সাথেও মাহ্‌রাম থাকা শর্ত। যদি কোন মহিলার সাথে তার স্বামী না থাকে বরং অন্য কোন মাহ্‌রাম থাকে এবং তাকে সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানোর প্রয়োজন থাকে এ অবস্থায় যদি নিজের অথবা মহিলার পক্ষ হতে কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশংকা থাকে তবে যতটুকু সম্ভব এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। যদি কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় এবং সঙ্গে যাওয়া জন্য মাহ্‌রাম ও পাওয়া যায় তবে স্বামী তাকে ফরয হজ্জ হতে বিরত রাখতে পারবে না। যদি মাহ্‌রাম না পাওয়া যায় অথবা নফল হজ্জ হয় তবে স্বামী ইচ্ছা করলে বাধা প্রদান করতে পারবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি কোন মহিলা হজ্জের মানত করে তবে মানত শুদ্ধ হবে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি ব্যতীত

www.pathagar.com

হজ্জে গমন করতে পারবে না। যদি জীবদ্দশায় হজ্জ সমাপন করতে না পারে তবে মৃত্যুর পর বদলী হজ্জ আদায় করানো অসিয়্যত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। যদি কোন মহিলা পায়ে হেঁটে হজ্জ করতে চায় তবে তার অভিভাবক অথবা স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে। কোন মহিলা যদি হজ্জের নির্ধারিত মাসের পূর্বে অথবা সাধারণভাবে হাজীগণ যখন হজ্জে গমন করে এরপূর্বে হজ্জের সফরে বের হতে চায় তবে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে। মাহ্‌রাম ছাড়া মহিলা সঙ্গিনীদের সাথে মহিলার হজ্জে যাওয়া না জায়িয (শামী, ২য় খণ্ড)।

মহিলাদের উপর হজ্জ আদায় করা তখনই ওয়াজিব হবে যখন তারা ইদ্দত পালনের অবস্থা হতে মুক্ত থাকে। এ ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক অথবা তালাকের কারণে হোক। রাজঈ তালাক হোক অথবা বায়িন তালাক হোক সব অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী ইদ্দত অথবা তালাকের ইদ্দতের অবস্থায় কোন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়িয নেই। অনুরূপ যদি পথিমধ্যে কোন শহরে অবস্থান কালে মহিলার ইদ্দতকাল শুরু হয় এবং সেখান থেকে মক্কা শরীফ যদি তিন দিনের সফরের পথ হয় তবে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ঐ শহর থেকে বের হবে না। যদি হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে বের হওয়ার পর ইদ্দত পালনের মত অবস্থার সম্মুখীন হয় তবে রিজঈ তালাক হলে স্বামী তার থেকে আলাদা হবে না। এ অবস্থায় স্বামীর জন্য উত্তম হল, পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করে নেয়া। আর বায়িন তালাক হলে স্বামী বে-গানা পুরুষের মতই গন্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন মহিলা ইদ্দতের অবস্থায় হজ্জ সমাপন করে নেয় তাহলে হজ্জ আদায় হবে। কিন্তু সে গুনাহগার হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## হজ্জ আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান হওয়া। ইসলাম হল প্রত্যেক আমল বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত।

২. ইহ্‌রাম। বিনা ইহ্‌রামে হজ্জ আদায় করা হলে তা সহীহ্ হবে না।

৩. নির্দিষ্ট সময়ে হজ্জ করা। অর্থাৎ হজ্জের নির্ধারিত মাসে হজ্জের কাজসমূহ আদায় করা।

৪. হজ্জের প্রত্যেকটি কাজ এর নির্দিষ্ট স্থানে সম্পন্ন করা। অর্থাৎ উকূফ-আরাফাতের ময়দানে, তাওয়াফ মসজিদে হারামে, কুরবানী-হরমের সীমানার মধ্যে এবং কংকর-মিনায় নিক্ষেপ করা। সুতরাং কেউ যদি হজ্জের কোন রুকন বা ওয়াজিব অথবা সুন্নাত এর নির্দিষ্ট স্থানে আদায় না করে অন্যত্র আদায় করে তবে তা সহীহ্ হবে না।

৫. ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকা।

৬. জ্ঞানবান হওয়া।

৭. হজ্জের যাবতীয় কাজ চাই তা শর্ত অথবা রুকন অথবা ওয়াজিব যাই হোক না কেন নিজেই তা আদায় করা। অবশ্য ওযরবশত কোন কোন কাজ অন্যকে দিয়ে করানো যায়।

৮. ইহ্‌রাম বাঁধার পর আরাফাতের ময়দানে অবস্থান পর্ব সমাপ্ত করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস না করা। যদি কেউ আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তবে তার হজ্জ সহীহ্ হবে না বরং পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

৯. যে বছর ইহ্‌রাম বাঁধবে ঐ বছরই হজ্জ সমাপন করা (শামী, ২য় খণ্ড ও মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)।

**হজ্জ ফরয হওয়ার পর গরীব হয়ে গেলে**

কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল। কিন্তু বিনা ওযরে সে হজ্জ আদায় করেনি। পরে গরীব এবং নিঃস্ব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার যিম্মায় হজ্জ বাকী থেকে যাবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ আদায় করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তার উপর অপরিহার্য হবে।

**হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায়ে বিলম্ব করা**

হজ্জ ফরয। এর ফরযিয়্যত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। জীবনে একবার হজ্জ করা যার উপর ফরয, যে বছর হজ্জ ফরয হয় ঐ বছরই তা আদায় করা ফরয। কোন ওযর না থাকলে ঐ বছরই আদায় করতে হবে। বিনা ওযরে বিলম্ব করা জায়িয নয়। অবশ্য হজ্জ না করে মারা গেলে তার যিম্মায় হজ্জ আদায় করা বাকী থেকে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি পিতামাতা-ব্যতীত ছোট শিশুকে দেখার মত কেউ না থাকে তাহলে পিতামাতা এই কারণে হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করতে পারেন। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকুক বা খারাপ থাকুক উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয় কিন্তু শরী'আত সম্মত কোন ওযর দেখা দেয় সেক্ষেত্রে তার জন্য বিলম্ব করা জায়িয রয়েছে ।

ছেলে যদি সুশ্রী হয় এবং এ কারণে ফিত্‌নার আশংকা থাকে তাহলে তার দাড়ি গোঁফ না গজানো পর্যন্ত মাতাপিতা তাকে হজ্জ পালন হতে বিরত রাখতে পারবে। মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা মাহ্‌রাম না থাকাও ওযর হিসেবে গণ্য। রাস্তা নিরাপদ না হওয়ায় ওযর। মহিলাদের ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনের অবস্থায় থাকাও ওযর। উপরোক্ত ওযর সমূহের কারণে বিলম্বে হজ্জ আদায় করা তাদের জন্য জায়িয হবে। যদি কারো যিম্মায় হজ্জ ফরয এবং তার পিতামাতা অসুস্থতা অথবা বার্ধক্য জনিত কারণে তার খিদমতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে তাঁদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের হজ্জে গমন করা মাকরূহ। আর যদি খিদমতের প্রয়োজন না থাকে তাদের অনুমতি ছাড়া হজ্জে গমন করাতে কোন দোষ নেই।

পিতামাতার অবর্তমানে দাদাদাদীর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। নফল হজ্জের ক্ষেত্রে মাতাপিতার অনুমতি ছাড়া হজ্জে গমন করা সর্ববস্থায় মাক্‌রূহ। রাস্তা নিরাপদ হোক বা না হোক এবং তাদের খিদমতের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কারো স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং যাদের খোরপোষ তার দায়িত্বে তারা যদি হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে নারাজ থাকে এবং তাদের ক্ষতির কোন আশংকা না থাকে তবে হজ্জে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। আর যাদের খোরপোষ তার দায়িত্ব নয় এরূপ লোকেরা হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে নারায থাকলে এবং হজ্জে গেলে ক্ষতির কোন আশংকা থাকলে এ অবস্থায় ও হজ্জে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যদি এ পরিমাণ মাল থাকে যার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম, এরূপ ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ না করে হজ্জে যেতে চায় তবে হজ্জে যাওয়া তার

www.pathagar.com

জন্য মাকরূহ। কিন্তু ঋণদাতারা অনুমতি দিলে হজ্জে যাওয়া জায়িয হবে। কেউ যদি কর্জের যামিন হয় এবং ঋণদাতা ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে হয় তবে কর্জদাতা এবং যামিন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া সে হজ্জে যেতে পারবে না। আর যদি ঋণদাতা ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কেউ যামিন হয় তবে কর্যদাতা, ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হজ্জে যেতে পারবে না। কিন্তু যামিনের অনুমতি অপরিহার্য নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### হজ্জের ফরয

হজ্জের ফরয তিনটি যথা ঃ

১. ইহ্‌রাম বাঁধা। অর্থাৎ হজ্জের নিয়্যত করে তালবিয়া পাঠ করা।

২. আরাফার ময়দানে উকূফ (অবস্থান) করা। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় সময় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফা ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা। অর্থাৎ যে তাওয়াফ ১০ই যিলহজ্জের সকাল থেকে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন সময় আদায় করা হয়।

যদি এই ফরয তিনটির কোন একটিও বাদ পড়ে যায় তবে হজ্জ সহীহ্ হবেনা এবং দম বা কুরবানী দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না। এই তিনটি ফরয ক্রমানুযায়ী আদায় করা এবং প্রত্যেক ফরযকে এর নির্দিষ্ট স্থান ও নির্ধারিত নিয়মে সম্পন্ন করা ওয়াজিব। আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস হতে বিরত থাকাও ওয়াজিব। উপরোক্ত ফরয তিনটির থেকে প্রথমটি অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধা হজ্জের শর্ত। আর উকূফে আরাফা এবং তাওয়াফে যিয়ারত হল রুক্‌ন। রুকন দু'টোর মধ্যে উকূফে আরাফাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ (শামী, ২য় খণ্ড)।

### হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

হজ্জের ওয়াজিব পাঁচটি ঃ

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা,

২. সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা,

৩. রমী করা (কংকর মারা),

৪. মাথার চুল মুণ্ডানো অথবা ছোট করা,

৫. মীকাতের বাইরে লোকদের বিদায়ী, তাওয়াফ করা (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কিরান আদায়কারীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। এটাকে নিয়ে ওয়াজিবের সংখ্যা হয় ছয়টি। উল্লেখ্য যে কোন কোন কিতাবে হজ্জের ওয়াজিবের সংখ্যা বাইশটি। কোন কিতাবে চব্বিশটি এমনকি কোন কিতাবে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সতন্ত্রভাবে হজ্জের ওয়াজিব নয়। বরং এগুলো হজ্জের বিভিন্ন আমলের সাথে

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত ওয়াজিব। কোনটা তাওয়াফের সাথে। কোনটা ইহ্‌রামের সাথে আবার কোনটা রমীর সাথে সম্পৃক্ত।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহের কোন একটি যদি বাদ পড়ে যায় তবুও হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ুক অথবা ভুলক্রমে বাদ পড়ুক উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য মহিলাদের ক্ষেত্রে হায়িয-নিফাসের কারণে তাওয়াফে-বিদা করতে না পারলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হজ্জের সুন্নাত

হজ্জের সুন্নাতসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী লোকদের মধ্যে যারা হজ্জে ইফরাদ এবং হজ্জে কিরান করেন তাদের জন্য তাওয়াফে কুদূম করা। তাওয়াফে কুদূমে রমল করা। অর্থাৎ বীরের ন্যায় চলা। যদি এই তাওয়াফে রমল না করে তবে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে রমল করা।

২. সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ীর সময় সবুজ বাতির মাঝখানে দ্রুতগতিতে চলা।

৩. কুরবানীর দিনগুলোর রাতে মিনায় অবস্থান করা।

৪. ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা।

৫. ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা।

৬. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

৭. তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তারতীব-ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এছাড়া আরো কিছু সুন্নাত রয়েছে যা হজ্জের কার্যাবলী ও মাস'আলা বর্ণনার সাথে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত ত্যাগ করা দোষণীয়। পালন করলে সাওয়াব হয় আর তরক করলে দম ওয়াজিব হয় না।

## হজ্জের আদাব ও মুস্তাহাব

হজ্জের আদাব ও মুস্তাহাব নিম্নরূপ ঃ

১. হজ্জের সফরে বের হওয়ার আগে সমুদয় কর্য পরিশোধ করা।

২. সফর কেমন করে করবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা।

৩. ইস্‌তিখারা করা।

ইস্‌তিখারার তরীকা প্রথমে দু' রাক'আত নামায আদায় করবেন আর এতে সূরা ইখ্‌লাস তিলাওয়াত করবেন।

www.pathagar.com

পরে ইস্‌তিখারার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - اَللّٰهُمَّ اِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرُ خَيْرٌ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ دُنْيَاىَ وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةُ اَمْرِىْ
فَاصْرِ فْهُ وَ يَسِّرْ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرُ شَرٌّ لِىْ
فِىْ دِيْنِىْ وَ دُنْيَا ىِ وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ عَنِّى وَ اصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَ
اقْدِرْلِى الْخَيْرَ لَيْثَ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ

هذا الامر বলার সময় যে বিষয়ে ইস্‌তিখারা করা হচ্ছে মনে মনে তার খিয়াল করতে হবে। মন যেদিকে বুঝবে একে উত্তম মনে করে কাজ এভাবেই আঞ্জাম দিবে। এক বারে কোন কিছু বুঝা না গেলে সাতবার পর্যন্ত করবে। ইস্‌তিখারার মূল বিষয়টি হল, মনের সন্দেহ দূর করা। এ ব্যাপারে কোন কিছু স্বপ্নে দেখা অপরিহার্য নয়।

৪. খালিস নিয়্যতে তাওবা করা। যুলুম করে কারো মাল আত্মসাৎ করে থাকলে তা মালিকের নিকট ফেরৎ দিয়ে দিবেন এবং তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। কারো প্রতি অন্যায় করে থাকলে তার থেকেও ক্ষমা চেয়ে নিবেন। ইবাদতের মধ্যে ত্রুটি করে থাকলে তা পূর্ণ করে নিবেন। এর জন্য অনুতপ্ত হবেন এবং ভবিষ্যতে কখনো এরূপ করবে না বলে দৃঢ় সংকল্প করবেন।

৫. রিয়া অহংকার ত্যাগ করবেন।

৬. হালাল উপার্জন দ্বারা হজ্জ করান। হারাম মালের হজ্জ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। হজ্জে গমনেচ্ছুক কারো হালাল মালে সন্দেহ হলে টাকা ঋণ নিয়ে এর দ্বারা হজ্জ সম্পন্ন করবে এবং পরে নিজের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবেন।

৭. নেক্‌কার আলেম সফর সঙ্গী তালাশ করে তাদের সাথে হজ্জ করবে। যাতে কোন আমল ভুলে গেলে তারা তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে; অস্থির হলে সান্ত্বনা দিতে পারেন এবং অক্ষম হলে সাহায্য করতে পারেন। আত্মীয় সফর সঙ্গীর চেয়ে অনাত্মীয় সফর সঙ্গী উত্তম। এতে অনাভিপ্রেত ঘটনার উদ্ভব হলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

৮. পরিবারের যাবতীয় খরচের টাকা পয়সা দিয়ে যাবেন।

৯. পাক-পবিত্র অবস্থায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন।

১০. তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করবেন।

১১. আল্লাহ্‌র যিক্‌র বেশীবেশী করবে এবং ক্রোধ ত্যাগ করবেন।

১২. অযথা কথাবার্তা পরিহার করে শান্তভাবে থাকবেন।

১৩. হজ্জের সফরে ব্যবসা বাণিজ্য না করা উত্তম। যদি কেউ করে তবে তাতে সাওয়াব কম হবে না।

www.pathagar.com

১৪. সফরের সামান খরীদ করার সময় বেশী দর কষাকষি করবেন না।

১৫. পথ খরচের মধ্যে কেউ কারো সাথে শরীক হবেন না। প্রত্যেকেই নিজের খরচ নিজে বহন করবেন। একত্রে খরচ করলে হিসাব পরিষ্কার রাখবেন। একত্রে খানা খেলে এক একজন এক একদিন করে খানা খাওয়ানো উত্তম।

১৬. বৃহস্পতিবার বাড়ী হতে রওয়ানা করা মুস্তাহাব। তা না হলে মাসের প্রথম সোমবার দিনের অগ্রভাগে রওয়ানা করবেন।

১৭. সফরের পূর্বে পরিবারে লোকজন এবং ভাই বন্ধুদের থেকে বিদায় নিবেন। তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবেন এবং তাদেরকে দু'আ করতে বলবেন। এতদুদ্দেশ্যে তাদের নিকট গিয়ে এ কাজ সমাধা করবেন। হজ্জের সফর শেষে বাড়ী ফেরার পর লোকজন হাজীর নিকট আসবে এবং দু'আ চাইবেন। দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের ন্যায় এ সফরে লোকদের থেকে বিদায় নিবেন।

১৮. বাড়ী থেকে বের হওয়ার আগে দু'রাকা'আত নামায আদায় করে নিবেন। অনুরূপভাবে বাড়ীতে ফেরার পরও দুই রাক'আত নামায আদায় করবেন। নামাযান্তে বের হওয়ার সময় এ দু'আটি পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اِنْتَشَرْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اِعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَقبِى وَ اَنْتَ رِجَا ئِىْ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ مَا اهَمَّنِى وَ مَا لَا اهتم بِهٖ وَ مَا اَنْتَ اَعلم بِه منى عز جَارك وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ زودنى التَّقْوٰى وَ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَ وَجِّهْنِى اِلَى الْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَ عْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمُنْقَلِبِ وَ الْحُوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَ الْمَالِ

ঘর হতে বের হওয়ার পর পড়বেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ وَ فِّقْنِىْ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى وَ احْفِظْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এরপর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস একবার করে পড়বেন।

১৯. কাছের পথ হলে পায়ে হেটে হজ্জ করা উত্তম। আর দূরের পথ হলে সাওয়ারী যোগে হজ্জ করা উত্তম।

২০. সাওয়ারীর উপর আরোহন করার সময় বলবেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَ علمنا القى ان و من عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

২১. হাজীদের জন্য উত্তম হল, প্রথমে হজ্জের কাজ সমাধা করে পরে মদীনা শরীফ গমন করা। ফরয হজ্জ না হলে প্রথমে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবেন। ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে প্রথমে মদীনা শরীফ যাওয়াও জায়িয আছে।

সুন্নাত এবং মুস্তাহাব ছুটে গেলে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু গুনাহ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# হজ্জের প্রকারভেদ

**হজ্জ তিন প্রকার**

১. ইফ্‌রাদ, ২. তামাত্তু এবং ৩. কিরান।

শুধু হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করাকে 'হজ্জে ইফরাদ' বলে। হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে উমরা আদায় করে হালাল হয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করে ঐ বছরই হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ পালন করাকে 'হজ্জে তামাত্তু' বলা হয়। একই সময় হজ্জ এবং উমরা পালনের নিয়্যত করে ইহ্‌রাম বাঁধাকে 'হজ্জে কিরান' বলে। এই তিন প্রকার হজ্জই জায়িয। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জে কিরানই সবচেয়ে উত্তম। এপর তামাত্তু এরপর হজ্জে ইফরাদ। এ হুকুম মক্কার বাইরের লোকদের জন্য। মক্কাবাসী লোকদের জন্য হজ্জে ইফরাদ উত্তম (শামী, ২য় খণ্ড)।

**হজ্জে ইফরাদ**

হজ্জে ইফরাদ আদায়কারী ব্যক্তি প্রথমে প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করবে। ইহ্‌রামের নিয়্যতে গোসল করবে। গোসল করতে না পারলে উযূ করবে। হায়িয ও নিফাস ওয়ালী মহিলা এবং শিশুদের জন্যও গোসল করা সুন্নাত। ইহ্‌রামের জন্য গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই। গোসলের পর সেলাই যুক্ত কাপড় খুলে সেলাই বিহীন ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করবে। দু' খানা কাপড় না থাকলে এক খাকী কাপড়ই যথেষ্ট হবে। ইহ্‌রামের কাপড় সাদা, নতুন অথবা ধোলাইকৃত হওয়া মুস্তাহাব। এরপর শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবে। পুরুষের জন্য রং বিহীন সুগন্ধি এবং মহিলাদের জন্য রং বিশিষ্ট সুগন্ধি উত্তম। কিন্তু কাপড়ে এমন সুগন্ধি লাগাবে না যার চিহ্ন অবশিষ্ট থকে। এরপর ইহ্‌রামের নিয়্যতে দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করবে। মাকরূহ ওয়াক্তে এ নামায আদায় করবে না। নামাযের প্রথম রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইখ্‌লাস পাঠ করা মুস্তাহাব। এ নামায মাথায় টুপী পরিধান অবস্থায় পড়াই সুন্নাত। সালামের পর টুপী খুলে তারপর ইহরামের নিয়্যত করবে। ইহ্‌রাম খোলার পূর্বে আর টুপী পরিধান করবে না। দাঁড়িয়ে অথবা সাওয়ার অবস্থায় ও ইহ্‌রামের নিয়্যত করা যায়। সম্ভব হলে মুখে উচ্চারণ করে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

এরপর সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করবে।



www.pathagar.com

তালবিয়া নিম্নরূপ ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ

তালবিয়া একবার পাঠ করা শর্ত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তিনবার পাঠ করা মুস্তাহাব। পুরুষ উচ্চস্বরে এবং মহিলা অনুচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করবে। তারপর দরূদ শরীফও পাঠ করবে। ইহ্‌রামের পর বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে। বিশেষভাবে অবস্থা পরিবর্তনের সময় অর্থাৎ সাওয়ার হওয়ার সময়, সওয়ারী হতে অবতরণের সময়, উচু স্থানে উঠার সময়, নীচে অবতরণের সময়, সকালে রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়, কারো সাথে সাক্ষাতের সময় এবং সমস্ত নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করবে। ইহ্‌রাম বাঁধার পর ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ এর থেকে বিরত থাকার এবং ইহ্‌রামের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। হরম সীমায় পৌছে অত্যন্ত বিনয় এবং নম্রতার সাথে হরমে প্রবেশ করবে। প্রচুর পরিমাণে তালবিয়া, তাক্‌বীর ও তাহ্‌লীল ইত্যাদি পাঠ করবে।

প্রবেশের সময়ও যেহেতু বাবুল মু'আল্লা দিয়ে প্রবেশ করার প্রতি অনেক সময় গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হয় না। তাই জিদ্দা হতে মোটর গাড়ীতে আরোহন করার পূর্বে গোসল করে নেয়াই উত্তম। এরপর মক্কা শরীফের নিকটবর্তী হওয়ার পর মক্কা প্রবেশের পূর্বে (সম্ভব হলে) গোসল করে নিবে। এবং মক্কার কবরস্থান বাবুল মু'মাল্লার দিক দিয়ে মক্কা প্রবেশ করবে। এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِهَا قَرَارًا وَّ ارْزُقْنِى بِهَا حَلَالًا

এরপর মাদ'আ নামক স্থানে দু'আ করবে। হজ্জের সময় রাত্রে বা দিনে যে কোন সময় ইচ্ছা মক্কা শরীফ প্রবেশ করতে পরবে। অবশ্য দিনে প্রবেশ করা মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

গাড়ী থেকে নেমে আসবাবপত্র রেখে যাওয়ার ব্যাপারে যদি কোনরূপ অস্থিরতা না থাকে তাহলে গাড়ী থেকে নেমে সামান রেখে সরাসরি মসজিদে হারামে চলে যাবে। নতুবা সামান পত্র রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করে পরে মসজিদে হারামে যাবে। বাবুস্ সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা উত্তম। প্রথমে ডান পা রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রবেশ করবে। প্রবেশের সময় লাব্বায়িক বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

পাঠ করবে। যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখা যাবে তখন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

পাঠ করবে এবং দু'আ পড়তে থাকবে। এ সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَ بِرًّا

www.pathagar.com

এরপর তালবিয়া পড়তে পড়তে হজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবে। হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করে দিবে। তাওয়াফে কুদূম সম্পন্ন করবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাওয়াফের কারণে যেন ফরয নামাযের জামা'আত অথবা বিত্‌রের নামায অথবা সুন্নাতে মুআক্কাদা বাদ পড়ে না যায়। যদি নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তবে প্রথমে নামায আদায় করে নিবে। তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে হজের আসওয়াদের সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন তাওয়াফ কারীর ডান কাঁধ হজরে আসওয়াদের বাঁয়ে থাকে এবং পূরা হজরে আসওয়াদ তাওয়াফকারীর ডানে থাকে। তারপর তাওয়াফের নিয়্যত করবে। নিয়্যত করা ফরয।

নিয়্যত করার সময় নিম্নের দু'আটি মুখে উচ্চারণ করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ طَوَافَ بَیْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

তারপর ডান দিকে কিঞ্চিৎ সরে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন হজরে আসওয়াদ একদম সম্মুখে পড়ে। এর পর হজরে আসওয়াদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করে বলবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَللّٰهُمَّ اِیْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِیْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। উভয় হাতের তালু হজরে আসওয়াদের উপর স্থাপন করে দুই হাতের মাঝে মুখ রেখে মৃদুভাবে চুম্বন করবে যেন চুম্বনের কারণে কোন রূপ শব্দ না হয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয় তবে কাউকে কষ্ট দিয়ে তা চুম্বন করতে চেষ্টা করবে না। এ ক্ষেত্রে শুধু উভয় হাত হজরে আসওয়াদের উপর রেখে পরে হাত দু'টি চুম্বন করবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে কোন কাঠের দ্বারা হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে সেই কাঠিতে চুমু খাবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠায়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করবে যেন হাতের তালু হজরে আসওয়াদের দিকে এবং পিঠ নিজের মুখের দিকে থাকে। তখন এ খিয়াল করবে যে, সে তার হস্তদ্বয় হজরে আসওয়াদের উপরই রেখেছে। তারপর এ দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَیِّدِ الْمُصْطَفٰى
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ

তারপর উভয় হাতে চুমু খাবে। যদি এই তাওয়াফের পর সাঈ করার ইচ্ছা থাকে তবে তাওয়াফ শুরু করার সামান্য পূর্বে ইযতিবা করবে অর্থাৎ চাদরের এক পাশ ডান বগলের নীচে দিয়ে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর রেখে দিবে। এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অর্থাৎ কাঁধ হেলিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে বীরোচিত ভঙ্গিতে দ্রুত গতিতে চলবে। আর যদি তাওয়াফের পর সাঈ করার ইচ্ছা না থাকে তবে রমল এবং ইযতিমা করবে না। তাওয়াফ শুরু

www.pathagar.com

করার পর তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। হজরে আসওয়াদ চুম্বন করার পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার দিকে অর্থাৎ নিজের ডান দিকে অগ্রসর হবে এবং হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করবে। রুকনে ইয়ামনীতে পৌছে সম্ভব হলে তা ডান হাতে স্পর্শ করবে। কিন্তু রুকনে ইরাকী ও রুকান শামীতে স্পর্শ করবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তারপর ঘুরে এসে যখন হজরে আসওয়াদের নিকট পৌছবে তখন তাওয়াফের এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাওয়াফের প্রতি চক্করের শুরুতে উল্লেখিত নিয়মে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে, এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, তাওয়াফের সময় কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টি দিবে না বরং দৃষ্টি নীচের দিকে রাখবে। সপ্তম চক্কর শেষ করে পুনরায় হজরে আসওয়াদে চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করবে।

তারপর মাকামে ইব্রাহীমের দিকে 'وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى' পড়তে পড়তে অগ্রসর হবে। এবং মাকামে ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ্ এবং নিজের মাঝখানে রেখে দুই রাক'আত নামায আদায় করবে। একে তাওয়াফের নামায বলা হয়। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্লাস পাঠ করবে। যদি সেখানে জায়গা পাওয়া না যায় তবে হাতীমের ভিতর অথবা মাতাফের সেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে উক্ত নামায পড়বে। নামাযান্তে আল্লাহ্র দরবারে খুব বিনয়ে সাথে দু'আ করবে। তাওয়াফের এ দুই রাক'আত নামায এমন সময় আদায় করবে যখন নফল পড়া জায়িয। মাকরূহ নিষিদ্ধ ওয়াক্তে এ নামায পড়বে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তাওয়াফের নামায সমাপ্ত করে যমযম কূঁপের নিকট আসবে এবং কিব্লামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খুব তৃপ্তি সহকারে তিন শ্বাসে যমযমের পানি পান করবে আর শরীরে ও কিছু পানি মেখে নিবে। এরপর সম্ভব হলে মুলতাযিমের নিকট আসবে এবং তা জড়িয়ে ধরবে। ডানগাল বা কখনো বাম গাল এর উপর রাখবে এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দু'আ করবে। তারপর হরম শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে। হরম শরীফ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম বা রাখবে। এ সময় নিম্ন বর্ণিত দু'আটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَّ اسِعًا وَ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

এরপর সে ইহ্রামের হালতে অবস্থান করবে এবং ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে। এ সময় যথা সম্ভব বেশী বেশী নফল তাওয়াফ আদায় করবে এবং হরম শরীফে নামায, তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকবে।

হজ্জ পালনকারীর উপর সাফী ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা ওয়াজিব। একে হজ্জের সাঈ বলা হয় এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পরে তা আদায় করা হয়। ইফরাদ হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি যদি উক্ত হজ্জের সাঈ তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে আদায় করতে চায় তবে সে তাওয়াফে কুদূমের যাবে হজ্জের স্থায়ী আদায় করে নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সে তাওয়াফে কুদূমের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে। তাওয়াফের নামায আদায় করে যমযমের পানি পান করার পরে

www.pathagar.com

হজ্জের সায়ী আদায় করার উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে এবং নিম্নের দু'আটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

সাফা পাহাড়ে আরোহণ করবে। এ পাহাড়ে আরোহণ করা সুন্নাত। উপরে উঠে এমনভাবে দাড়াবে যেন বায়তুল্লাহ্ দেখা যায়। সাফায় আরোহণের সময় পড়বে ঃ

اَبْدَءُ بِمَا بَدَءَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

এরপর বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে তাক্‌বীর, তাহ্‌লীল, হামদ্ ইত্যাদি তিনবার পড়বে এবং নবী (সা.) -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্‌র নিকট নিজের জন্য এবং অন্যান্য সকলের জন্য দু'আ করবে। সাঈর অধ্যায়ে যে সব দু'আ মুখস্ত না থাকে তবে নিজের ভাষায়ই দু'আ করবে। এরপর সাফা হতে নীচে অবতরণ করে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। বতনে ওয়াদী পর্যন্ত এভাবে চলবে। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত সবুজ বাতি হতে অপর সবুজ বাতি পর্যন্ত পুরুষগণ মৃদু দৌড়িয়ে চলবে। মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবে। এ সময়ে ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

দু'আটি বেশী বেশী করে পাঠ করবে।

সবুজ বাতি অতিক্রম করার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। মারওয়ার নিকট পৌছে মারওয়া পাহাড়ে আরোহন করবে এবং কিব্‌লামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে, তার মহত্ত্ব বর্ণনা করবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়বে এবং নবী (সা.) -এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে সাফার ন্যায় মারওয়াতেও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দু'আ করবে। এভাবে সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। শেষ চক্কর শেষে হবে মারওয়ায় গিয়ে প্রত্যেক চক্করে বর্ণিত দু'আসমূহ অথবা যে দু'আ মুখস্ত থাকবে এবং যে দু'আয় একাগ্রতা সৃষ্টি হয় তা পাঠ করবে। সাঈর পর মাতাফের প্রান্তে এসে দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করবে।

তাওয়াফ বা সাঈর অবস্থায় যদি নামাযের ইকামত আরম্ভ হয় তবে তাওয়াফ বা সাঈ স্থগিত রেখে জামা'আতে শরীক হবে। নামায শেষ করার পর অবশিষ্ট তাওয়াফ বা সাঈ সমাপ্ত করবে। জানাযার নামায আরম্ভ হলে তাওয়াফ ও সাঈ স্থগিত রেখে জানাযায় শরীক হবে। এরপর বাকী তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করবে। তাওয়াফ ও সাঈর অবস্থায় বেচা কেনার কথা বলা মাকরূহ। মুফরিদ ব্যক্তি তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করার পর ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করবে এবং যত অধিক সম্ভব নফল তাওয়াফ করতে থাকবে। এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকবে। কোনো উমরাহ পালন করবে না।

৭ই যিলহজ্জ মসজিদুল হারামের ইমাম খুত্‌বা পড়বেন তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করবে এবং ৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর এমন সময় মিনায় পৌছবে যাতে যুহরের নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে সেখানে আদায় করা যায়। সূর্যোদয়ের আগে যাওয়াও জায়িয। তবে পরে যাওয়াই

www.pathagar.com

উত্তম। এ সময় হাজী মক্কা, মসজিদে হারামে বা অন্য যেখানেই থাকবে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। দু'আ করবে এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা পাঠ করবে। মিনায় রাত্রি যাপন করবে এবং যুহর হতে ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায এখানে আদায় করবে। আরাফার দিন ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করবে। এরপর সূর্যের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার পর তালবিয়া ও তাক্বীর পড়তে পড়তে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা করবে, জাবালে রহমত দেখা মাত্রই তাক্বীর, তাহ্লীল ও ইসতিগফার করবে এবং আল্লাহ্র দরবারে বিশেষভাবে দু'আ করবে।

আরাফার যে কোন স্থানে উকূফ করা জায়িয। অবশ্য জাবালে রহমতের নিকটে অবস্থান করা উত্তম, রাস্তায় নামবে না। এতে যাত্রীদের কষ্ট হয়। পানাহার শেষ করে সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই গোসল করে নিবে। তারপর সম্ভব হলে মসজিদে নামিরায় গিয়ে বসবে এবং ইমামের খুত্বা শুনবে। এরপর যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করবে। অবশ্য এতদুভয় নামায একত্রে আদায় করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে যা 'যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা' শিরোনামের অধীনে আলোচিত হয়েছে।

নামাযান্তে যথাশীঘ্র নিজের অবস্থান স্থলে চলে আসবে। যদি জাবালে রহমতের নিকটবর্তী জায়গায় (যেখানে কালো পাথর বিছানো আছে) স্থান পাওয়া যায় তবে সেখানেই অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরাফায় এ স্থানটিতে অবস্থান করেছেন। নতুবা যেখানে অবস্থান করা সম্ভব সেখানেই অবস্থান করবে। জাবালে রহমতের নিকটে অবস্থান করা উত্তম। এ সময় নিজের অবস্থান স্থলে কিব্লামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে অবস্থান করা উত্তম। বসে বসে উকূফ করাও জায়িয। আরাফায় অবস্থান কালে কিছুক্ষণ পর পর তালবিয়া পাঠ করবে। এ স্থানে খুব বেশী বেশী করে দু'আ করবে। নিজের জন্য, ছেলেমেয়ে, পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্য দু'আ করবে।

তাক্বীর, তাহ্লীল, হামদ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে দু'আ আরম্ভ করবে। দু'আর সময় উভয় হাত ছড়িয়ে উপরের দিকে উত্তোলন করে কিব্লামুখী হয়ে দু'আ করবে। কাকুতি-মিনতির সাথে কেঁদে কেঁদে দু'আ করবে। এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাসবীহ্, তাহ্লীল, দরূদ, দু'আ ইত্যাদি পাঠে মশগুল থাকবে। ঘুরাফেরা ও হাসি তামাশায় সময় নষ্ট করবে না। আরাফাতে নির্দিষ্ট কোন দু'আ পড়া। জরুরী নয়। যে কোন দু'আ পড়া জায়িয আছে। তবে অধিকাংশ সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উত্তম ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَ لَا نَعْرِفُ رَبًّا سِوَاهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَ يَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ اَللّٰهُمَّ هٰذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيْرُ الْعَائِذُ مِنَ النَّارِ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ وَ اَدْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ لِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِذْهَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ فَلَا شَرعَهُ عَنِّىْ وَ لَا تَنْزِعْنِىْ عَنْهُ حَتّٰى تَقْبِضَنِىْ اَنَا عَلَيْهِ

অনুচ্চস্বরে চুপে চুপে দু'আ করা সুন্নাত।

সূর্যাস্তের পর তালবিয়া এবং দু'আ পড়তে পড়তে কাফেলার সাথে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে মুয্দালিফার উদ্দেশ্যে গমন করবে। উত্তম হল স্বাভাবিক অবস্থায় চলা। জায়গা খালি পেয়ে দ্রুত চলবে। কাফেলার সাথে সাথে চলবে। সূর্যাস্তের পর অন্যান্য কাফেলা যদি বিলম্ব করে তবে তার আগেই রওয়ানা করবে। আরাফার সীমানা অতিক্রম না করলে সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা করতে কোন ক্ষতি নেই। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা অতিক্রম করা জায়িয নেই। কেউ যদি তা করে তবে তার উপর 'দম' দেওয়া ওয়াজিব হবে। পায়ে হেঁটে মুযদালিফায় গমন করা মুস্তাহাব। মুয্দালিফায় পৌঁছে যেখানে ইচ্ছা অবস্থায় করবে। রাস্তায় অবস্থান করবে না। কুযাহ্ পাহাড়ের নিকট অবস্থান করা উত্তম। এখানে পৌঁছে গোসল অথবা অযূ করে নিবে। 'ওয়াদীয়ে মুহাস্সার' এ অবস্থান করবে না। এখানে অবস্থান করা জায়িয নেই।

মুযদালিফায় পৌঁছে এশার ওয়াক্তে মাগরিব ও এশার নামায এক আযান ও এক ইকামতের সাথে আদায় করবে। এই দুই নামাযের মধ্যে সুন্নাত ও নফল নামায পড়বে না। বরং তা পরে পড়বে। এই দুই নামায একত্রে আদায় করার শর্ত সমূহ ও 'মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করা' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। আরাফার ময়দানে অথবা রাস্তায় মাগরিব ও ইশার নামায পড়া জায়িয নেই। যদি কেউ পড়ে তবে এ নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। যদি এশার পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছে যায় তবে এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামায পড়া জায়িয হবে না।

এ রাত্রে না ঘুমিয়ে নামায কুরআন তিলওয়াত, যিক্র, তাওবা- ইস্তিগফার, দু'আ এবং কান্নাকাটিতে মশগুল থাকবে। এ রাত্র শবে-কদর হতেও উত্তম। সুবহে সাদিকের পর অন্ধকার অবস্থায় আউয়াল ওয়াক্তে ইমামের সাথে অথবা একা ফজরের নামায পড়ে মাশ'আরুল হারামের নিকটে উকূফ করবে। এখানে জায়গা না পেলে 'বতনে মুহাস্সার' ছাড়া যে কোন স্থানে উকূফ করতে পারবে। অবস্থানের সময় হামদ, সানা, তাসবীহ্, তাহলীল, তাকবীর ও তালবিয়া পাঠ করবে এবং নবী করীম (সা.) -এর প্রতি দরূদ শরীফ পড়বে। এরপর উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে নিজের নেক বাসনা পূরণের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করবে।

দুই রাক'আত পরিমিত সময় বাকী থাকতে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবে। 'বতন মুহাস্সার' এ পৌঁছার পর এ স্থানটি দৌড়িয়ে পার হয়ে যাবে। কেউ যদি সুবহে সাদিকের আগেই মুযদালিফার সীমানা অতিক্রম করে চলে যায় তবে দম দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু শরী'আত স্বীকৃত কোন কারণে অর্থাৎ অসুস্থতা, দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে কেউ যদি সেখান থেকে রাত্রেই রওয়ানা করে তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মুযদালিফা হতে রওয়ানা হওয়ার সময় সত্তরটি নুড়ি পাথর কুড়িয়ে সাথে নিয়ে নিবে। এ সব পাথর রাস্তা বা অন্য কোথাও হতে সংগ্রহ করাও জায়িয। কিন্তু এগুলো জামরাতের নিকট হতে সংগ্রহ করবেনা। মিনায় পৌঁছে জামরাতুল উখরাতে রমী করবে। অর্থাৎ উপরোক্ত স্থানে এসে বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং শাহাদাত আঙ্গুলির সাহায্যে কংকর ধরে নিম্নভূমির দিকে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে একে একে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রথম কংকর নিক্ষেপের সময় তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্বীর বলবে অথবা

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ

দু'আটি পড়বে। কংকর নিক্ষেপের সময় হাত এত উপরে উঠাবে না যে বগল উন্মুক্ত হয়ে যায়। রমী শেষ করে সেখানে দাঁড়াবেনা, বরং নিজের থাকার জায়গায় চলে আসবে। এদিকে অন্য কোন জামরাতে আর পাথর মারতে হবে না। ১০ তারিখ রমীর ওয়াক্ত হল সেদিনের সুবহে সাদিক হতে ১১ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা সুন্নাত। এরপর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ্ এবং সূর্যাস্ত হতে ফজর পর্যন্ত রমী করার মাকরূহ সময়।

রমী সমাপ্ত করে কুরবানী করবে। নিজে যবাহ্ করতে পারলে নিজ হাতে যবাহ্ করাই উত্তম। নিজের কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করা মুস্তাহাব। সুতরাং যতটা সম্ভব অথবা প্রয়োজন কুরবানীর গোশ্‌ত নিয়ে নিবে। বাকী গোশ্‌ত সাদাকা করে দিবে।

হজ্জে ইফরাদ পালন কারীর জন্য শুকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। এরপর কিব্‌লামুখী হয়ে বসে মাথা মুণ্ডন করিয়ে নিবে অথবা ছাটাবে। তবে মুণ্ডন করাই উত্তম। এ ক্ষৌরকার্য ডান দিক হতে শুরু করাবে। ক্ষৌর কার্যের শুরুতে এবং শেষে তাকবীর বলবে। মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা জায়িয নয়। সুতরাং তারা চুলের গোছা ধরে আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ নিজে অথবা কোন মাহ্‌রামের মাধ্যমে কাটাবে। অবশ্য বেগানা কোন পুরুষের দ্বারা চুল কাটাবে না। পুরুষ লোকের মাথা মুণ্ডন না চুল কর্তন করার পর গোঁফ ছাটবে এবং বগলের পশম পরিস্কার করবে। মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছাটার পূর্বে বগলের পশম ইত্যাদি পরিষ্কার করা জায়িয নেই। ক্ষৌর কার্যের পর নখ, চুল ইত্যাদি দাফন করা উত্তম। ইহ্‌রামের কারণে যে সব কাজ নিষিদ্ধ ছিল, তা হালাল হয়ে যাবে। শুধু স্ত্রী হালাল হবে না। অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি হালাল হবে না। অবশ্য তাওয়াফে যিয়ারতের পরে তা হালাল হবে।

১০-১১-১২ তারিখ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডানো বা ছাটা জায়িয আছে। কিন্তু ১০ তারিখে করাই উত্তম। যদি মাথায় চুল না থাকে তবে মাথার উপর দিয়ে খুর টেনে নিবে। মাথায় ফোড়া উঠার কারণে মাথায় ক্ষুর ব্যবহার করা যদি সম্ভব না হয় এবং চুল যদি কাটার উপযুক্ত ও না হয় তবে সে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা ব্যতিরেকেই হালাল হয়ে যাবে। কেননা মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটা তার পক্ষে অসম্ভব হওয়ার কারণে তা রহিত হয়ে যাবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য উত্তম হল কুরবানীর শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে হালাল হওয়া। যদি তা না করে প্রথম দিনই হালাল হয়ে যায় তবে এতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। মাথা মুণ্ডানোর জন্য ঔষধ জাতীয় কোন পদার্থ ব্যবহার করাও জায়িয। ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত করে চুল মল মুত্রের উপর বা হাম্মামখানায় নিক্ষেপ করা মাকরূহ।

তারপর মক্কা শরীফ এসে তাওয়াফে যিয়ারত সমাপ্ত করবে। ১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত করা উত্তম। সম্ভব না হলে ১১ই যিলহজ্জ বা ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এ তাওয়াফ করে নিবে। যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ করে থাকে তবে এ তাওয়াফে রমল করবে না এবং সাঈও করবে না। আর তাওয়াফে কুদূমের সাথে সায়ী না করে থাকলে এ তাওয়াফের সাথে রমল করবে এবং সাঈ ও করবে। মাথা কামানো বা ছাটার পর ইহ্‌রামের কাপড় খুলে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করে থাকলে এ তাওয়াফের সময় ইযতিবা করতে হবে

www.pathagar.com

না। নতুবা ইয্তিবা করবে। তাওয়াফ শেষ করে মিনায় চলে আসবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলোতে জামরা সম্মুখে কংকর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এখানেই অবস্থান করবে। তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি হালাল হয়ে যায়। মিনার দিনগুলোতে অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করা মাকরূহ। যদি করে তবে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

১১ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর জামরাত্রয়ে কংকর নিক্ষেপ করবে। মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী জামরা থেকে রমী আরম্ভ করবে। এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেক বার কংকর মারার সময় তাক্বীর বলবে। এরপর এর নিকটবর্তী জামরা তথা জামরায়ে উস্তায় অনুরূপভাবে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। তারপর জামরায়ে আকাবার নিকটে এসে 'বতনে ওয়াদী' থেকে তাক্বীর বলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। জামরায়ে উলা তথা প্রথম জামরায় কংকর মেরে সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কিব্লামুখী হয়ে দাড়িয়ে তাস্বীহ, তাহ্লীল তাক্বীর এবং তাওবা - ইসতিগফারে কিছু সময় লিপ্ত থাকবে। এর পর সেখানে দু'হাত তুলে দু'আ মুনাজাত করবে।

এমনিভাবে জমরায়ে উস্তায় রমী করার পর ও তাসবীহ্ তাহ্লীল, তাওবা ইস্তিগফার কিছু সময় লিপ্ত থাকার পর দু'আ করবে। কিন্তু জামরায়ে আকাবায় রমী করার পর কোন দু'আ করবে না। বরং রমী শেষ করে যথাশীঘ্র নিজের অবস্থান স্থানে ফিরে আসবে। তারপর ১২ তারিখেও দ্বিপ্রহরের পর একই পদ্ধতিতে জামরাত্রয়ে রমী করবে।

১২ তারিখের রমী সমাপ্ত করার পর মক্কা শরীফ চলে আসতে পারবে। এরূপ করলে ১৩ই যিলহজ্জ আর রমী করতে হবে না। কেউ ইচ্ছা করলে ১২ই যিলহজ্জ দিবাগতরাতে ও মিনায় অবস্থান করতে পারবে। যদি ১৩ তারিখ ফজর পর্যন্ত মিনায় থাকে তবে দ্বিপ্রহরের পর যথা নিয়মে জামরায়ে কংকর নিক্ষেপের পর সেখান থেকে চলে আসবে। এটাই উত্তম। আর যদি ইচ্ছা করে তবে দ্বিপ্রহরের পূর্বে ও কংকর নিক্ষেপ করে চলে আসতে পারবে।

কংকর নিক্ষেপের পর মক্কা শরীফ ফিরার পথে 'বতনে মুহাস্সাব' নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে কিছুক্ষণ সময় অবস্থান করা সুন্নাত। কেউ যদি তা তরক করে তবে যে সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করেছে বলে বিবেচিত হবে। তারপর মক্কা মুকাররমা আসবে। যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারবে। এ সময় যেত বেশী ইচ্ছা তাওয়াফ ও উমরা পালন করতে পারবে। অবশ্য ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ ই যিলহজ্জ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উমরা করা নিষিদ্ধ। ১৩ই যিলহজ্জের পর উমরা করতে পারবে। এরপর যখন মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা করার ইচ্ছা করবে তখন তাওয়াফে বিদা তথা বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। এই তাওয়াফ ওয়াজিব। যদি কেউ এই তাওয়াফ না করে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে তবে মীকাত অতিক্রম না করে থাকলে পুনরায় ফিরে আসা ওয়াজিব। মীকাত অতিক্রম করে থাকলে ইচ্ছা করলে দম দিতে পারবে। আর যদি ইচ্ছা করে তবে পুনরায় ইহ্রাম বেঁধে প্রথমে উমরা আদায় করে পরে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। কিন্তু কেউ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পর নফল তাওয়াফ করে থাকে তবে তার বিদায় তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। যদি ও সে সময় বিদায়ী তাওয়াফের নিয়্যত না করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে বিদায় তাওয়াফ আদায় করাই সমীচীন, বিদায়ী তাওয়াফের পর মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায

www.pathagar.com

আদায় করবে। এরপর যমযম কুপের নিকট এসে কিব্‌লামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পেটভরে তিন শ্বাসে পানি পান করবে। এবং প্রত্যেক বার বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে নযর করবে। পানি পান করার সময় এ দু'আ পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এবং শেষ চুমুকের সময় এ দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَ اسِعًا وَّ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

এরপর অবশিষ্ট পানি মাথায়, মুখে এবং শরীরেই মাখবে। পরে মুলতাযামের নিকট আসবে এবং কা'বার দেয়ালে নিজের বুক ও মুখ লাগিয়ে এব ডান হাত দরজার চৌকাঠের দিকে উঠিয়ে এভাবে দু'আ করবে ঃ

اَلسَّائِلُ بِبَابِكَ يَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ يَرْجُوا رَحْمَتَكَ

মুলতাযামকে এভাবে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কান্নাকাটি করবে। যদি সম্ভব হয় তবে কা'বার গিলাফ ধরে কান্নাকাটি করবে। সম্ভব না হলে উভয় হাত মাথার উপর রেখে মাথা বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালের সাথে লাগাবে। আবার কখনো গাল বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে রেখে তাক্‌বীর, তাহ্‌লীল ও হামদ পাঠ করবে এবং নবী (সা.) -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের নেক মাকসুদ সমূহ পূরণের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মনোবাক্যে দু'আ করবে। এরপর তাকবীর বলে হজরে আসওয়াদে চুমু খাবে। কাবা গৃহে প্রবেশ করা সম্ভব হলে খুবই ভাল। প্রবেশ করতে না পারলেও কোন দোষ নেই। তার পর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে কেঁদে কেঁদে বিরহ বিচ্ছেদের কারণে আফসোস করতে করতে উল্টো পায়ে বাবুল বিদার পথে বের হয়ে আসবে। এ সময় ফকীর মিস্‌কীনদেরকে যথা সম্ভব বেশী পরিমাণ দান সাদাকা করবে এবং মনে মনে দু'আ পড়তে থাকবে।

হায়িয ও নিফাস ওয়ালী মহিলা যদি মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত পবিত্র না হয় তবে তার থেকে তাওয়াফে বিদা রহিত হয়ে যাবে। তারা মসজিদের বাইরে বাবুল বিদার উপর দাঁড়িয়ে দু'আ করবে। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করবে না। এ সব মাস'আলার ক্ষেত্রে মহিলাদের হুকুমও পুরুষের মতই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় তারা নিজেদের মাথা খোলা রাখবে না। শুধু মুখমণ্ডল খোলা রাখবে। যদি মুখমণ্ডলের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দেয় এবং কোন কিছুর সাহায্যে তা চেহারা থেকে সরিয়ে রাখতে পারে তবে জায়িয আছে।

মহিলাগণ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না। তারা এমনভাবে তালবিয়া পড়বে যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়। শুধু নিজে শুনতে পায়। এ ব্যাপারে আলিমগণের ঐক্যমত হয়েছে। মহিলাগণ রমল করবেনা। এবং দুই সবুজ বাতির মাঝখানে দৌড়িয়ে চলবেনা। তারা মাথা মুণ্ডাবেনা। চুল ছোট করে নিবে। মহিলাগণ সেলাই করা কাপড় জামা, কামীস, ওড়না, মোজা এবং হাত মোজা ব্যবহার করতে পারবে। গোলাপী জাফরানী ও কুসুম রঙ্গের পোশাক পরিধান করতে পারবে না। কিন্তু ধুয়ে নিলে পারবে।

www.pathagar.com

মুহ্‌রিমা মহিলা যদি সেলাই করা রেশমী অথবা অন্য কোন কাপড় পরিধান করে এবং অলংকার ব্যবহার করে তবে এতে কোন দোষ নেই। হজরে আসওয়াদের নিকট ভিড় থাকলে মহিলাগণ তাতে চুম্বন করবে না। খালি থাকলে চুম্বন করবে। সাফা-মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করা মহিলাদের জন্য অবশ্যক নয়। কিন্তু নির্জন থাকলে আরোহন করতে পারবে। উপরোক্ত মাস'আলা সমূহের ক্ষেত্রে নপুংসক লোকেরাও মহিলাদের মতই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**এক নযরে হজ্জে ইফরাদ**

১. ইহ্‌রাম - শর্ত ফরয,

২. তাওয়াফে কুদূম - সুন্নাত,

৩. আরাফায় অবস্থান - রুক্‌ন -ফরয,

৪. মুয্‌দালিফায় অবস্থান - ওয়াজিব,

৫. জাম্‌রাতুল আকাবায়ে রমী - ওয়াজিব,

৬. কুরবানী - ঐচ্ছিক,

৭. মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছাটা - ওয়াজিব,

৮. তাওয়াফে যিয়ারত-রুক্‌ন-ফরয,

৯. সাঈ-ওয়াজিব,

১১. তাওয়াফে বিদা -ওয়াজিব (মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ)।

**হজ্জে তামাত্তু**

সম্পূর্ণ উমরা অথবা উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাস সমূহে সম্পন্ন করে বাড়ী ফেরার পূর্বে ঐ বছরই পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ পালন করাকে শরীয়াতের পরিভাষা 'হজ্জে তামাত্তু' বলা হয়।

হজ্জে তামাত্তু আদায় করার নিয়ম হল, প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের মাস সমূহে উমরা পালন করবে। অর্থাৎ উমরার ইহ্‌রামের পর রমল সহকারে উমরার তাওয়াফ করবে ও সায়ী করবে। এরপর মাথা মুণ্ডাবে অথবা মাথার চুল ছোট করে নিবে। কুরবানীর পশু সঙ্গে না থাকলে মাথা কামানো অথবা চুল ছাটার পর হালাল হয়ে যাবে। এর পর হালাল অবস্থায়ই মক্কায় অবস্থান করবে। তারপর ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে। অবশ্য এর আগে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর ৮ তারিখেই মিনা গমন করবে এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করবে। রাত্রে সেখানেই অবস্থান করবে। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর আরাফায় গমন করবে। সূর্য মাথার উপর থেকে সামান্য হেলে যাওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফে আরাফা করবে।

১০ই যিলহজ্জের রাত মুযদালিফায় অতিবাহিত করবে এবং ফজরের নামায আউয়াল

www.pathagar.com

ওয়াক্তে আদায় করে দু'আ করতে থাকবে। সূর্যোদয় হতে দুই রাক'আত পরিমাণ সময় বাকী থাকতে মুযদালিফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। রওয়ানার পূর্বে এখান থেকে ৭০টি কংকর সাথে নিয়ে নিবে। যাওয়ার সময় 'বতনে মুহাস্সার' দ্রুত অতিক্রম করবে। মিনায় এসে জামরায়ে আকাবায় রমী করবে। এরপর কুরবানী করবে। তারপর ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করবে। এ তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। কিন্তু ইযতিবা করবে না। তাওয়াফ শেষে এরপর সায়ী করবে অথবা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করবে এবং প্রত্যহ সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামরাত্রয়ে রমী করবে। মিনা হতে মক্কা আসার পথে সম্ভব হলে 'বতনে মুহাস্সাব' নামক স্থানে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করবে এবং এখানে কিছু সময় বিশ্রাম করে মক্কা অভিমুখে চলতে থাকবে। যদি এই পরিমাণ সময় অবস্থান করা সম্ভব না হয় তবে কিছুক্ষণ হলেও এখানে অবস্থান করবে। তারপর মক্কা মুকাররমা হতে রওয়ানা হওয়ার সময় বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করবে। বিস্তারিত মাস'আলা হজ্জে ইফরাদের বিবরণে দেখে নিতে হবে।

যদি তামাত্তু আদায়কারীর সাথে দমে তামাত্তু থাকে তবে উমরার পর মাথা মুণ্ডাবে না। বরং ইহ্রামের অবস্থায় থেকে যাবে। এবং ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে। এরপর ৮ই যিলহজ্জ পুনরায় হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### হজ্জে তামাত্তুর শর্তসমূহ

হজ্জে তামাত্তু শুদ্ধ হওয়ার জন্য ১১টি শর্ত রয়েছে ঃ

১. উমরার পূর্ণ তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাস সমূহে সম্পন্ন করা। হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে উমরার ইহ্রাম বাঁধাতে কোন ক্ষতি নেই।

২. হজ্জের ইহ্রামের আগে উমরার ইহ্রাম বাঁধা।

৩. হজ্জের ইহ্রামের পূর্বে উমরার পূর্ণ তাওয়াফ বা অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

৪. উমরা ফাসিদ না করা।

৫. হজ্জ ফাসিদ না করা।

৬. উমরা শেষ করে হালাল হওয়ার পর আফাকী ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে না আসা।

৭. উমরার পূর্ণ তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ এবং হজ্জ একই সফরে সম্পন্ন করা। কেউ যদি তাওয়াফ পূর্ণ করার আগে বাড়ীতে চলে আসে তারপর পুনরায় মক্কা গমন করে হজ্জ সমাপন করে তবে প্রথম সফরে অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করে থাকলে সে মুতামাত্তি হবে না। আর যদি অধিকাংশ তাওয়াফ পরের সফরে আদায় করে থাকে তবে মুতামাত্তি হিসাবে গন্য হবে।

৮. হজ্জ এবং উমরা একই বছর সম্পন্ন করা। কেউ যদি হজ্জের মাস সমূহে এক বছর উমরার তাওয়াফ আদায় করে এবং অন্য বছর হজ্জ সম্পন্ন করে তবে উক্ত ব্যক্তি মুতামাত্তি হিসাবে গন্য হবেনা। যদিও বাড়ীতে ফিরে না আসে অথবা দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত পূর্বের ইহ্রামে

www.pathagar.com

অবস্থায় থাকে, তবুও তা হজ্জে তামাত্তু সহীহ্ হবে না।

৯. হজ্জের মাস সমূহে উমরা আদায় করে মক্কা মুকাররামাকে স্থায়ী আবাসস্থল না বানানো। সুতরাং কেউ যদি উমরা আদায় করার পর মক্কা শরীফে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সংকল্প নেয় তবে সে মুতামাত্তি হিসাবে গন্য হবে না। যদি একমাস দুই মাস বসবাসের সংকল্প করে এবং পরে হজ্জ করে তবে তার তামাত্তু সহীহ্ হবে।

১০. মক্কা শরীফে হালাল অবস্থায় অবস্থান কালে হজ্জের মাস সমূহের আগমন না করা। অথবা ইহ্রাম অবস্থান থেকে অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাস আসার পূর্বে না হওয়ায়।

১১. তামাত্তুর জন্য আফাকী অর্থাৎ মীকাতের বাইরে বসবাস কারী হওয়া শর্ত। মক্কা মুকাররমায় এবং মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী লোকদের জন্য তামাত্তু নেই (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হজ্জে তামাত্তু আদায়কারীর প্রকারভেদ

হজ্জে তামাত্তু পালনকারী দুই প্রকার ঃ

১. যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে যায় না।

২. যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যায়। উভয় প্রকার তামাত্তু পালনকারীই হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে উমরা পালন করবে। তারপর যারা কুরবানীর পশু সাথে করে এনেছে তারা ইহ্রাম খুলবে না। বরং ইহ্রামের অবস্থায় থেকে যাবে। এবং হজ্জের সময় হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে মুফরিদের ন্যায় হজ্জের সকর কাজ সম্পন্ন করবে। আর যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে আসেনি তারা উমরা আদায় করার পর ক্ষৌরকার্য করে হালাল হয়ে যাবে। তারপর হজ্জের সময় আসলে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে মুফরিদের ন্যায় হজ্জের সফল কাজ সম্পন্ন করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## হজ্জে তামাত্তুর মাসাইল

হজ্জে তামাত্তুর জন্য মীকাত হতে উমরার ইহ্রাম বাঁধা শর্ত নয়। কেউ যদি মীকাত অতিক্রম করে অথবা মক্কায় শরীফে পৌছে উমরার ইহ্রামে বাঁধে তবে তামাত্তু সহীহ্ হবে। কিন্তু বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে দম ওয়াজিব হবে। কেননা বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

এমনিভাবে তামাত্তু পালকারীর জন্য হরম হতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা শর্ত নয়। কেউ যদি হিল্ল অথবা আরাফা হতে হজ্জের ইহ্রাম বাধে তাহলেও তামাত্তু সহীহ্ হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় ও দম ওয়াজিব হবে। কেননা যারা মক্কায় মুকাররমা হতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে তাদের মীকাত হচ্ছে হরম। বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করলে দম অথবা পুনরায় মীকাতে এসে ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব হবে। তামাত্তু সহীহ্ হওয়ার জন্য হজ্জের মাস সমূহে উমরার ইহ্রাম বাঁধা শর্ত নয়। বরং উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জে মাসসমূহে সম্পাদন করা শর্ত। ইহ্রাম আগে বাঁধাতে কোন ক্ষতি নেই।

তামাত্তু হজ্জের জন্য নিয়্যত করা শর্ত নয়। বরং নিয়্যত ছাড়াই কেউ যদি তামাত্তুর শর্ত

www.pathagar.com

মুতাবিক হজ্জের মাসসমূহে হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করে তবে তার তামাত্তু সহীহ্ হয়ে যাবে। তামাত্তু পালন কারীর জন্য কারিনের ন্যায় দমে তামাত্তু ওয়াজিব।

১০ যিলহজ্জ জুমরাতুল উখরায় রমী করার পর দমে তামাত্তু আদায় করবে। যদি কেউ দম দিতে সক্ষম না হয় তবে দশটি রোযা রাখবে। কিরানের বর্ণনায় এবং বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

তামাত্তু পালনকারীর জন্য কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে যাওয়া উত্তম। যদি কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে যাওয়া ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রথমে উমরার ইহ্রাম বেঁধে এরপর কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি কুবানীর পশু গরু বা উট হয় তবে এর গলায় মালা বা হার পরাতে হবে। অর্থাৎ চামড়া টুকরা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদি রশিতে বেধে পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেবে।

কুরবানী পশু সঙ্গে আনয়নকারী ব্যক্তি উমরা শেষ করে মাথা মণ্ডন করবে না বরং ইহ্রামের হালতে অবস্থান করবে এবং ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজ সমুহ থেকে বিরত থাকবে। সে অবস্থায় যদি ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহের কোন কিছু করে বসে তার তাকে মাস'আলা অনুযায়ী ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

সেই ব্যক্তি ১০ই যিলহজ্জ রমী করার পর কুরবানী পশু যবাহ্ করবে। এরপর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে উমরা ও হজ্জ উভয় ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। তামাত্তু পালনকারী উমরার আদায় করার পর হালাল হয়ে গেলে সে হজ্জের পূর্বে আরো উমরা করতে পারবে। তামাত্তু পালনকারী হজ্জে ইহ্রাম হরম এলাকার যে কোন স্থান থেকে বাঁধতে পারবে। অবশ্য মসজিদে হারাম হতে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম।

তামাত্তু পালনকারী ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের ইহ্রাম বেধে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হজ্জের সায়ী করতে চাইলে, রমল ও ইযতিবা সহ একটি নফল তাওয়াফ সম্পন্ন করে সায়ী করে নিবে। এমতাবস্থায় পরে আর কোন সায়ী করতে হবে না। অন্যথায় তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করবে। তামাত্তু আদায়কারীর উপর তাওয়াফে কুদূম ওয়াজিব নয়। উমরা আদায় করার পর যত বেশী সম্ভব নফল তাওয়াফ করতে থাকবে (মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ)।

মুতামাত্তি এবং কারিনের উপর দমে তামাত্তু এবং দমে কিরান ওয়াজিব। কুরবানী করার দ্বারা এ দম আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

উপমহাদেশের হাজী সাহেবান যারা তামাত্তু হজ্জ আদায় করে তাদের অধিকাংশই কুরবানীর পশু সাথে করে আনে না তাই তাদের ক্ষেত্রে ঐ মুতামাত্তির বিধি-বিধানই প্রযোজ্য হবে। তাই বিষয়টির প্রতি খুব খিয়াল রাখতে হবে।

**এক নযরে হজ্জে তামাত্তু (যদি দমে তামাত্তু সাথে না থাকে)**

**১. উমরার ইহ্রাম শর্তও ফরয,**

**২. রমল সহ উমরার তাওয়াফ রুকন ও ফরয,**

**৩. উমরার সায়ী ওয়াজিব,**

www.pathagar.com

৪. মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছাটা ওয়াজিব

৫. ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা শর্ত ও ফরয

৬. উকূফে আরাফা রুক্‌ন ও ফরয

৭. উকূফে মুযদালিফা ওয়াজিব

৮. ১০ তারিখে জামরাতুল আকাবায় রমী ওয়াজিব

৯. দমে তামাত্তু ওয়াজিব

১০. মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছাটা ওয়াজিব

১১. তাওয়াফে যিযারত রুকন ও ফরয

১২. সায়ী ফরয

১৩. জামরাত্রয়ে রমী করা ওয়াজিব

১৪. বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব।

## হজ্জে কিরান

হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধে হজ্জ উমরা আদায় করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'হজ্জে কিরান' বলে।

হজ্জে কিরান আদায় করার নিয়ম হল, হজ্জের মাস সমূহে মীকাতে পৌছে অথবা এর পূর্বেই গোসল ইত্যাদি সেরে ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করে মাথা আবৃত অবস্থায় দুই রাক'আত নামায আদায় করবে। এরপর সালাম ফিরিয়ে মাথা অনাবৃত অবস্থায় কিব্‌লামুখী হয়ে বসবে এবং মনে মনে হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করে মুখে উচ্চারণ করে বলবে ঃ

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَ تَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ

কারিনের উমরার অবশিষ্ট আহ্‌কাম হজ্জে তামাত্তু আদায়কারীর উমরা আদায়ের মতই। প্রতিটিই বিষয়ই যথাস্থানে দেখে নিতে হবে। তবে কারিন উমরা সমাপনান্তে হালাল হবে না। কারিন ব্যক্তি মক্কা মুকাররমা পৌছে সেখানে প্রবেশ করার আদব সম্পর্কে খুব খিয়াল রাখবে। তারপর মসজিদুল হারামের আদব মুতাবিক বাবুস্‌ সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে এবং প্রথমে ইযতিবা ও রমল সহ উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করবে। তাওয়াফ শেষ করে তাওয়াফের নামায আদায় করবে এবং তারপর তিনবার তালবিয়া পাঠ করবে। এবং তালবিয়া শেষে সম্ভব হলে যমযমের পানি পান করবে। তারপর হজরে আসওয়াদে চুম্বন করে বাবুস্‌ সাফার পথে বের হয়ে উমরার সায়ী সম্পন্ন করবে।

সায়ীর পরই উমরার কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে হালাল হবে না এবং ক্ষৌরকার্যও করবে না। ইহ্‌রাম অবস্থায়ই থাকবে। সায়ীর পর তাওয়াফে কুদূম সম্পন্ন করবে। তাওয়াফে কুদূমের পর যদি হজ্জের সায়ী ও করার ইচ্ছা থাকে তবে এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা করবে। নতুবা করবে না। কিন্তু কারিনের জন্য তাওয়াফে কুদূমের পর সায়ী করা উত্তম। যদি তাওয়াফে

www.pathagar.com

কুদূমের পর সায়ী না করে তবে তাওয়াফ যিয়ারতের পর সায়ী করতে হবে।

কারিন ব্যক্তি উমরা এবং তাওয়াফে কুদূম আদায় করার পর ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করবে। তারপর ৮ই যিলহজ্জ মিনায় এবং ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতে যাবে। মিনা, আরাফা এবং মুযদালিফার আহ্‌কামের ক্ষেত্রে কিরান এবং ইফরাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এ সব স্থানে মুফরিদের মত যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করবে। এরপর ১০ই যিলহজ্জ মিনায় এসে শুধু জমরায়ে আকাবায় রমী করবে। তারপর দমে কিরান আদায় করে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করবে। উপরোক্ত কর্মসমূহ সম্পাদন করে কারিন হালাল হয়ে যাবে। স্ত্রী সহবাস, চুম্বন ও স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা ছাড়া অন্যান্য যেসব কাজ ইহ্‌রামের কারণে হারাম ছিল এখন হতে সবই তার জন্য জায়িয হয়ে যাবে।

এরপর যদি ১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করা যায় তবে তা সম্পন্ন করবে। ১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা উত্তম। তা না পারলে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত অবশ্যই সম্পন্ন করে নিতে হবে।

তাওয়াফে যিয়ারতের পর মিনায় ফিরে আসবে। এবং ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য হেলে যাওয়ার পর জমরাত্রয়ে রমী করবে। ১৩ তারিখেও যদি মিনায় অবস্থান করে তবে এ দিন ও দ্বিপ্রহরের পর জমরাত্রয়ে রমী করতে হবে। ১২ তারিখের পর কেউ যদি মক্কা চলে আসতে চায় তবে তাও জায়িয আছে। রমী, ক্ষৌরকার্য ও কুরবানীর আহ্‌কাম যথাস্থানে দেখে নিবে।

মিনা হতে মক্কায় আসার পথে সম্ভব হলে মুহাস্‌সাব উপত্যকায় যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করবে এবং সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে মক্কায় ফিরে আসবে। আন্যথায় যতটুকু সম্ভব এমনটি এক মুহূর্তের জন্য হলেও এস্থানে থামবে। এস্থানে অবস্থান করাও নামায আদায় করা মুস্তাহাব। এরপর মুফরিদের মত তাওয়াফে-বিদা ইত্যাদি সম্পন্ন করবে। এভাবে হজ্জে কিরান সম্পন্ন করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### হজ্জে কিরানের শর্তসমূহ

কিরান হজ্জ সহীহ্ হওয়ার জন্য সাতটি শর্ত রয়েছে ঃ

১. উমরার পূরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ আদায় করার আগেই হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা। কেউ যদি উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে তবে সে কারিন হতে পারবে না।

২. উমরা ফাসিদ করার পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা। সুতরাং যদি কেউ উমরা ফাসিদ হওয়ার পর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে তবে হজ্জে কিরান করা সহীহ্ হবেনা। বরং ইফরাদ হবে।

৩. উমরার পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ উকূফে আরাফার পূর্বে সম্পন্ন করা। কেউ যদি উমরার তাওয়াফ করার পূর্বেই উকূফে আরাফা করে তবে তার উমরা বাদ পড়ে যাবে। আইয়ামে তাশরীকের পর এর কাযা করতে হবে এবং এর জন্য একটি দম আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় এবং তাকে দমে কিরান আদায় করতে হবে না।

৪. হজ্জ এবং উমরাকে ফাসিদ না করা যদি কেউ উকূফ এবং উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তার তার কিরান হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং দমে

www.pathagar.com

কিরান তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু সাথে এনে থাকে তবে সে একে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

৫. উমরার পুরা তাওয়াফ অথবা এর অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাসসমূহে আদায় করা। কেউ যদি অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে আদায় করে তবে সে কারিন হিসাবে গন্য হবে না।

৬. আফাকী হওয়া অর্থাৎ হজ্জের মাস সমূহে মক্কায় অবস্থানকারী মুকীম না হওয়া। সুতরাং মক্কাবাসী লোকদের জন্য হজ্জে কিরান নেই। অবশ্য তাদের কেউ যদি হজ্জের মাস সমূহের মীকাতের বাইরে-যায় এবং হজ্জের মাস সমূহে মক্কায় পূর্বে আগমন করে তবে উক্ত ব্যক্তি হজ্জে কিরান আদায় করতে পারবে।

৭. হজ্জ ফাওত না হওয়া। কারো যদি হজ্জ ছুটে যায় তবে সে কারিন থাকবে না এবং তার উপর দমে কিরানও ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হজ্জে কিরানের মাসাইল

কিরানের জন্য হজ্জ এবং উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম মীকাত হতে বাঁধা শর্ত নয়। বরং মীকাতে শুধু যে কোন একটির ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। কেউ যদি মীকাতে শুধু উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে এবং পরে কিরানের ইচ্ছা করে তবে তাওয়াফের চার চক্কর সম্পন্ন করার পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে কারিন হিসাবে গন্য হবে। এমনিভাবে কেউ যদি মীকাতে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং তারপর কিরানের ইচ্ছা করে তবে উকূফে আরাফার আগে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে কারিন হিসাবে গন্য হবে। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা মীকাত হতেই এক সঙ্গে উভয়ের ইহ্‌রাম বাঁধা সুন্নাত।

কেউ যদি উমরার তাওয়াফ করার পর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে অথবা উকূফে আরাফার পর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে তবে সে কারিন হিসাবে গন্য হবে না। কারিনের উপর ১০ তারিখে জামরাতুল আকাবায় রমী করার পর দমে কিরান আদায় করা ওয়াজিব। একে দমে মুক্‌রও বলা হয়। দমে কিরানের শর্তাবলী ঠিক কুরবানীর শর্তাবলীর অনুরূপই।

কারিনের জন্য দমে কিরানের গোশ্‌ত খাওয়া জায়িয। কুরবানীর গোশ্‌তের মত এক তৃতীয়াংশ ফকীর মিস্‌কীনদেরকে প্রদান করা মুস্তাহাব। বাকী এক তৃতীয়াংশ বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বন্টন করবে এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ নিজের আহার করবে অথবা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবে। এই কুরবানীর গোশ্‌ত সাদাকা করা ওয়াজিব নয়। দমে কিরানের মধ্যে নিয়্যত করা জরুরী। নিয়্যত ছাড়া দমে কিরান আদায় হবে না। দমে কিরান ওয়াজিব হওয়ার জন্য পশু অথবা এর মূল্যের উপর সক্ষম হওয়া এবং কারিনের আকিল, জ্ঞানবান, বালিগ ও আযাদ হওয়া শর্ত। গোলামের উপর দমের পরিবর্তে রোযা ওয়াজিব হবে।

হরমের সীমানার অভ্যন্তরে দমে কিরান যবাহ্ করা জরুরী। কেউ যদি হরমের বাইরে অন্য কোথাও যবাহ্ করে তবে দমে কিরান আদায় হবে না। এমনি ভাবে এ যবাহ্ আইয়ামে নাহ্‌র অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ হতে ১২ই যিলহজ্জের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। উক্ত দিবস সমূহের পূর্বে যবাহ্ করা জায়িয নয়। পরে করলে জায়িয হবে। কিন্তু এতে ওয়াজিব তরক হবে।

www.pathagar.com

১০ই যিলহজ্জ সবুহে সাদিকের পর হতেই যবাহ্ করা জায়িয। অবশ্য সূর্যোদয়ের পর যবাহ্ করা সুন্নাত। কারিনের জন্য রমী এবং ক্ষৌরকার্যের মধ্যবর্তী সময়ে যবাহ্ করা ওয়াজিব। মক্কা মুকাররমা এবং হরম শরীফের যে কোন জায়গায় যবাহ্ করা জায়িয। কিন্তু মিনায় যবাহ্ করা সুন্নাত। কারিন বা মুতামাত্তি যদি কুরবানী করার পূর্বে মারা যায় তার যবাহ্ করার অসিয়্যত করা তার উপর ওয়াজিব। অসিয়্যত করে গেলে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে তা পূরা করতে হবে। অসিয়্যত না করে গেলে ওয়ারিসদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তারা যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে যবাহ্ করে দেয় তবে মৃত ব্যক্তি দমে কিরান হতে মুক্ত হয়ে যাবে।

কারিনের জন্য যথাক্রমে রমী, যবাহ্ এবং ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রথমে রমী তারপর যবাহ্ এবং এরপর ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের ক্ষেত্রে ক্রমানুবর্তিতা ওয়াজিব নয়। যদি কেউ পূর্বোক্ত তিন কাজের পূর্বে অথবা পরে অথবা মাঝখানে তাওয়াফ সম্পন্ন করে তবুও জায়িয হবে। তবে ক্ষৌরকার্যের পর তাওয়াফে যিয়ারত করা সুন্নাত। মুফরিদের জন্য যবাহ্ ওয়াজিব নয়। কিন্তু রমী, এবং ক্ষৌরকার্যের মধ্যে তার জন্যও ক্রমানুবর্তিতা রক্ষা করা ওয়াজিব। ঈদের কুরবানী দমে কিরান বা দমে তামাত্তুর স্থলাভিষিক্ত হবে না।

ঈদের কুরবানী স্থানীয় লোকদের উরপ ওয়াজিব। মুসাফিরের উপর ওয়াজিব নয়। বিদেশী কোন লোক যদি মক্কা মুকাররমায় পৌছে ১৫দিন অবস্থানের নিয়্যত করে তবে তার উপরক্ত ঈদের কুরবানী ওয়াজিব হবে।

## দমে কিরান আদায় করতে অক্ষম হলে

যদি কারিনের নিকট এ পরিমাণ টাকা পয়সা না থাকে যে, দম খরীদ করার পর উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা সে বাড়ী পৌছতে পারে এবং তার নিকট কোন পশুও না থাকে তবে দমের পরিবর্তে তাকে দশ দিন রোযা রাখতে হবে। এর মধ্যে তিনটি ১০ই যিলহজ্জের পূর্বে রাখবে। বাকিগুলো বিরতি দিয়ে রাখাও জায়িয। কিন্তু বিরতিহীনভাবে রাখা উত্তম। এই তিন রোযা ৭, ৮ ও ৯ই যিলহজ্জ তারিখে রাখা উত্তম। কিন্তু যদি রোযা রাখলে দূর্বল হয়ে পড়ার এবং উকূফে আরাফায় ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে। তবে ৯ই যিলহজ্জের পূর্বে রোযা রাখা উত্তম। বরং এ ধরণের লোকদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মাক্রূহ। অবশিষ্ট সাতটি রোযা আইয়ামে তাশরীক অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কা মুকাররমায় অথবা অন্য যে কোন জায়গায় রাখতে পারবে। তবে বাড়ী এসে রাখাই উত্তম। এ সাতটি রোযাও ভিন্ন ভিন্নভাবে রাখা জায়িয। তবে একটানা রাখা উত্তম। কিন্তু আইয়ামে তাশরীকের সময় এ রোযা রাখা জায়িয নেই। দমে কিরানের পরিবর্তে যে দশ দিন রোযা রাখার বিধান রয়েছে এর প্রথম তিনটি সহীহ্ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে ঃ

১. এ রোযাগুলো হজ্জ এবং উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর রাখতে হবে। ইহ্রামের পূর্বে রাখা জায়িয নয়।

২. এ রোযা হজ্জের মাসসমূহে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

৩. দশই যিলহজ্জের পূর্বে রাখতে হবে।

৪. এ রোযার নিয়্যত রাত্র অবস্থায়ই করতে হবে।

৫. কুরবানী দিন পর্যন্ত কুরবানী করতে না পারার অক্ষমতা বাকী থাকতে হবে।

যদি কেউ রোযা তিনটি প্রথম দশ দিনের মধ্যে রাখতে না পারে এবং ৯ই যিলহজ্জ অতিবাহিত হয়ে যায় তকে সে আর রোযা রাখতে পারবে না। এ অবস্থায় সে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরে দু'টি দম আদায় করবে। একটি হজ্জে কিরানের জন্য আর অপরটি যবহের পূর্বে হালাল হওয়ার কারণে। কেউ যদি দম আদায় করতে অপারগ হওয়ার পর রোযা রাখতে আরম্ভ করে আইয়ামে নহরের পূর্বে অথবা আইয়ামে নহরের মধ্যে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করার আগে দম আদায় করতে সক্ষম হয়, তেব তার রোযা রাখার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। রোযা রাখা যথেষ্ট হবে না। বরং পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি আইয়ামের নহরের পরে অথবা আইয়ামে নহরের মধ্যে মাথা মুণ্ডানো পর দম আদায় করতে সক্ষম হয় তবে তার অবশিষ্ট সাতটি রোযা রাখতে হবে। পুনঃরায় দম দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি প্রথম তিনটি রোযা রাখে এবং আইয়ামে নহর অতিবাহিত হওয়ার পর হালাল না হয় অতঃপর দম আদায় করতে সক্ষম হয় এমতাবস্থায় ও তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। রোযা রাখাই যথেষ্ট হবে। পরবর্তী সাতটি রোযা সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হল, রাত্রেই রোযার নিয়্যত করতে হবে এবং এই দম রোযার প্রথম তিনটি ১০ই যিলহজ্জের আগে সম্পন্ন করতে হবে।

মক্কা, মীকাত এবং হিল্ল এর অধিবাসীদের জন্য হজ্জে কিরান নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে মক্কায় বসবাস করে তার জন্যও হজ্জে কিরান জায়িয নয়। অবশ্য যদি এ সব লোক হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে মীকাতের বাইরে কোথাও গমন করে এবং ফিরার সময় হজ্জে কিরান আদায়ের নিয়্যত করে তবে জায়িয হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**এক নযরে হজ্জে কিরান**

**১. হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম শর্ত ও ফরয**

**২. উমরার তাওয়াফ রুকন ও ফরয**

**৩. উমরার সায়ী ওয়াজিব**

**৪. তাওয়াফে কুদূম সুন্নাত**

**৫. সায়ী ওয়াজিব**

**৬. উকূফে আরাফা রোকন ও ফরয**

**৭. উকূফে মুযদালিফা ওয়াজিব**

**৮. ১০ই যিলহাজ্জ জামরায়ে আকাবায় রমী করা ওয়াজিব**

**৯. দমে ওয়াজিব**

**১০. মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছাটা ওয়াজিব**

**১১. তাওয়াফে-যিয়ারত রুকন ও ফরয**

www.pathagar.com

১২. জামরাত্রয়ে রমী করা ওয়াজিব

১৩. তাওয়াফে-বিদা ওয়াজিব।

### দু'আ কবূলের স্থানসমূহ

মক্কা শরীফের সব জায়গায়ই দু'আ কবূল হয়। কিন্তু কোন কোনস্থানে বিশেষভাবে দু'আ কবূল হয়ে থাকে বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এ সকল স্থানে ইহ্‌তিমামের সাথে দু'আ করা উচিত। যেমন ঃ

১. বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে নযর পড়ার সময়,

২. মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফ করার জায়গায়,

৩. মুল্‌তাযাম অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র দরজা এবং হজরে আসওয়াদের মাঝখানে অবস্থিত জায়গায়,

৪. মীযাবে রহমতের নীচে,

৫. বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে,

৬. যমযম কূপের নিকটে,

৭. মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে

৮. সাফা পাহাড়ের উপরে,

৯. মারওয়া পাহাড়ের উপরে,

১০. মাস'আ অর্থাৎ সায়ী করার স্থানে, বিশেষভাবে সবুজ স্তম্ভ দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে,

১১. আরাফার ময়দানে,

১২. মুয্‌দালিফা, বিশেষভাবে মাশ'আরুল হারামে,

১৩. মিনায়,

১৪. জামরাতের নিকটে,

১৫. হাতীমের ভিতরে,

১৬. হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামনীর মাঝখানে, আলিম দারে আরকাম, নবী (সা.)-এর জন্মস্থান, হযরত খাদীজা (রা.)-এর গৃহ, রুকনে ইয়ামনী, গারে সাওর, গারে হেরা, বায়তুল্লাহ্ শরীফের সেই বন্ধ দরজা যা বর্তমান দরজার বিপরীত দিকে ছিল, প্রভৃতি স্থান সমুকেও দু'আ কবূলের স্থান হিসাবে গন্য করেছেন।

### মক্কা শরীফের পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত

হাদীসে মক্কা মুকাররমার বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ ধরণের বরকতে রয়েছে বলে আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কাজেই হজ্জের এ মুবারক সফরে আমলের মধ্যে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না হলে সুযোগ মত ঐ জায়গাসমূহ

www.pathagar.com

যিয়ারত করা খুবই ভাল।

১. হযরত খাদীজা (রা.)-এর গৃহ। হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এখানেই বসবাস করতেন এবং হযরত ফাতিমা (রা.)ও এখানেই জন্মগ্রহন করেছেন। কোন কোন আলিমের মতে এ গৃহটি মসজিদুল হারামের পরে মক্কা মুকাররমার সর্বোত্তম স্থান।

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্মস্থান যা শি'আবে আলীতে অবস্থিত।

৩. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর গৃহ এখানে দু'টি পাথর ছিল। একটির নাম মুতাকাল্লিম (কথক)। এ পাথরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে সালাম করেছিল। আর অপটির নাম হচ্ছে মুত্তাকা (হেলানাইল) এ পাথরটির উপর নবী (সা.) হেলান দিয়েছিলেন।

৪. হযরত আলী (রা.) এর জন্মস্থান যা শি'আবে বনী হাশিমে অবস্থিত।

৫. দারে আরকাম। এই ঘরেই হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ স্থানটিকে সাফা ও মারাওয়ার অন্তর্ভূক্ত।

৬. জান্নাতুল মুআ'ল্লার যিয়ারত। এই স্থানটি হচ্ছে মক্কা মুকাররমার কবর স্থান। এই কবর স্থানটি জান্নাতুল বাকীর কবরস্থান ব্যতীত সকল কবর স্থান হতে উত্তম। এর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। এখানে সাহাবা, তাবিঈন এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের কবর রয়েছে। যিয়ারতে সময় সুন্নাতের খেলাপ কোন কাজ করবে না।

কবরস্থানে পৌছে এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ

তারপর সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম শেষ অংশ, সূরা ইয়াসীন, সূরা কাওসার ও সূরা ইখ্লাস ১২ অথবা ১১ অথবা ৭ অথবা ৩ বার পাঠ করে এইভাবে সাওয়াব পৌছাবে যে, হে আল্লাহ্ আমি যা কিছু পাঠ করেছি এর সাওয়াব এ কবর স্থানে যারা শায়িত আছেন তাঁদের রুহ্ মুবারকে পৌছিয়ে দিন।

৭. জাবালে সাওর। ইহা মক্কা মুকাররমা হতে তিন মাইল দুরে অবস্থিত। হিজরতের সময় এই পাহাড়েই নবী করীম (সা.)-এর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তিন রাত অবস্থান করেছিলেন। এর চূড়ায় গারে সাওর অবস্থিত। এ পর্বতের উচ্চতা প্রায় দেড় মাইল।

৮. গারে-হেরা, এ পর্বতটি মক্কা মুকাররমা হতে মিনায় যাওয়ার পথে বাম দিকে অবস্থিত। উক্ত গুহায় নবী করীম (সা.) নবূওয়াত লাভের পূর্বে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। এখানেই সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল।

৯. জাবালে আবী কুবাইস। এই পাহাড়টি বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মুখে অবস্থিত। কারো কারো মতে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়েছিল। মুজাহিদ (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সাত্তর পাহাড়ের পূর্বে পৃথিবীর বুকে উক্ত পাহাড়টি সৃষ্টি করেছেন। হযরত নূহ্ (আ.)-এর মহা প্লাবনের পর হতে এখানেই হজরে আসওয়াদ সংরক্ষিত ছিল (মুকাদ্দামায়ে হিদায়া)।

www.pathagar.com

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# মীকাত ও ইহ্‌রাম

'মীকাত' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ নির্দিষ্ট সময় বা স্থান। হরম সীমায় প্রবেশে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য ইহ্‌রাম ছাড়া যে স্থান অতিক্রম করা জায়িয নয় শরী'আতের পরিভাষায় সে স্থানকে 'মীকাত' বলে।

মীকাত তিন প্রকার ঃ

১. আপাকী লোকদের মীকাত,

২. হিল্লী লোকদের মীকাত,

৩. হরমী লোকদের মীকাত। নিম্নে এর বিবরণ প্রদত্ত হল।

### হিল্লী ও হরমী লোকদের হজ্জ ও উমরার মীকাত

হিল্লী অর্থাৎ মীকাতের ভেতরে তবে হরমের এলাকার বাইরে বসবাসকারী লোকদের মীকাত ভিন্ন এবং হরমী অর্থাৎ হরমের চৌহদ্দীতে বসবাসকারী লোকদের মীকাত ভিন্ন।

যারা মীকাতের ভেতরে এবং হরমের এলাকার বাইরে বসবাস করে তাদের মীকাত সমগ্র হিল্ল এলাকা। অর্থাৎ হরমের চৌহদ্দীর বাইরের এলাকা। কাজেই হজ্জ ও উমরার জন্য তারা হিল্ল হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে। তবে তাদের নিজ নিজ বাড়ী হতে ইহ্‌রাম বাঁধা সবচেয়ে উত্তম। আর যারা হরম এলাকার ভেতরে বসবাস করে তাদের হজ্জের ইহ্‌রামের মীকাত সমগ্র হরম এলাকা এবং উমরার ইহ্‌রামের মীকাত সমগ্র হিল্ল এলাকা। যদি মক্কার কোন অধিবাসী মীকাতের বাইরে গমন করে তাহলে প্রত্যাবর্তন কালে বর্হিবিশ্বের লোকদের ন্যায় তাদের জন্যও মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব।

### আফাকী লোকদের মীকাত

আফাকী অর্থাৎ মীকাতের বাইরে বসবাসকারী লোকদের মীকাত পাঁচটি। যথা -

১. যুল-হুলায়ফা বা বীরে আলী – এ স্থানটি মদীনাবাসী এবং এই পথে মক্কা শরীফে আগমনকারী লোকদের মীকাত।

২. যাতু-ইর্‌ক – এ স্থানটি ইরাকবাসী এবং এই পথে মক্কায় আগমনকারী লোকদের মীকাত।

৩. জুহাফা – এ স্থানটি সিরিয়াবাসী এবং এই পথে মক্কায় আগমনকারী লোকদের মীকাত।

৪. কর্‌ন – এ স্থানটি নজদবাসী এবং এই পথে মক্কায় আগমনকারী লোকদের মীকাত।

www.pathagar.com

৫. ইয়ালামলাম – এ স্থানটি ইয়ামনবাসী এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত উপমহাদেশ সহ প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য হতে যারা এই পথে হজ্জ করতে যায় তাদের মীকাত। আকাফী লোকদের জন্য উপরোক্ত স্থানসমূহ বিনা ইহ্‌রামে অতিক্রম করা জায়িয নেই। যারা মীকাতের বাইরে বসবাস করে তারা যদি মক্কা ও হরম শরীফে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে অথবা ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে গমন করে তবে সর্বাবস্থায়ই মীকাতে অতিক্রমের পূর্বে তাদের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে মীকাতের পূর্বে নিজ বাসস্থান হতে ইহ্‌রাম বেঁধে নেওয়া উত্তম।

স্থলপথে অথবা সমুদ্রপথে মক্কা শরীফে আগমনকারী ব্যক্তির সম্মুখে যদি উল্লেখিত মীকাত সমূহের কোন একটিও না পড়ে তবে বর্ণিত মীকাত সমূহের যে কোন মীকাতের সমরেখা বা বরাবর স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। যদি কারো পথে দু'টি মীকাত পড়ে তবে প্রথম মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। অবশ্য দ্বিতীয় মীকাত পর্যন্ত ইহ্‌রামকে বিলম্বিত করাও জায়িয। এতে দম ওয়াজিব হবে না। যদি পথে দুই মীকাতের সমরেখা সামনে পড়ে তবে প্রথম মীকাতের সমরেখা হতে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। যদি যাত্রা পথে একটি মীকাত এবং অন্য একটি মীকাতের সমরেখা অতিক্রম করতে হয় তাহলে প্রথম মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মীকাতের সমরেখা ধর্তব্য হবে না।

কেউ যদি এমন পথে সফর করেন যে পথে নির্ধারিত কোন মীকাত সামনে পড়ে না; তাহলে তাকে মীকাতের সমরেখা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা জানতে সক্ষম না হয় তবে নিজে এর সমরেখা জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে তাহাররী বা চিন্তা ভাবনা করবে। যখন প্রবল ধারণা হবে যে, অমুক স্থান হতেই সমরেখা আরম্ভ হয়েছে তখন সে স্থান হতেই ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। তাহাররী বা চিন্তা ভাবনা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন এ সম্বন্ধে জ্ঞাত কোন মানুষ না পাওয়া যায়। যদি জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোক পাওয়া যায় তবে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া ওয়াজিব। যদি কেউ মীকাতের সমরেখার ব্যাপারে অবগত না থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোকও না পায় এমতাবস্থায় মক্কা শরীফের দুই মঞ্জিল দূর হতে ইহ্‌রাম বাঁধা তার উপর ওয়াজিব।

যদি মক্কার বাইরের কোন লোক মক্কায় পৌছে উমরা সমাপন করত হালাল হয়ে যায় তবে তার মীকাত মক্কাবাসীদের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ হজ্জের জন্য হরম এলাকা এবং উমরার জন্য হিল্ল এলাকা। এ অবস্থায় তানঈম হতে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম

যদি আফাকী অর্থাৎ মীকাতের বাইরে বসবাসকারী কোন প্রাপ্তবয়স্ক স্থির মস্তিষ্ক মুসলমান মক্কা শরীফ বা হরমে প্রবেশ করতে চায় হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে হোক অথবা ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে হোক যদি সে বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করে চলে যায় তবে গুনাহ্‌গার হবে। এমতাবস্থায় তার জন্য পুনরায় মীকাত ফিরে আসা ওয়াজিব। যদি ফিরে না আসে বরং মীকাত অতিক্রমের পর যে স্থানে অবস্থান করছে যদি ফিরে না আসে বরং সেখান থেকেই যদি ইহ্‌রাম বেধে নেয় তবে তার উপর দম (পশু কোরবানী) ওয়াজিব হবে। অবশ্য

www.pathagar.com

যদি মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধে আসে তাহলে আর দম দিতে হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করে এবং সামনে গিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধে অতঃপর মক্কায় পৌঁছবার আগেই আবার মীকাতে ফিরে আসে এবং তালবিয়া পাঠ করে তবে দম কুরবানী মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু মীকাতে তালবিয়া পাঠ না করলে দম মাফ হবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার পরে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং মক্কায় প্রবেশ করে অতঃপর হজ্জের কোন কাজ শুরু করার পূর্বে পুনরায় আবার মীকাতে ফিরে এসে তালবিয়া পাঠ করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ মীকাতে ইহ্‌রাম না বেঁধে সামনে গিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধে তবে পুনরায় মীকাতে ফিরে আসার মত পর্যাপ্ত সময় থাকলে হজ্জ অনাদায়ী থাকার আশংকা না থাকলে এবং জান মালের ক্ষয় ক্ষতির কোন ভয় না থাকলে তার উপর ওয়াজিব হবে মীকাতে ফিরে এসে তালবিয়া পাঠ করা। যদি ফিরে না আসে তাহলে সে গুনাহ্‌গার হবে। তাওবা করতে হবে এবং একটি দম দিতে হবে। অনুরূপ কেউ যদি মীকাত অতিক্রম করে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং এরপর মীকাতে ফিরে না আসে অথবা হজ্জের কিছু কাজ সম্পাদন করার পর মীকাতে ফিরে আসে তবে তার উপরও দম ওয়াজিব হবে। যদি কেউ বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করে তবে তার উপর ঐ মীকাতেই পুনরায় ফিরে আসা ওয়াজিব নয়। বরং যে কোন মীকাতে প্রত্যাবর্তন করাই যথেষ্ট। অবশ্য যে মীকাত অতিক্রম করে এসেছে ঐ মীকাতে প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি মীকাতের বাইরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে মীকাত ও হরমের মধ্যস্থিত হিল্ল এলাকায় গমন করার ইচ্ছা করে এবং মক্কায় প্রবেশ করা অথবা হজ্জ বা উমরা পালন করার নিয়্যত না করে তবে তার জন্য মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব নয়। সেখানে পৌঁছার পর উক্ত ব্যক্তিও সেখানকার অধিবাসীদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং সেখান থেকে বিনা ইহ্‌রামে মক্কায় গমন করতে পারবে। এতে দম ওয়াজিব হবে না। উক্ত ব্যক্তি যদি সেখান থেকে হজ্জ বা উমরা পালন করতে চায় তবে সেখানকার লোকদের মীকাত হতে অর্থাৎ হিল্ল হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

মীকাতের বাইরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি ইহ্‌রাম ব্যতীত হরম শরীফে অথবা মক্কা শরীফে প্রবেশ করে তবে তার উপর একটি হজ্জ অথবা একটি উমরা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যতবার বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করবে ততবারই একটি হজ্জ বা একটি উমরা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মক্কা মুকাররমা কিংবা হরম শরীফে বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করার কারণে যে হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হয় তা আদায় করলে এর দ্বারা নিয়্যত ছাড়াই ফরয হজ্জ অথবা মানতের হজ্জ ও উমরা আদায় হয়ে যায়। শর্ত হল উক্ত হজ্জ বা উমরা সে বছরই আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি ঐ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তার জন্য স্বতন্ত্র হজ্জ অথবা উমরা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

যে লোক মীকাত ও হরমের মধ্যবর্তীস্থানে বসবাস করে সে যদি হজ্জ অথবা উমরার নিয়্যতে গমন করে তবে তার উপর ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। যদি হজ্জ অথবা উমরার নিয়্যত না করে থাকে তবে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব নয়। বিনা ইহ্‌রামেও মক্কা প্রবেশ করতে পারবে। হরম

www.pathagar.com

সীমার বাইরের লোক হজ্জ অথবা উমরা পালনের পর যদি হরমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তবে সে হরমবাসীদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে। হরেমের এলাকার কোন মানুষ যদি লাকড়ী বা ঘাস সংগ্রহের জন্য হিল্ল এলাকায় গমন করে তবে তাদের জন্য বিনা ইহ্‌রামে হরমের এলাকায় প্রত্যাবর্তন করা জায়িয আছে। আকাফী লোক যদি হরমের এলাকায় বসবাস করে তবে তাদের জন্যও হুকুম প্রযোজ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিনা ইহ্‌রামে মীকাতভুক্ত এলাকা অথবা হরমভুক্ত কোন এলাকায় প্রবেশ

আফাকী অর্থাৎ মীকাতের বাইরে বসবাসকারী কোন মুসলামন যদি হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ছাড় অন্য কোন উদ্দেশ্যেও হরমভুক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে চায় তবে মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা তার উপর ওয়াজিব। বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করলে তার উপর হজ্জ অথবা একটি উমরা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যে সব লোক মীকাতে অথবা মীকাত ও হরমের মধ্যস্থিত স্থান হিল্ল এ বসবাস করে তাদের যদি হজ্জ বা উমরার নিয়্যত না থাকে তবে তাদের জন্য বিনা ইহ্‌রামে মক্কায় ও হরমের এলাকায় প্রবেশ করা জায়িয। অনুরূপভাবে আফাকী লোক যদি হজ্জ বা উমরা সমাপনের পর উক্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে তবে তাদের ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ইহ্‌রাম

'ইহ্‌রাম' শব্দটি আরবী। আভিধানিক অর্থ হারাম যা নিষিদ্ধ করা। হজ্জ ও ওমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তিগণ যখন ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ অথবা উমরা পালন করার দৃঢ় নিয়্যতে তালবিয়া পাঠ করেন তখন তাদের উপর কতিপয় হালাল এবং মুবাহ্ কাজও ইহ্‌রামের কারণে হারাম হয়ে যায়। এ কারণে একে 'ইহ্‌রাম' বলা হয়। রূপক অর্থে ঐ চাদর দুটিকেও ইহ্‌রাম বলা হয় যা ইহ্‌রাম অবস্থায় ব্যবহার করা অপরিহার্য (কাওয়াইদুল ফিক্‌হ)।

## ইহ্‌রামের পূর্বে করনীয় কাজ

ইহ্‌রামের পূর্বে হাত ও পায়ের নখ কাটবে; গোঁফ ছোট করে নিবে, বগলের এবং নাভীর নীচের পশম মুণ্ডন করবে। অভ্যাস থাকলে মাথার চুল কামিয়ে ফেলবে। আর অভ্যাস না থাকলে চুল ছোট করে নিবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

## ইহ্‌রামের প্রকার ভেদ

ইহ্‌রাম চার প্রকার ঃ

১. শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম,

২. একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম,

www.pathagar.com

৩. হজ্জের মাসে মীকাত হতে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা সমাপন করে পুনরায় হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম,

৪. হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে বা পরে শুধু উমরার জন্য ইহ্‌রাম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম ও মাসনূন তরীকা

ক্ষৌরকার্য এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর সাবান দিয়ে উত্তমরূপে গোসল করা সুন্নাত। কোন কারণে গোসল করতে না পারলে ভালভাবে উযূ করে নিবে। হায়িয ও নিফাস ওয়ালী মহিলাও বালক নাবালিকের জন্যও গোসল করা মুস্তাহাব। এরপর সেলাই করা কাপড় খুলে সেলাইবিহীন একখানা চাদর পরিধান করবে এবং একখানা গায়ে দিবে। সাদা হওয়া মুস্তাহাব এবং তা নতুন হওয়া ভাল। নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে পুরাতন কাপড় ধৌত করে তা পরিধান করলেও সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করবে। কিন্তু কাপড়ে এমন কোন সুগন্ধি লাগাবে না যার রং কাপড়ে স্পষ্টভাবে অবশিষ্ট থাকে। এরপর ইহ্‌রামের নিয়্যতে দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করবে। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্‌লাস পাঠ করা উত্তম। অবশ্য সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা পাঠ করলেও চলবে।

এই নামায মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করবে না। সালামান্তে কিব্‌লামূখী অবস্থায় বসে বসেই মাথা উন্মুক্ত করে নিয়্যত করবে। যদি হজ্জের ইহ্‌রাম হয় তবে এভাবে নিয়্যত করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

হে আল্লাহ্ ! আমি হজ্জ পালন করার নিয়্যত করছি। এ কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন কবুল করুন।

যদি উমরার ইহ্‌রাম হয় তবে এভাবে নিয়্যত করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

হে আল্লাহ্! আমি উমরা আদয়ের নিয়্যত করছি। এ কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

যদি হজ্জ ও উমরার সম্মিলিত ইহ্‌রাম হয় তবে এভাবে নিয়্যত করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

হে আল্লাহ্! আমি হজ্জ ও উমরা পালন করার নিয়্যত করছি। এই দু'টির কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

যদি আরবী মনে না থাকে তবে বাংলায় নিয়্যত করলেও জায়িয হবে। এর পর উচ্চস্বরে তিনবার তালবিয়া পাঠ করবে ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

www.pathagar.com

আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীফ নেই আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসো ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

তালবিয়ার এ শব্দসমূহ থেকে কিছু কমানো যাবে না তবে বাড়ানো যাবে এবং তা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। বাড়িয়ে এভাবেও বলা যায় ঃ

لَبَّيْكَ اِلٰهُ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَ الرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অনুচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং আল্লাহ্র পাকের দরবারে দু'আ করবে। তালবিয়া পাঠ করার পর নিম্নের দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত চাই এবং তোমার ক্রোধ ও জাহান্নাম হতে পানাহ চাই।

নিয়্যত ও তালাবিয়া পাঠ করার পর ইহ্রাম বাঁধার কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। এরপর হতে ইহ্রামের অবস্থায় সে সব কাজ নিষিদ্ধ তা বর্জন করে চলতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড) ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

## ইহ্রাম বাঁধার জন্য উত্তম স্থান

ইহ্রামের অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ তাতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে মীকাতের পূর্বে নিজ বাসস্থান হতে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম। আর যদি আশংকা থাকে তবে মীকাত হতেই ইহ্রাম বাঁধা উত্তম।

হজ্জ আদায়ের পূর্বে যারা মদীনা শরীফ গমন করেন আগে তাদের জন্য মসজিদে যুল-হুলায়ফা হতে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম। মীকাত এলাকায় যদি কোন মসজিদ থাকে তবে সে মসজিদে নামায আদায়ের পর ইহ্রাম বাঁধা মুস্তাহাব।

## বিমান ও সামুদ্রিক জাহাজে ইহ্রাম বাঁধা

বিমান ও সামুদ্রিক জাহাজে বসেও ইহ্রাম বাঁধা জায়িয আছে। কেউ যদি বাড়ীতে ইহ্রাম না বাঁধে তবে মীকাতে পৌছার পূর্বেই ইহ্রাম বেঁধে নিবে। যাতে বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করতে না হয়। কেউ যদি স্থল ও সমুদ্রপথে সফররত অবস্থায় এমন পথ দিয়ে মক্কা শরীফ গমন করে যে পথে মীকাত সামনে পড়ে না তবে মীকাত সমূহের কোন এক মীকাতের সমরেখা হতে ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে যদি নিজের জানা না থাকে তবে যিনি জানেন এমন কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে ইহ্রাম বাঁধবে। যদি এরূপ কোন লোক না পাওয়া যায় তবে তাহাররী অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা করবে। চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী যে স্থান সম্বন্ধে সমরেখা হওয়ার প্রবল ধারণা হবে সে স্থান থেকেই ইহ্রাম বাঁধবে।

www.pathagar.com

## ইহ্‌রাম সহীহ্ হওয়ার শর্ত

ইহ্‌রাম সহীহ্ হওয়ার শর্ত মাত্র একটি। আর তা হল - নিয়্যত করা। সুতরাং নিয়্যত ছাড়া শুধু তালিবিয়া পাঠ করলে ইহ্‌রাম সহীহ্ হবে না। অনুরূপভাবে তালাবিয়া বা তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত কোন যিক্‌র অথবা হাদী প্রেরণ বা কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিধান করা ব্যতিরেকে শুধু নিয়্যত করা দ্বারা ইহ্‌রাম সহীহ্ হবে না। মোটকথা ইহরামের জন্য নিয়্যত ও তালবিয়া উভয়টিই জরুরী (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ইহ্‌রামের সুন্নাত ও মুস্তাহাব

ইহ্‌রামের সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ ঃ

১. হজ্জের মাসসমূহে ইহ্‌রাম বাঁধা,

২. ইহ্‌রামের নিয়্যতে ইহ্‌রামের পূর্বে গোসল ও উযূ করা,

৩. সেলাই বিহীন একখানা চাদর গায়ে দেওয়া এবং আর একখানা পরিধান করা,

৪. দুই রাক'আত ইহ্‌রামের নামায আদায় করা,

৫. তালবিয়া পাঠ করা,

৬. তিনবার তালবিয়া পাঠ করা,

৭. উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা,

৮. ইহ্‌রামের নিয়্যত করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা,

৯. ইহ্‌রামের পূর্বে উত্তমরূপে দেহের ময়লা পরিষ্কার করা,

১০. নখ কাটা,

১১. বগল পরিষ্কার করা,

১২. নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করা,

১৩. নতুন অথবা ধৌত করা সাদা চাদর পরিধান করা,

১৫. চপ্পল পায়ে দেওয়া,

১৬. মুখে ইহ্‌রামের নিয়্যত উচ্চারণ করা,

১৭. নামাযের পর বসা অবস্থায় নিয়্যত করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ইহ্‌রামের হুকুম

ইহ্‌রামের হুকুম হলো যে উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধা হয়েছে অর্থাৎ হজ্জ বা উমরা তা আদায় না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম খোলা যাবে না। যদি ইহ্‌রাম ভঙ্গ হওয়ার মত কোন কাজ হয়ে ও যায় তবু ও ইহ্‌রাম অবস্থাতেই বহাল থেকে হজ্জ ও উমরার অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

যদি ইহ্‌রাম বাঁধার পরে কোন কারণে হজ্জ পালন করতে না পারে তবে উমরা পালন করে হালাল হতে হবে। যদি কেউ ইহ্‌রাম বাঁধার পর হজ্জ পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে হরম এলাকায়

www.pathagar.com

কুরবাণীর পশু পাঠাতে হবে বা সেখানে কারো দ্বারা কুরবানী করাতে হবে। ঐ কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার পরে ইহ্রাম খুলতে পারবে।

**অসুস্থ ব্যক্তির ইহ্রাম**

যদি কোন ব্যক্তি ইহ্রাম বাঁধার সময় বেহুশ হয়ে পড়ে তবে তার সঙ্গীগণ নিজেদের ইহ্রাম বাঁধার আগে অথবা পরে বেহুশ ব্যক্তির পক্ষ হতেও ইহ্রামের নিয়্যত করে তালবিয়া পাঠ করবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এতে বেহুশ ব্যক্তির ইহ্রাম সহীহ্ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় বেহুশ ব্যক্তির পরিধানের স্বাভাবিক পোষাক খুলে তাকে ইহরামের কাপড় পরানোর প্রয়োজন নাই। বেহুশ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ইহ্রাম নির্দিষ্ট করে হজ্জে বা উমরার অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবে এবং ইহ্রামের কালীন নিষিদ্ধ কার্যসমূহ হতে বিরত থাকবে। আর যদি হুশ ফিরে না আসে তবে যে ব্যক্তি তার পক্ষ হতে ইহ্রামের নিয়্যত করেছিল সে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি তার পক্ষ হতে নিয়্যত করে উকূফে আরফা এবং তাওয়াফ ইত্যাদি আদায় করে তাহলে ঐ বেহুশ ব্যক্তির হজ্জ বা উমরা আদায় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ঐ বেহুশ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অপরিহার্য নয়। অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উত্তম। যে ব্যক্তি এমন সংজ্ঞাহীনের পক্ষ হতে তাওয়াফ ও সায়ী করবে তাকে নিজের তাওয়াফ ও সায়ী পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। উভয়ের পক্ষ হতে একই তাওয়াফ ও সায়ী যথেষ্ট হবে না। অবশ্য বেহুশ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে এক তাওয়াফ ও এক সায়ী করলে তা উভয়ের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে বেহুশ ব্যক্তির জন্য আলাদাভাবে তাওয়াফের নিয়্যত করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইহ্রামের অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ এমন কোন কাজ যদি বেহুশ ব্যক্তির দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে যায় তবে দম বা সাদাকা ঐ বেহুশ ব্যক্তির উপরই ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি তার পক্ষ হতে ইহ্রামের নিয়্যত করেছে তার উপর ওয়াজিব হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের ইহ্রাম বাঁধার পাশাপাশি কোন বেহুশ ব্যক্তির পক্ষ হতেও ইহ্রাম বাঁধে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যদি ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। একাধিক দম ওয়াজিব হবে না। ইহ্রাম বাঁধার পরে কেউ যদি বেহুশ হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় কেউ যদি তাকে আরাফাতে নিয়ে গিয়ে যথাসময়ে উকূফ করায় এবং তাওয়াফে-যিয়ারত করায় তবে তার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে যখন কেউ তাওয়াফ করাবে তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে তাওয়াফের নিয়্যত করা শর্ত। যদি কেউ এরূপ কোন ব্যক্তিকে কাঁধে উঠিয়ে তাওয়াফ করায় এবং নিজের পক্ষ হতেও তাওয়াফের নিয়্যত করে তবে উভয়ের জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট হবে।

যদি সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে বহনকারী ব্যক্তি নিজে হজ্জের তাওয়ফ করে এবং সংজ্ঞাহীনকে উমরার তাওয়াফ করায় তবে তাও জায়িয হবে। নিয়্যত বিভিন্ন হওয়াতে কোন অসুবিধা হবে না। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি যদি তার সঙ্গীদের বলে রাখে যে আমি যদি বেহুশ হয়ে পড়ি বা ঘুমিয়ে যাই তবে আমার পক্ষ থেকে উমক ব্যক্তি ইহ্রাম বাঁধবে এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি তার পক্ষ হতে ইহ্রাম বাঁধে তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির ইহ্রাম সহীহ্ হবে। নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর সে নিজে হজ্জের অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং ইহ্রামের অবস্থায় যে যে কাজ নিষিদ্ধ তা হতে বিরত থাকবে। আর যদি অসুস্থ ব্যক্তির অনুমতি ছাড়াই

www.pathagar.com

অপর কোন ব্যক্তি তার পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধে তবে অসুস্থ ব্যক্তির ইহ্‌রাম সহীহ্ হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের ইহ্‌রাম

অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন শিশু যদি নিজে ইহ্‌রাম বাঁধে অথবা তার পক্ষ হতে তার পিতা যদি ইহ্‌রাম বাঁধে তবে তার ইহ্‌রাম সহীহ্ হয়ে যাবে। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন শিশু বুদ্ধিমান বলে প্রতীয়মান হয় তবে সে নিজেই ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবে। পক্ষান্তরে সে যদি একান্তই অবুঝ হয় তবে তার পিতা তার পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং হজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান শিশু যদি হজ্জের কোন আমল ছেড়ে দেয় যেমন রমী ইত্যাদি তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে এ জাতীয় কোন শিশু যদি হজ্জের যাবতীয় কাজ ছেড়ে দেয় তবে তার উপর এর কাযাও ওয়াজিব হবেনা।

শিশুকে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত রাখা তার অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু কোন শিশু যদি এ জাতীয় কোন কাজ করে ফেলে তবে তার বা তার অভিভাবকের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। শিশুর পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধার পর তার শরীর হতে সেলাই যুক্ত কাপড় খুলে তাকে ইহ্‌রামের কাপড় পরিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুর পিতা তার পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধার পর যদি কোন নিষিদ্ধ কাজ করে তবে তার উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অভিভাবকগণের মধ্যে যে নিকটতম হবে সেই শিশুর সাথে থাকবে সেই শিশুর পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে। যেমন শিশুর পিতা ও বড় ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের চেয়ে শিশুর পিতাই তার পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে। তবে বড় ভাই বা অন্যারাও যদি ইহ্‌রাম বাঁধে তবে তাও জায়িয হবে। শিশুর উপর হজ্জ ফরয নয়। সুতরাং তার এ হজ্জ নফল হজ্জ হিসাবে পরিগণিত হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### মহিলাদের ইহ্‌রাম

মহিলাদের ইহ্‌রাম পরুষের ইহ্‌রামের মতই। শুধু পার্থক্য এই যে, মহিলাগণ ইহ্‌রামের অবস্থায় মাথা ঢেকে রাখবে মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখবে তালবিয়া অনুচ্চস্বরে পাঠ করবে।যেহেতু মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া জায়িয নেই। তাই তারা চেহারার সাথে লাগতে না পারে এমন কিছু কপালের উপর বেঁধে এর উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। মহিলাদের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় যেমন- জামা, কামীস, উড়না, মোজা, হাতমোজা ইত্যাদি পরিধান করা জায়িয। ইহ্‌রামের অবস্থায় মহিলাদের জন্য যাফরানী ও কুসুম রঙের কাপড় ব্যবহার করা জায়িয নেই। এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার করলে তা এমনভাবে ধৌত করে নিতে হবে যেন কোন ঘ্রাণ অবশিষ্ট না থাকে। মহিলাগণ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় ঋতুমতী থাকলে গোসল করে যথানিয়মে ইহ্‌রাম বাঁধবে। তবে ইহ্‌রামের নামায আদায় করবে না। নিয়্যত করে শুধু তালবিয়া পাঠ করবে।

মহিলাগণ তাওয়াফের সময় ইযতিবা ও রমল করবে না এবং সায়ী করার সময় সবুজ বাতি দু'টির মধ্যবর্তীস্থানে দৌড়িয়ে চলবেনা। বরং স্বাভাবিক গতিতে চলবে। তারা সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে আরোহন করবে না। অবশ্য ভীড় না থাকলে আরোহন করা জায়িয আছে।

www.pathagar.com

এভাবে পুরুষের ভীড়ের সময় তারা হজরে আসওয়াদে চুম্বন করতে যাবে না। এমন কি হাত দ্বারা স্পর্শও করবে না। মহিলাদের জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় রেশমের পোশাক এবং অলংকার ব্যবহার করা জায়িয।

মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা জায়িয নয়। তারা ইহ্‌রাম খোলার পর সমস্ত চুলের ঝুটি ধরে এর অগ্রভাগ হতে আঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ চুল নিজের হাতেই কেটে ফেলবে অথবা কোন মাহ্‌রাম ব্যক্তির দ্বারা কাটিয়ে নিবে। কোন বেগানা পুরুষকে দিয়ে কাটানো জায়িয নেই। মহিলাদের জন্য হায়িয নিফাসের অবস্থায়ও হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা জায়িয। শুধু তাওয়াফ নিষিদ্ধ। যদি ইহ্‌রামের পূর্বে হায়িয দেখা দেয় তাহলে গোসল করে ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবে। কিন্তু সায়ী এবং তাওয়াফ করবেনা। যদি হায়িয জনিত কারণে যথাসময় তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয় তবে এতে দম ওয়াজিব হবে না। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## নপংশুকদের ইহ্‌রাম

হজ্জের যাবতীয় হুকুম আহ্‌কামের ক্ষেত্রে নপংশুকদের বিধানও মহিলাদের মতই তাদের জন্য কোন বেগানা পুরয অথবা মহিলার সাথে এক থাকা জায়িয নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## পুরুষ ও মহিলার ইহ্‌রামে পার্থক্য

পুরুষ ও মহিলার ইহ্‌রামে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

১. পুরুষ লোকেরা মাথা অনাবৃত রাখবে এবং মহিলাগণ মাথা আবৃত রাখবে।

২. পুরুষদের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় না জায়িয কিন্তু মহিলাদের জন্য জায়িয।

৩. পুরুষের তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করবে আর মহিলাগণ অনুচ্চস্বরে পাঠ করবে।

৪. তাওয়াফে পুরুষ লোকেরা ইযতিবা ও রমল করবে কিন্তু মহিলাগণ তা করবে না।

৫. সায়ী করার সময় পুরুষ লোকেরা সবুজবাতি দু'টির মধ্যবর্তীস্থানে দ্রুতগতিতে চলবে কিন্তু মহিলাগণ নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে চলবে।

৬. ভীড়ের অবস্থায় পুরুষ লোকেরা যদি কাউকে কষ্ট না দিয়ে হজরে আসওয়াকে চুম্বন করতে পারে তবে চুম্বন করবে। কিন্তু মহিলাগণ এ অবস্থায়ও হজরে আসওয়াদে চুম্বন করবে না।

৭. পুরুষগণ সর্বাবস্থায় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহন করবে। কিন্তু ভীড় থাকলে মহিলাগণ উক্ত পাহাড়দ্বয়ে আরোহন করবে না।

৮. পুরুষগণ মাথা মুণ্ডন করবে কিন্তু মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো জায়িয নেই।

## ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সকল কাজ নিষেধ

১. ইহ্‌রামের অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা, স্ত্রীকে চুম্বন করা, কামোদ্দীপনা সহ তাকে স্পর্শ করা এবং সাথীদের সাথে ঝগড়া করা জায়িয নেই।

www.pathagar.com

২. এ অবস্থায় কোন স্থলজ প্রাণী শিকার করা এবং শিকারীকে কথা বাড়িয়ে বা আকার ইংগিতে শিকারের সন্ধান দেওয়া জায়িয নেই।

৩. শিকারীকে সাহায্য সহযোগিতা করা। যেমন- তাকে তীর, তরবারি, লাঠি, ছুরি, চাকু ইত্যাদি সরবরাহ করা জায়িয নেই।

৪. এমনিভাবে স্থলজপ্রাণী তাড়ান, এর ডিম ভাঙ্গা, পালক ও ডানা তুলে ফেলা, শিকারের দুগ্ধ দোহন করা, শিকারের ডিম অথবা গোশ্ত ভূনা করা।

৫. উকূন মারার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা অথবা মারার প্রতি ইংগিত করা ইত্যাদি কোন কিছুই জায়িয নেই।

৬. চুল দাঁড়িতে খেযাব লাগানো জায়িয নেই।

৭. তালবীদ অর্থাৎ মাথার চুলকে এক প্রকার আঠা জাতীয় পদার্থ দ্বারা এমনভাবে জমাটবদ্ধ করা যে চুল ঢাকা না পড়ে তবে তা মাক্রূহ হবে।

৮. অনুরূপভাবে সেলাই করা কাপড় যেমন-জামা, কাবা, পায়জামা, টুপি মোজা ইত্যাদি পরিধান করাও জায়িয নেই।

৯. যে জোতা পরিধান করলে পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড়টি ঢাকা পড়ে যায় তা ব্যবহার করা জায়িয নেই।

১০. পুরুষ লোকদের জন্য মাথা, মুখমণ্ডল এবং চিবুক আবৃত করা জায়িয নেই।

১১. সুগন্ধি ব্যবহার করা, নখ, চুল কাটা এবং কাউকে দিয়ে কাটানো জায়িয নেই। খুর বা চিমটা দ্বারা শরীরের পশম কাটা বা উঠানো জায়িয নেই।

১২. যাফরান অথবা কুসুম ইত্যাদি দ্বারা রঙ্গীন কাপড় ব্যবহার করা জায়িয নেই। অবশ্য যদি ঐ কাপড় এমনভাবে ধৌত করা হয় যে খুশবু দূরীভূত হয়ে যায় তাতে ঐ কাপড় পরিধান করা জায়িয হবে।

১৩. সাবান দ্বারা মাথার চুল দাঁড়ি ইত্যাদি ধৌত করা জায়িয নেই।

১৪. ইহ্রামের অবস্থায় মাথা চুলকানো জায়িয নেই। যদি বেশী আবশ্যক হয় তবে খুব আস্তে চুলকাবে যাতে চুল উৎপাটিত না হয় এবং উকূন ঝরে না পড়ে।

১৫. ইযখির ব্যতীত হরমের কোন গাছপালা কর্তন করা জায়িয নেই।

১৬. ইহ্রামের অবস্থায় কাপড় বা চাদর কাঁটা কিংবা গ্রন্থি দ্বারা আটকিয়ে রাখা জায়িয নেই।

১৭. তৈল ব্যবহার করা জায়িয নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, হিদায়া, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

## ইহ্রাম অবস্থায় যে সকল কাজ মাক্রূহ

শরীর থেকে ময়লা দূর করা, মাথা এবং দাঁড়ি চিরুনী দ্বারা আচড়ানো ও দাঁড়ি খিলাল করা মাকরূহ। কেউ যদি এমনভাবে দাঁড়ি খিলাল করে যে একটি দাড়িও পড়ে না তবে মাকরূহ হবে না। লুঙ্গির উভয় পাল্লাকে সামনের দিক থেকে সেলাই করা মাকরূহ। যদি সতর আবৃত করার

www.pathagar.com

জন্য কেউ এরূপ করে তবে এতে দম ওয়াজিব হবে না। চাদর গিরা দিয়ে কাঁধের উপর বাঁধা, চাদর অথবা লুঙ্গিতে গিরা দেওয়া, সুই বা পিন দ্বারা আটকানো মাকরূহ।

ইহ্রামের অবস্থায় সুগন্ধি স্পর্শ করা, ঘ্রাণ লওয়া, ঘ্রাণ লওয়ার জন্য সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে বসা, অথবা সুঘ্রাণ যুক্ত কোন ফল খাওয়া মাক্রূহ। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন সুগন্ধি নাকে এসে লাগে তাতে কোন অসুবিধা নেই। মাথা এবং মুখ ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশেও বিনা প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা মাক্রূহ। কা'বা শরীফের পর্দার নীচে এমনভাবে দাঁড়ানো যে পর্দা চেহারা ও মাথা ঢেকে যায় তবে মাকরূহ হবে। বালিশের উপর চেহারা রেখে উপুড় হয়ে শয়ন করা মাক্রূহ। জামা, জোব্বা ইত্যাদি শুধু কাঁধের উপর ফেলে রাখাও মাকরূহ। এমনকি আস্তিনের ভেতর হাত না ঢুকালেও মাকরূহ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ইহ্রামের অবস্থায় যে সকল কাজ জায়িয

প্রয়োজনের অবস্থায় শরীর শীতল করার জন্য অথবা শরীরের ধূলাবালি দূর করার জন্য ঠাণ্ডা কিংবা গরম পানি দ্বারা গোসল করা জায়িয। কিন্তু শরীরের ময়লা দূর করতে পারবে না। পানিতে ডুব দেওয়া, হাম্মাম খানায় প্রবেশ করা, কাপড় পবিত্র করা ও আংটি পরিধান করা জায়িয। টাকার থলি অথবা কোমরের বেল্ট লুঙ্গির উপর বা নীচে বাঁধা জায়িয। ঘর অথবা তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করা ছাতা এবং হাওদা অথবা অন্য কিছুর ছায়ায় বসা জায়িয।

আয়না দেখা, মিস্ওয়াক করা, দাঁত তুলে ফেলা, ভাঙ্গা নখ কেটে ফেলা, চুল বা পশম না উঠিয়ে শিঙ্গা লাগানো, সুরমা লাগানো, খৎনা করানো, ভাঙ্গা অঙ্গ ব্যাণ্ডেজ করা ইত্যাদি জায়িয। কলেরার ইনজেক্শন ও বসন্তের টিকা লওয়া জায়িয। লুঙ্গির মধ্যে টাকা পয়সা অথবা ঘড়ির রাখার জন্য পকেট লাগানো জায়িয। মাথা ও চেহারা ব্যতীত সারা দেহ আবৃত করা এবং কান, কাঁধ ও পা চাদর অথবা রুমাল দ্বারা ঢাকা জায়িয। হাঁড়ি, ডেকচি, রেকাবী, সজ্জি ইত্যাদি মাথায় করে বহন করা জায়িয। এমন কি স্থলজ শিকারের গোশত মুহরিমের জন্য খাওয়া জায়িয যা কোন গায়রে মুহরিম ব্যক্তি হিল্ল এলাকা হতে শিকার করে এনেছে এবং সেই তা যবাহ্ করেছে এবং এ শিকার ও যবাহ্ করার কোন প্রকার ক্ষেত্রে মুহরিম ব্যক্তির সাহায্য সহায়তা ইশারা ইংগিত ছিল না। উট, গরু, বকরী, মুরগী গৃহপালিত হাঁস যবাহ্ করা এবং এগুলোর গোশ্ত খাওয়া জায়িয। তবে বন্য হাঁস যবাহ্ করা জায়িয নেই।

ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা জায়িয। যেমন সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি। লং এলাচি এবং সুগন্ধিমুক্ত জর্দা ছাড়া পান খাওয়া জায়িয। লং এলাচি ও সুগন্ধিযুক্ত জর্দা দ্বারা পানি খাওয়া মাকরূহ। দাঁড়ি, মাথা এবং দেহে এমনভাবে চুলকানো জায়িয যাতে চুল দাড়ি বা পশম উঠে না যায়। মাসআলা মাসাইল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে আলোচনা করা জায়িয। তবে অহেতুক কোন প্রকার ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হওয়া সমীচীন হবে না। যদি কবিতার মধ্যে কোন গুনাহের কথা নেই তা আবৃত্তি করা জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

## ইহ্রামের অবস্থায় বিবাহ করা ও বিবাহ করান

ইহ্রামের অবস্থায় বিবাহ করা ও বিবাহ করান উভয়ই জায়িয। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত

www.pathagar.com

মায়মুনা (রা.)-কে ইহ্‌রামের অবস্থায়ই বিবাহ করেছেন। (হিদায়া, ২য় খণ্ড) তবে সহবাস জায়িয নেই।

## ইহ্‌রামের মাসাইল

ইহ্‌রামের নিয়্যত মনে মনে করা জরুরী, মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করা উত্তম। যে কাজের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবে মনে মনে তার নিয়্যত করবে। যেমন আমি ইফরাদ, কিরান বা তামাত্তু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলাম। যদি কেউ মনে মনে ইফরাদের নিয়্যত করে কিন্তু মুখে কিরান বা তামাত্তুর কথা বের হয়ে যায় তবে অন্তরের কথাই ধর্তব্য হবে। নিয়্যত ও তালবিয়া একত্রে হওয়া শর্ত। কেউ যদি শুধু ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়্যত করে এবং হজ্জ অথবা উমরা কোন কিছুর কথাই উল্লেখ না করে তবুও তার ইহ্‌রাম সহীহ্ হবে। তবে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার কাজ শুরু করা পূর্বে এই ইহ্‌রামকে হজ্জ অথবা উমরার জন্য নির্ধারিত করে নিতে হবে।

যদি ফরয বা নফল হজ্জের কথা নির্দিষ্ট না করে শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে তবে তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকলে এই ইহ্‌রাম ফরয হজ্জের ইহ্‌রাম বলে গণ্য হবে। আর যদি মানত নফল অথবা অন্য কারো পক্ষ হতে বদলী হজ্জের নিয়্যত করে থাকে তবে যা নিয়্যত করেছে তাই হবে। যদি কেউ ইহ্‌রাম বাঁধার পর কিসের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিল তা ভূলে যায় অথবা এ ব্যাপারে সন্দেহ হয় তবে তার উপর হজ্জ ও উমরা উভয়ই ওয়াজিব হবে। যদি কেউ বলদী হজ্জ আদায় করে তবে যার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করছে তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করার নিয়্যত করবে এবং মুখে উচ্চারণ করে বলবে, আমি অমুকের পক্ষে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধছি (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

## তালাবিয়ার মাসাইল

তালবিয়া মুখে উচ্চারণ করা শর্ত। শুধু মনে মনে বললে যথেষ্ট হবে না। বোবা ব্যক্তির পক্ষে শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব না হলেও জিব্বা নাড়াচাড়া করা শর্ত। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আলহামদু লিল্লাহ আল্লাহু আকবর' ইত্যাদি যিক্‌র তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তবে বিনা কারণে তালবিয়া পরিত্যাগ করা মাকরূহ। তালাবিয়ার বিশেষ শব্দ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা উচ্চারণ করা সুন্নাত। শর্ত নয়। ইহ্‌রাম বাঁধার সময় একবার তালবিয়া পাঠ করা ফরয। একাধিক বার পাঠ করা সুন্নাত। তিনবার পাঠ করা উত্তম। অবস্থা পরিবর্তনের সময় যেমন সকাল-সন্ধ্যায় উঠাবসা করার সময় লোকজনের সাথে সাক্ষাতের সময়, ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার সময়, সাওয়ারীতে আরোহন কালে এবং কোন উচু স্থানে উঠার সময় ও অবতরণের সময় তালবিয়া পাঠ করবে। ফরয নামাযের পর বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে। অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। অনেক মানুষ একত্রে থাকলে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে তালবিয়া পাঠ করবে। উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে। কিন্তু অধিক চিৎকার করে নয়। উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা সুন্নাত। তবে এত বেশী জোরে নয়, যদ্দরুন নিজের অথবা কোন নামাযীর কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন অসুবিধা হতে পারে। হরম শরীফে, মিনা, আরাফা এবং মুযদালিফায় তালবিয়া পাঠ করবে। তবে মসজিদের ভেতর বেশী জোরে পাঠ করবে না। তাওয়াফ ও সায়ী পালনের সময় তালবিয়া পাঠ করবে না। তালবিয়া পাঠের মাঝখানে কোন

www.pathagar.com

কথা বলবে না। তালবিয়া পাঠ রত অবস্থায় সালাম দেওয়া মাকরূহ। কেউ যদি তালবিয়া পাঠের সময় সালাম দেয় তবে তালবিয়া পাঠের মাঝখানে এর জওয়াব দেওয়া জায়িয। কিন্তু সালাম দানকারী চলে যাবে বলে আশংকা না হলে তালবিয়া সমাপ্ত করে সালামের জবাব দিবে। ১০ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। উমরার মধ্যে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা যায় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## বিবিধ মাসাইল

ইহ্‌রামের জন্য গোসল করা সুন্নাত। এ গোসল পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে করা হয়। কাজেই হায়িয ও নিফাস ওয়ালী মহিলা এবং শিশুদের জন্যও এই গোসল মুস্তাহাব। গোসল করতে না পারলে উযূ করে নিবে। অবশ্য উযূ গোসল ছাড়াও ইহ্‌রাম বাঁধা জায়িয, কিন্তু মাকরূহ। পানি না পাওয়া গেলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়িয নয়।

ইহ্‌রামের চাদর এমন লম্বা হতে হবে যেন সহজে ডান বগলের নীচের দিক হতে পেচিয়ে বাম কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখা যায়। আর লুঙ্গি এ-ই পরিমাণ হতে হবে যাতে সতর ঠিকমত আবৃত হয়। ইহ্‌রামের কাপড় সাদা হওয়া উত্তম। ইহ্‌রামের জন্য একটি কাপড়ও যথেষ্ট এবং দুই এর অধিক কাপড়ও জায়িয। ইহ্‌রামের জন্য রঙ্গিন কাপড় ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। তবে তা যেমন কুসুম এবং যাফরান দ্বারা রঞ্জিত না হয়। ইহ্‌রাম অবস্থায় কম্বল, লেপ, কাঁথা, শাল ইত্যাদি গায়ে দেওয়া জায়িয। মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত যে কোন সময় ইহরামের দুই রাক'আত নামায আদায় করা জায়িয। যদি ফরয নামাযের পর ইহ্‌রামের নিয়্যত করা হয় তবে এ নামাযই ইহ্‌রামের দুই রাক'আত নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে। অবশ্য স্বতন্ত্র দুই রাক'আত নামায আদায় করা উত্তম। নামায ছাড়াও ইহ্‌রাম জায়িয। কিন্তু মাকরূহ। অবশ্য মাকরূহ ওয়াক্তে ইহ্‌রাম বাঁধলে বিনা নামাযে ইহ্‌রাম বাঁধা মাকরূহ নয়। হায়িয ও নিফাসওয়ালী মহিলাগণ উযূ গোসল করে কিবলামূখী হয়ে বসে ইহ্‌রামের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করবে। নামায পড়বে না। পুরুষগণ ইহ্‌রামের উদ্দেশ্যে যে নামায আদায় করা হয় তা অনাবৃত্ত মাথায় আদায় করতে হবে। যতদিন ইহ্‌রাম থাকবে ততদিন পর্যন্ত যাবতীয় নামায অনাবৃত মাথায়ই আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী ২য় খণ্ড)।

## মক্কা মুআযযমায় প্রবেশের আদাব ও দু'আ

মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। জিদ্দায় গোসল করে রওয়ানা হলে এ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। সানিয়্যাতুল উলয়া তথা মক্কার কবরস্থানে বাবুল মু'আল্লা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করা এবং বাবুল সুফলার পথে মক্কা থেকে বের হওয়া মুস্তাহাব। সম্ভব না হলে যে কোন পথ দিয়ে আসা যাওয়া করা জায়িয। দিবারাত্র তথা সর্বদা মক্কা শরীফে প্রবেশ করা জায়িয। অবশ্য দিনে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। যখন মক্কা শরীফ দৃষ্টি গোচর হবে তখন এ দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّ ارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে তালবিয়া পাঠ করতে করতে পূর্ণ আদব ও

www.pathagar.com

সম্মানের সাথে মক্কায় প্রবেশ করবে এবং প্রবেশকালে এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ جِئْتُ لِاُؤَدِّىَ فَرْضَكَ وَ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ اَلْتَمِسُ رِضَاكَ وَمُتَّبِعًا لِاَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَضَائِكَ اَسْئَلُكَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ الْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِيْنَ مِنْ عِقَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِى الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَ تَحْفَظَنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَ تَجَاوَزْ عَنِّىْ بِمَغْفِرَتِكَ وَ تُعِيْنَنِىْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِكَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَدْخِلْنِىْ فِيْهَا وَ اَعِذْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

মাদ'আ (মসজিদে হারাম ও কবরস্থানের মধ্যবর্তী স্থান) এর পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِمَّا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

আরবীতে দু'আ করতে না পারলে নিজের ভাষায় প্রয়োজনীয় দু'আ করতে থাকবে এবং যিক্‌র আযকারে লিপ্ত থাকবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড) ।

## মসজিদুল হারামে প্রবেশের আদাব ও দু'আ

কা'বা শরীফের চতুর্পাশ্বে অবস্থিত মসজিদকে মসজিদুল হারাম বলে। মক্কা শরীফে প্রবেশের পর পরই মসজিদুল হারামে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। যদি সাথে সাথে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয় তবে মাল-সামান গোছিয়ে সর্বাগ্রে মসজিদে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাবুস্ সালাম দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। কষ্ট না হলে মসজিদুল হারামে খালি পায়ে প্রবেশ করা ভাল। তালবিয়া পাঠ করতে করতে আল্লাহ্ তা'আলার পাক দরবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে এবং প্রথমে ডান পা রেখে এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَدْخِلْنِىْ فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ اَنْ تَرْحَمَنِىْ وَ تُقِيْلَ عَثْرَتِىْ وَ تَغْفِرَ ذُنُوْبِىْ وَ تَضَعَ عَنِّىْ وِزْرِىْ

মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর কা'বা শরীফ নযরে পড়তেই 'আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করবে এবং কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে এই দু'আ পড়বে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَعْظِيْمًا وَ تَشْرِيْفًا وَ مَهَابَةً وَ زِدْ مِنْ

www.pathagar.com

تَعْظِيْمِهٖ وَ تَشْرِيْفِهٖ مِنْ حَجِّهٖ وَ اعْتَمَرَ تَعْظِيْمًا وَ تَشْرِيْفًا وَ مَهَابَةً

এরপর দরূদ শরীফ পাঠ করে যে কোন দু'আ করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'আ হল আল্লাহ্র কাছে জান্নাত কামনা করা এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

এ সময় নিম্নের দু'আটি মুস্তাহাব।

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَ الْفَقْرِ وَ مِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।

মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর তাওয়াফ আদায়ের ইচ্ছা থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না। বরং দু'আর পর পরই তাওয়াফ আরম্ভ করবে। অবশ্য যদি তাওয়াফের কারণে ফরয নামায কাযা হওয়ার কিংবা মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়ার অথবা জামা'আত বাদ পড়ার আশংকা হয় তবে তাওয়াফের পরিবর্তে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে শর্ত হল, মাকরূহ ওয়াক্তে না হতে হবে। জানাযার নামায সুন্নাতে মু'আক্কাদা ও বিত্রের নামায তাওয়াফে তাহিয়ার পূর্বে আদায় করবে এবং ইশরাক, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নামায তাওয়াফের পর আদায় করবে। মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর নফল ই'তিকাফের নিয়্যত করা মুস্তাহাব। মসজিদুল হারামে তাওয়াফকারীদের জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করা জায়িয। তবে সিজ্দার জায়গা দিয়ে অতিক্রম না করা শর্ত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

## হরমের সীমানা এবং সেখানে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

মক্কা শরীফের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট সীমানায় বিশেষ কিছু চিহ্ন নির্মিত রয়েছে। জিব্রাঈল (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে এ স্থান সমূহ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং ইব্রাহীম (আ.) তাতে বিশেষ চিহ্ন স্থাপন করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে এই চিহ্ন সমূহ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা.) হযরত উসমান ও হযরত মুআবিয়া (রা.) নিজ নিজ খিলাফতকালে এগুলোর নবায়ন ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করেছেন (শামী, ২য় খণ্ড)।

জিদ্দার দিকে মক্কা মুকার্‌রমা হতে দশ মাইলের মাথায় সুমায়সিয়্যাহ্ (যেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল) এর সন্নিকটে হরমের চিহ্ন স্বরূপ মিনারা নির্মিত রয়েছে। এবং মদীনার দিকে তানঈম নামক স্থানেও মিনারা রয়েছে। এ স্থানটি মক্কা হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ইয়ামনের দিকে হরমের সীমানা হল 'ইযাআতে লবন' যা মক্কা মুকাররমা হতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। ইরাকের দিকে মক্কা হতে সাত মাইল জিঈর্‌য়ানার দিকে নয় মাইল এবং তায়িফের দিকে আরাফা পর্যন্ত সাত মাইলের এই বিস্তৃত অঞ্চল সমূহ হরমের সীমানার অন্তর্ভুক্ত। এই সীমানার ভিতর কোন স্থলজ প্রাণী শিকার বা হত্যা করা ধরা তাড়ানো, বৃক্ষলতা ঘাস ইত্যাদি কর্তন করা হারাম। এই কারণে এই নির্ধারিত এলাকাকে 'হরম এলাকা' বলা হয়।

হরমের সীমানার ভেতর প্রবেশ করার সময় একথা মনে মনে খেয়াল করতে হবে যে, এখন আমি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারের বিশেষ এলাকার ভিতর প্রবেশ করছি। কাজেই

www.pathagar.com

এ সময় খুবই বিনয় নম্রতা, দীনতা, হীনতার সাথে তাওবা ইস্‌তিগফার করতে করতে প্রবেশ করবে। আর এই দু'আটি পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِى وَ دَمِىْ وَ عَظْمِىْ وَ بَصَرِىْ عَلَى النَّارِ اللّٰهُمَّ اٰمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنْ اَوْلِيَائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, নবীগণ যখন হরম সীমানায় প্রবেশ করতেন তখন তাঁরা নগ্নপায়ে চলাফেরা করতেন এবং এভাবেই তাওয়াফ ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি আদায় করতেন।

## মসজিদুল হারামে নামায আদায়ের ফযীলত

মসজিদুল হারাম পৃথিবীর সকল মসজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে নামায আদায় করার সাওয়াব অনেক বেশী। এক নামাযের সাওয়াব একলক্ষ নামাযের সমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজ ঘরে নামায আদায় করে তবে এক নামাযে এক নামাযের সম সওয়াব পাবে। যদি মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করে তবে এক নামাযে পঁচিশ নামাযের সাওয়াব পাবে। যদি জামে' মসজিদে নামায আদায় করে তবে এক নামাযে পাঁচশ' নামাযের সাওয়াব পাবে। যদি মসজিদে আক্সায় নামায আদায় করে তবে এক নামাযে এক হাজার নামাযের সাওয়াব পাবে। যদি আমার মসজিদ (মসজিদে নব্বী) এ নামায আদায় করে তবে এক নামাযে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সাওয়াব পাবে। আর যদি মসজিদুল হারামে নামায আদায় করে তবে এক নামাযে এক লক্ষ নামাযের সাওয়াব পাবে (মা লা বুদ্দা মিনহু)।

www.pathagar.com

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# তাওয়াফ ও সাঈ

তাওয়াফের আভিধানিক অর্থ কোন কিছুর চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করা। শরী'আতের পরিভাষায় তাওয়াফ বলা হয় বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করা (কাওয়াইদুল ফিক্হ্)।

### তাওয়াফের নিয়ম, নিয়্যত ও দু'আ

তাওয়াফ আরম্ভকারী ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের সামনে যেদিকে হাজারে আসওয়াদ রয়েছে সেদিকে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে যেন সম্পূর্ণ হাজারে আসওয়াদ তার ডান দিকে থাকে। এরপর তাওয়াফের নিয়্যত করে নিম্নের দু'আটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

তারপর ডান দিকে এই পরিমাণ অগ্রসর হবে যেন হাজরে আসওয়াদ সোজা সামনে থাকে। হাজরে আসওয়াদে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাক্বীরে তাহ্রীমার ন্যায় উভয় হাত উঠিয়ে বিস্মিল্লাহ্ পড়ে তাক্বীর বলবে; আল্লাহ্র হামদ-সানা করবে, দরূদ শরীফ পড়বে এবং দু'আ করবে। এ অবস্থায় নিম্নের দু'আটি পড়া উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِكَ
وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

তারপর উভয় হাত হাজরে আসওয়াদের উপর রেখে দুই হাতের মাঝখানে মুখ রেখে তাতে চুম্বন করবে। এভাবে তিনবার চুম্বন করবে। এমনভাবে চুম্বন করবে যাতে কোন শব্দ না হয়। চুম্বন করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

তারপর নিজের ডান দিক তথা বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজা হতে তাওয়াফ আরম্ভ করবে। তাওয়াফের পর সাঈ থাকলে সে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে ইযতিবা করে নিবে। আর সাঈ না থাকলে ইযতিবা করবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

তাওয়াফ কালে হাতীমকেও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। হাতীম এবং বায়তুল্লাহ্র মধ্যবর্তী ফাকা পথ দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ সহীহ্ হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

তাওয়াফ করতে করতে রুকনে ইয়ামানীতে পৌছে উভয় হাত অথবা ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে। এ ক্ষেত্রে চুম্বন করা ও তাতে কপাল রাখা নিষিদ্ধ। রুকনে ইরাকী ও রুকনে শামীতে ইস্তিলাম করা জায়িয নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করে হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌছলে পুনরায় তাতে উপরোক্ত নিয়মে চুম্বন করবে। হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদে আগমন করাকে শাওত বা এক চক্কর বলে। এভাবে সাত চক্কর পূরা করতে হবে। সপ্তম চক্করের পর অষ্টমবার পুনরায় হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করবে। এভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করলে এক তাওয়াফ পূর্ণ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তাওয়াফের পরে সাঈ থাকলে এই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। বাকী চার চক্করে রমল করবে না। রমল হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ করে হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে শেষ করবে।

তাওয়াফ শেষ করে সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু রাক'আত নামায আদায় করবে। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিয়ার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্লাস পাঠ করবে। নামায শেষে দু'আ করবে।

এরপর যমযমের নিকট এসে পেটভরে পানি পান করবে। তারপর সাঈ করার পূর্বে মুলতাযামের নিকট আসবে এবং মুলতাযামকে আঁকড়ে ধরে বিনীতভাবে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে। এটি দু'আ কবূলের স্থান (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## তাওয়াফের রুক্ন

তাওয়াফের রুকন তিনটি। যথা ঃ

১. তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর পূর্ণ করা।

২. তাওয়াফ বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাইরে মসজিদুল হারামের ভিতরে করা।

৩. নিজের তাওয়াফ নিজে করা, ওযর হলে কোন কিছুর উপর আরোহন করেও তা আদায় করা যায়। কিন্তু বেহুশ ব্যক্তির বিশেষক্ষেত্রে অপর ব্যক্তি তাওয়াফ করলে তা জায়িয হবে।

## তাওয়াফ সহীহ্ হওয়ার শর্ত

তাওয়াফ সহীহ্ হওয়ার শর্ত ছয়টি ঃ

১. মুসলমান হওয়া।

২. নিয়্যত করা।

৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাওয়াফ করা।

৪. বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাইরে তাওয়াফ করা বায়তুল্লাহ্র ভিতরে নয়।

৫. মসজিদুল হারামের ভিতরে তাওয়াফ করা। ছাদের উপর দিয়ে হলেও তা সহীহ্ হবে।

৬. হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা।

www.pathagar.com

## তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ

তাওয়াফের ওয়াজিব ছয়টি ঃ

১. হদসে আসগর - যে অবস্থায় উযূ ওয়াজিব হয় ও হদসে আকবর :- যে অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হয় থেকে পবিত্র হওয়া।

২. সতর ঢাকা। উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করলে দম ওয়াজিব হবে।

৩. যারা পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করতে সক্ষম তাদের জন্য পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা।

৪. নিজের ডান দিক হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা।

৫. হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা।

৬. হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা (ইরশাদুস্ সারী)।

## তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ

তাওয়াফের সুন্নাত নয়টি ঃ

১. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

২. ইযতিবা করা (যদি তাওয়াফের পর সাঈ থাকে)

৩. প্রথম তিন চক্করে রমল করা (যদি তাওয়াফের পর সাঈ থাকে) আর অবশিষ্ট চক্কর গুলোতে রমল না করে ধীরে সুস্থে চলা।

৪. তাওয়াফ পর সাঈ আরম্ভ করার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ ইসতিলাম (চুম্বন) করা। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাওয়াফের পর সাঈ করবে।

৫. হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাক্বীর বলার সময় উভয় হাত উত্তোলণ করা।

৬. অধিকাংশ আলিমের মতে হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা।

৭. তাওয়াফ আরম্ভ করার সময় হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা।

৮. সকল চক্কর ক্রমাগত বিরতিহীনভাবে সম্পন্ন করা।

৯. শরীর ও কাপড় চোপড় নাজাসাতে হাকীকী হতে পাক হওয়া (ইরশাদুস্ সারী)।

## তাওয়াফের মুস্তাহাবসমূহ

তাওয়াফের মুস্তাহাব তেরটি ঃ

১. রুক্নে ইয়ামানী দু'হাতে অথবা ডানহাতে স্পর্শ করা,

২. তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে কিব্লামূখী হয়ে এমনভাবে দাঁড়ানো যেন পূর্ণ হাজরে আসওয়াদ তার ডান দিকে থাকে,

৩. হাজরে আসওয়াদে তিনবার চুম্বণ করা,

৪. তাওয়াফ করার সময় দু'আ মাসূরা সমূহ পাঠ করা,

www.pathagar.com

৫. কাউকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত সম্ভব হলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটবর্তী হয়ে তাওয়াফ করা,

৬. পুরুষের ভীড় থাকলে মহিলাদের বায়তুল্লাহ্ থেকে কিছুটা দূর দিয়ে তাওয়াফ করা,

৭. মহিলাদের রাতে তাওয়াফ করা,

৮. তাওয়াফের মধ্যে বায়তুল্লাহ্র দেওয়াল সংলগ্ন বর্ধিত নিম্নাংশকেও তাওয়াফের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া,

৯. তাওয়াফ শুরু করে মধ্যখানে তা ভঙ্গ করে থাকলে অথবা মাকরূহ তরীকায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে থাকলে তা পুনরায় প্রথম হতে আরম্ভ করা,

১০. জায়িয কথাও বর্জন করা,

১১. যে কাজ একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায় তা না করা,

১২. দু'আ ও যিক্র আল্লাহ্র আস্তে আস্তে পাঠ করা।

১৩. তাওয়াফের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন বস্তুর প্রতি নযর করা থেকে নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করা (ইরশাদুস্ সারী)।

## তাওয়াফের মুবাহ্ কাজসমূহ

তাওয়াফের অবস্থায় যে সব কাজ মুবাহ্ তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. জায়িয কথা-বার্তা বলা,

২. সালাম করা,

৩. হাঁচির পর 'আল্হামদুলিল্লাহ্' বলা এবং এর জওয়াব দেওয়া,

৪. শরী'আত সম্পর্কিত মাস'আলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা এবং এর উত্তর দেওয়া,

৫. পায়খানা পেশাবের বেগ হলে তাওয়াফ ছেড়ে পায়খানা পেশাব করার জন্য যাওয়া,

৬. প্রয়োজনে কিছু পান করা,

৭. পাক-পবিত্র জুতা বা মোযা পরিধান করে তাওয়াফ করা,

৮. যিক্র আযকার না করে তাওয়াফ করা,

৯. চুপেচুপে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা,

১০. হামদ ও নাত সম্বলিত কবিতা আবৃত্তি করা

১১. ওযরবশত সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা (ইরশাদুস্ সারী)।

## তাওয়াফের হারাম বিষয়সমূহ

তাওয়াফের অবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি হারাম ঃ

১. জানাবাত-হায়িয অথবা নিফাসের অবস্থায় তাওয়াফ করা,

২. বিনা উযূতে তাওয়াফ করা,

www.pathagar.com

৩. উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করা,

৪. বিনা ওযরে সাওয়ার হয়ে অথবা কারো কাঁধে চড়ে তাওয়াফ করা,

৫. বিনা ওযরে হাঁটুর উপর ভর করে অথবা উল্টাপিঠে তাওয়াফ করা,

৬. হাতীমের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করা,

৭. তাওয়াফের জরুরী কোন আমল ছেড়ে দেওয়া (ইরশাদুস্ সারী)।

## তাওয়াফের মাকরূহ বিষয়সমূহ

তাওয়াফে নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ মাকরূহ ঃ

১. অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কথা বলা,

২. ক্রয় বিক্রয় করা,

৩. হামদ ও 'নাত বিহীন কবিতা আবৃত্তি করা। কেউ কেউ বলেছেন, সাধারণভাবে কবিতা আবৃত্তি করাই মাকরূহ,

৪. এমন উচ্চ আওয়াজে কুরআন শরীফ অথবা দু'আ ইত্যাদি পাঠ করা যাতে অন্যান্য তাওয়াফকারী বা নামাযীদের অসুবিধা হয়,

৫. জ্ঞাত'সারে অপবিত্র কাপড়ে তাওয়াফ করা,

৬. বিনা ওযরে রমল ও ইযতিবা তরক করা,

৭. সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হাজরে আসওয়াদের চুম্বন ছেড়ে দেওয়া,

৮. তাওয়াফের চক্কর সমূহের মধ্যে অধিক বিরতি দেওয়া,

৯. তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায আদায় না করে দুই বা ততোধিক তাওয়াফে একত্রিত করে ফেলা। অবশ্য মাকরূহ ওয়াক্তে তাওয়াফ করলে দুই বা ততোধিক তাওয়াফকে একত্রিত করাতে মাক্রূহ হবে না,

১০. তাওয়াফের নিয়্যত করার সময় তাক্বীর না বলেই উভয় হাত উত্তোলন করা।

১১. খুত্বার সময় তাওয়াফ করা।

১২. ফরয নামাযের সময় তাওয়াফ করা,

১৩. তাওয়াফের মধ্যে কোন কিছু খাওয়া। কেউ কেউ পান করাকেও মাকরূহ বলেছে,

১৪. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে তাওয়াফ করা,

১৫. ক্ষুধা ও রাগের অবস্থায় তাওয়াফ করা (ইরশাদুস্ সারী)।

## তাওয়াফের প্রকারভেদ

তাওয়াফ সাত প্রকার ঃ

১. **তাওয়াফে কুদূম ঃ** একে তাওয়াফে তাহিয়্যাহ্, তাওয়াফে লিকা এবং তাওয়াফুল ওয়ারিদ ও বলা হয়। এই তাওয়াফ মীকাতের বাইরের সেই সব লোকের জন্য সুন্নাত। যারা শুধু

www.pathagar.com

ইফরাদ হজ্জ অথবা কিরান হজ্জ আদায় করবে। যদি মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি মীকাতের বাইরে গমন করে ইফরাদ বা কিরান হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে তবে সে ক্ষেত্রে তার জন্য এ তাওয়াফ করা সুন্নাত। মীকাতের বাইরের লোকেরা যদি মক্কাতে বসবাস আরম্ভ করে তবে তাঁদের জন্যও এই তাওয়াফ করতে হয় না। আরাফায় গমনের পূর্ব পর্যন্ত এ তাওয়াফে আদায় করা যায়। তবে মক্কা প্রবেশের সাথে সাথে তা করা উত্তম। আরাফায় গমনের পর আর এ তাওয়াফের ওয়াক্ত থাকেনা।

২. **তাওয়াফে যিয়ারত** ঃ এ তাওয়াফকে তাওয়াফে রুক্‌ন, তাওয়াফে ইফাযা, তাওয়াফে ফরয ও তাওয়াফে হজ্জ বলা হয়। এটা হজ্জের অন্যতম রুক্‌ন। এ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ সহীহ্ হয় না। এ তাওয়াফের সময় ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক হতে আরম্ভ হয় এবং এবং ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তা আদায় করা ওয়াজিব। কোন হাজী যদি এ সময়ের মধ্যে এ তাওয়াফ করতে না পারে তবে পরে যখনই সম্ভব তখনই তা আদায় করতে হবে। এবং বিলম্বের জন্য দম দিতে হবে।

৩. **তাওয়াফে সদর** ঃ একে তাওয়াফে বিদা-বিদায়ী তাওয়াফ এবং তাওয়াফে ওয়াজিবও বলা হয়। আফাকী অর্থাৎ মীকাতের বাইরে বসবাসকারী লোকদের উপর এ তাওয়াফ ওয়াজিব। হরম ও হিল্লের অধিবাসী এবং মীকাতের বাইরের যে সব লোক স্থায়ীভাবে এর মধ্যে বসবাস করে তাদের উপর এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। তাওয়াফে যিয়ারতের পর এর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। এ তাওয়াফে রমল ইযতিযা এবং সাঈ কিছুই করতে হয় না। উল্লিখিত তিন প্রকার তাওয়াফ হজ্জের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৪. **তাওয়াফে উমরা** ঃ এ তাওয়াফ উমরার ক্ষেতে রুকন ও ফরয। এতে রমল ও ইযতিবা করতে হয়। পরে সাঈও করতে হয়। উমরার ইহ্‌রামের পর হতে এর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।

৫. **মানতের তাওয়াফ** ঃ এ তাওয়াফ ওয়াজিব। এ তাওয়াফ কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। অবশ্য মানতের সময় ওয়াক্তের কথা নির্দিষ্ট করা হলে তা নির্দিষ্ট হবে। মানতকারীর উপর যদি ফরয বা ওয়াজিব তাওয়াফ বাকী থাকে তবে তা আগে আদায় করবে। পরে মানতের তাওয়াফ আদায় করবে।

৬. **তাওয়াফে তাহিয়্যাহ্** ঃ এ তাওয়াফ মসজিদুল হারামে প্রবেশকারীদের জন্য মুস্তাহাব। অবশ্য যদি কারো উপর অন্য কোন তাওয়াফ ওয়াজিব থাকে তবে তা আদায় করলে ঐ তাওয়াফ দ্বারা তাওয়াফে তাহিয়্যাহ আদায় হয়ে যাবে।

৭. **নফল তাওয়াফ** ঃ এ তাওয়াফ যখন ইচ্ছা তখন সম্পন্ন করা যায়। যদি অন্য কোন তাওয়াফ তার উপর ওয়াজিব না থাকে। নামাযের মত নফল তাওয়াফ শুরু করলে তা পূরা করা ওয়াজিব (ইরশাদুস্ সারী)।

## রমল ও ইয্‌তিবা

রমল বলা হয় তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে কাঁধ দোলিয়ে ছোট ছোট কদমে ঈষৎ দ্রুত গতিতে চলা। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত।

রমল হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদে গিয়ে শেষ করবে।

www.pathagar.com

যে তাওয়াফের পর সাঈ থাকে ঐ তাওয়াফে রমল করা সুন্নাত। রমল আরম্ভ করার পর মানুষের ভীড়ের কারণে যথানিয়মে রমল করতে না পারলে যেখানে সুযোগ পাবে সেখানেই যথানিয়মে রমল করবে। প্রথম চক্করে রমল না করলে পরবর্তী দুই চক্করে রমল করবে তবে প্রথম তিন চক্করে রমল তাওয়াফের পূর্ণ চক্করে রমল করলে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করার ইচ্ছা করলে তাওয়াফে কুদূমে রমল করবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইযতিবা অর্থাৎ ইহ্‌রামের চাদর ডান বগলের নীচের দিক হতে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর রেখে দেয়া বাম কাঁধ আবৃত থাকবে আর ডান কাঁধ অনাবৃত অবস্থায় থাকবে। এরূপ করা সুন্নাত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### হাজরে আস্‌ওয়াদের বিবরণ ও তার ইস্‌তিলাম (চুম্বন)

হাজরে আসওয়াদ একটি জান্নাতী পাথর। এর ফযীলত সম্বন্ধে হাদীসে বিশদ বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তা দুধ থেকেও শুভ্র ছিল। কিন্তু কিন্তু আদম সন্তানের গুনাহ্ তাকে কাল বানিয়ে দিয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে বলতে শুনেছি হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্‌রাহীম জান্নাতের ইয়াকূত পাথর সমূহের দু'টি ইয়াকূত পাথর। আল্লাহ্ তা'আলা এর জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি এর জ্যোতিকে নিষ্প্রভ না করতেন তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত আলোকিত করে দিত (তিরমিযী, ১ম খণ্ড)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্‌রাহীম ব্যতীত পৃথিবীতে জান্নাতের কোন অংশ নেই। এ দু'টি জান্নাতেরই বস্তু। যদি মুশরিক লোকেরা তা স্পর্শ না করত তবে রুগ্ন ও অসুস্থ ব্যক্তি স্পর্শ করা মাত্রই আরোগ্য লাভ করতো।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাজরে আসওয়াদে মুশরিকদের স্পর্শ না লাগলে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী তা স্পর্শ করতেই রোগ মুক্ত হয়ে যেত (আখ্‌বারে মক্কা, ১ম খণ্ড)।

হাজরে আস্‌ওয়াদে চুম্বন করা সুন্নাত। হাদীসে আছে, উমর (রা.) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে বললেন, আমি তোমাকে চুম্বন করেছি বটে কিন্তু আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে তোমায় চুম্বন করতে দেখেছি (মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড)।

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কাউকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তাতে চুম্বন করা সম্ভব হয়।

হাজরে আসওয়াদে চুম্বনের সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَ طَهِّرْلِىْ قَلْبِىْ وَ اشْرَحْ لِىْ

www.pathagar.com

صَدْرِىْ وَ يَسِّرْ لِىْ اُمُوْرِىْ وَ عَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ

সরাসরি হাজরে আসওয়াদের উপর চুম্বন করা সম্ভব না হলে দুই হাত দ্বারা তা স্পর্শ করা উভয় হাতে তখন হয় কোন এক হাতে চুম্বন করবে। এ ক্ষেত্রে ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করে ডান হাতে চুম্বন করা উত্তম। তা যদি সম্ভব না হয় ততে লাঠি বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা হাজরে আসওয়াদে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে উভয় হাত কাঠ বরাবর উঠিয়ে হাতের তালু দ্বারা হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে উপরোক্ত নিয়মে তাক্‌বীর তাহ্‌লীল, আল্লাহ্‌র হামদ সানা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর হাতের তালুতে চুম্বন করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**মুলতাযামের ইস্‌তিলাম ও দু'আ**

হাজরে আসওয়াদ ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেওয়ালকে 'মুলতাযাম' বলে। এটি দু'আ কবূলের স্থান। সাফা মারওয়াতে সাঈ করার পূর্বে মুলতাযামে আসবে এবং একে আঁকড়ে ধরবে। এতে বুক পেট এবং ডানগাল রেখে আবার কখনো বাম গাল রেখে উভয় হাত মাথার উপর উত্তোলন করে হাত দু'টো দেয়ালের উপর ছড়িয়ে দিয়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করবে। এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়বে।

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لاَ تَزَلْ عَنِّىْ نِعْمَةٌ نعمت بِهَا عَلى

নিম্নোক্ত দু'আটি পড়াও ভাল (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

اِلٰهِىْ وَ قَفْتُ بِبَابِكَ وَ اَلْتَزَمْتُ بَاعتابِكَ اَرْجُوْ رَحْمَتِكَ وَ اخْشٰى عَقْبِك اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِىْ وَ جَسَدِىْ عَلَى النَّار اَللّٰهُمَّ كَمَا صنت وَجْهِى اَنْ السُّجُوْد لِغَيْرِكَ فَصِنْ وَ جْهِىْ عَنْ مَسْئَلَةِ غَيْرِكَ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اِعْتِقْ رِقَابَنَا وَ رِقَابَ اٰبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ يَا كَرِيْمُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم

এ সময় নিম্নের দু'আটি ও কিতাবে বর্ণিত আছে,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اِعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّار وَ اَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ اكْفِنَا كُلِّ سُوْءٍ وَ قَنِعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَ فْدِكَ عَلَيْكَ اَللّٰهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نِعْمَائِكَ وَ اَفْضَلْ صَلاَتَكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَ جَمِيْعُ رُسُلِكَ وَ اَصْفِيَائِكَ وَ عَلٰى اٰلِه وَ صَحْبِه وَ اَوْلِيَائِك

এ ক্ষেত্রে দু'আর শুরু এবং শেষ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে (ইরশাদুস্ সারী)।

www.pathagar.com

## রুকনে ইরাকী, রুকনে শামী, রুকনে ইয়ামানী, হাতীমে কা'বা ও মীযাবে রহমতের দু'আ

### রুকনে ইরাকী

বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণ যা ইরাকের দিকে অবস্থিত। রুকনে ইরাকীতে ইসতিলাম করা জায়িয নেই এবং এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় এর দিকে কোন ইশারাও করবে না। রুকনে ইরাকী বরাবর পৌছে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ النِّفَاقِ وَ الشِّقَاقِ وَ سُوْءِ الاَخْلَاقِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلِبِ فِى الاَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ

### রুকনে শামী

বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোন যা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত। রুক্নে শামীতে ইস্তিলাম করা জায়িয নেই। এ স্থানটির বরাবর পৌছে এই দু'আ পড়বে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَ سَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمُ مَافِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

### রুক্নে ইয়ামানী

বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ যা ইয়ামানের দিকে অবস্থিত। রুক্নে ইয়ামানীতে ইস্তিলাম করা মুস্তাহাব। ইসতিলাম অর্থাৎ উভয় হাতের তালু অথবা শুধু ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করা। এ ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করা ভাল নয়। রুক্নে ইয়ামানীতে চুম্বন করবে না। ইস্তিলাম করতে না পারলে ইশারা করতে হবে না। এ স্থানটি বরাবর পৌছে এ দু'আটি পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

আর রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি স্থানে পৌছে পড়বে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

(আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও ইরশাদুস্ সারী)।

### হাতীমে কা'বা

বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর দিকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সংলগ্ন এক পুরুষ সমান উঁচু প্রচীর বেষ্টিত কিছু জায়গা। একে হাতীম হিজ্র ও হাযীরায়ে ইসমাঈলও বলা হয়। বায়তুল্লাহ্ শরীফ পুনঃনির্মাণের সময় হালাল অর্থ সংকটের কারণে এর কিছু অংশ তথা ছয় হাতের মত জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ছেড়ে দেওয়া অংশকেই 'হাতীম' বলা হয়। শরী'আত অনুযায়ী আসল হাতীম এ ছয় হাতের মত জায়গা। এ জায়গাটি বায়তুল্লাহ্র শরীফের অন্তর্ভূক্ত। এখানে নামায পড়া আর বায়তুল্লাহ্ শরীফের অভ্যন্তরে নামায পড়া উভয়ই সমান। তাওয়াফের সময় হাতীমকেও তাওয়াফের মধ্যে শামিল করে নিতে হবে। হাতীম এবং বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী ফাঁকা

www.pathagar.com

পথ দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ সহীহ্ হবে না (শামী, ২য় খণ্ড ও মক্কা, ১ম খণ্ড)।

### মীযাবে রহমত

বায়তুল্লাহ্ শরীফের ছাদের উপর হাতীমের দিক দিয়ে একটি প্রনালা রয়েছে একে'মীযাবে রহমত'বলে। এটি দু'আ কবুলের স্থান। এই সোজা পৌছে নিম্নের দু'আটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَ لَا بَاقِيَ وَ اِلَّا وَجْهُكَ وَ اسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَا اَظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا–

তাওয়াফের পর মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে দুই রাক'আত নামায পড়া ওয়াজিব। ভীড়ের কারণে মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে তা আদায় করতে পারবে।মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য স্থানে এ নামায আদায় করাও জায়িয আছে। যে সময় নফল নামায আদায় করা জায়িয ঐ সময় তাওয়াফের এ দুই রাক'আত নামায আদায় করবে। তাওয়াফের এই দুই রাক'আত নামায মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে আদায় করা মুস্তাহাব। তারপর যথাক্রমে কা'বার অভ্যন্তরে, মীযাবের নীচে,হাতীমে কা'বায়, হাতীমে কা'বার নিকবর্তীস্থানে, মসজিদুল হারামে, তারপর হারমের এলাকার যে কোন স্থানে আদায় করা উত্তম। অবশ্য হরমের বাইরের এলাকায় এ নামায আদায় করলে দায়িত্ব আদায় হবে; কিন্তু ফযীলত পাওয়া যাবে না।

এ দুই রাক'আত নামাযের প্রথম রাক'আতে সূরা ফতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্লাস পাঠ করা উত্তম। নামাযের পর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুনিয়া আখিরাতের প্রয়োজনীয় বিষয়ে দু'আ করবে। এটি দু'আ কবুলের স্থান (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

এ সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَ عَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ وَ تَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاعْطِنِيْ سُؤْلِيْ وَ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَ رِضَاءً مِنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ اَنْتَ وَ لِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَ الْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হযরত আদম (আঃ) থেকে এ দু'আটি বর্ণিত রয়েছে (ইরশাদুস্ সারী)।

### যমযমের কূপ ও তার পানি পানের দু'আ

মসজিদুল হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহ্র নিকটে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম যমযম কূপ। এটি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আপন কুদরতে হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং তাঁর জননী হযরত হাজেরা (আ.) -এর জন্য প্রবাহিত করেছেন। তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর

www.pathagar.com

সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করার পূর্বে যমযমের নিকট একে পেটভরে পানি পান করবে এবং কিছু পানি শরীরে মাখবে। পানি পানের পূর্বে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَ اسِعًا وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

যমযমের পানি কিব্‌লামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে 'বিসমিল্লাহ্' বলে পান করবে। এ পানি তিন শ্বাসে পান করবে। এরপর আল্লাহ্‌র হামদ্-সানা করবে (ইরশাদুস্ সারী)।

## তাওয়াফে কুদুমের মাসাইল

মীকাতের বাইরের যে সব হাজী ইফরাদ অথবা হজ্জে কিরান আদায় করবে তাদের জন্য তাওয়াফে কুদূম সুন্নাত। এ তাওয়াফ তামাত্তু ও উমরা আদায়কারীর জন্য সুন্নাত নয়। অনুরূপ মক্কা অধিবাসী লোকদের জন্যও এ তাওয়াফ সুন্নাত নয়। অবশ্য যদি মক্কার অধিবাসী কোন ব্যক্তি মীকাতের বাইরে গমন করে ইফরাদ বা কিরান হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে তবে সে ক্ষেত্রে তার জন্য এ তাওয়াফ সুন্নাত। মীকাতের বাইরের লোকেরা যদি মক্কাতে বসবাস আরম্ভ করে তবে তাঁদের জন্যও এ তাওয়াফ সুন্নাত নয়। মক্কায় প্রবেশের পরপরই এ তাওয়াফ আদায় করা উত্তম। এটিই এর তাওয়াফের আউয়াল ওয়াক্ত। আরাফায়ে অবস্থানের পূর্ব পর্যন্ত তাওয়াফে কুদূম আদায় করা জায়িয। এরপর তাওয়াফে কুদূম আদায়ে করা জায়িয নেই (ইরশাদুস্ সারী)।

তাওয়াফে কুদূমের পর সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করলে এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা করবে। আর যদি এ তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়াতে সাঈ না করে তবে এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা করবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

মাকরূহ ওয়াক্তে তাওয়াফে কুদূম আদায় করা জায়িয। অবশ্য এ সময় তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায আদায় করবে না, মাকরূহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর তা আদায় করবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

তাওয়াফে কুদূম তরক করলে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে বিনা ওযরে তরক করলে সুন্নাতের খেলাপ হবে। সুন্নাত বা নফল তাওয়াফের চক্করের ব্যাপারে সন্দেহ হলে প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। তাওয়াফ সমাপ্ত না করে জানাযা অথবা ফরয নামায আদায় আরম্ভ করলে নামাযান্তে পূর্ববর্তী তাওয়াফের উপর বিনা করবে। অর্থাৎ যেখান পর্যন্ত পৌছে তাওয়াফ ছেড়েছে সেখান থেকে পুনঃরায় আরম্ভ করবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নুতনভাবে আরম্ভ করা মুস্তাহাব। তাওয়াফ আরম্ভ করে বিনা ওযরে তা তরক করা মাকরূহ। তাওয়াফের দুই চক্করের মধ্যে সময়ের দিক থেকে অধিক ব্যবধান সৃষ্টি করা মাকরূহ। এরূপ করলে তাতে তাওয়াফ ফাসিদ হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি মক্কায় প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফায় চলে যায় এবং সেখানে উকূফ করে নেয় তবে তাওয়াফে কুদূম তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

**তাওয়াফের মাসাইল ও দু'আ**

বেহুশ ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গীগণ কাঁধে বহন করে তাওয়াফ করালে এবং তাওয়াফ পূর্ণ করার পর অথবা তাওয়াফের কয়েক চক্কর অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর হুশ ফিরে আসলে যদি দিনের কিছু সময় সে ঐ বেহুশ অবস্থায় থাকে। পূর্ণ দিন বেহুশ না থাকে তবে তার তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে।

যদি কাউকে কাঁধে বা অন্য কিছুতে বহন করে তাওয়াফ করানো হয় তবে এতে বহনকারী এবং যাকে বহন করানো হয় উভয়ের তাওয়াফই আদায় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বহনকারী উভয়ের তাওয়াফের নিয়্যত করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের তাওয়াফ বিভিন্ন ধরনের হলে তাতেও কোন অসিবিধা নেই। বহনকারী যদি মুহ্রিম না হয় তবে যাকে বহন করা হয়েছে সে যে ধরণের ইহ্রামের নিয়্যত করেছে তাওয়াফও ঐ ধরণেরই হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তাওয়াফ করতে সক্ষম নয় এমন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি তাঁর সঙ্গীগণ কাঁধে বহন করে তাওয়াফ করায় এ অবস্থায় সে যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং তাদেরকে তাওয়াফ করানো জন্য না বলে থাকে তবে তার তাওয়াফ সহীহ্ হবে না। অবশ্য যদি তাওয়াফ করানোর হুকুম করে ঘুমিয়ে পড়ে তবে তাঁর তাওয়াফ সহীহ্ হয়ে যাবে।

আদিষ্ট ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে তাওয়াফ শুরু করার পর অথবা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার পর যদি অসুস্থ ব্যক্তি ঘুমিয়ে যায় এবং তারা তাকে বহন করে তাওয়াফ সম্পন্ন করে নেয় তবে এ অবস্থায়ও তার তাওয়াফ সহীহ্ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অসুস্থ ও অপারগ ব্যক্তিকে তাওয়াফ করানোর জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাউকে নিয়োজিত করা জায়িয। যদি বহনকারী তাওয়াফের নিয়্যত না করে এবং অপারগ ব্যক্তি বেহুশ না হয় আর সে নিজেই তাওয়াফের নিয়্যত করে তবে যাকে বহন করা হয়েছে তার তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বেহুশ থাকলে তার তাওয়াফ আদায় হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাইরে দিয়ে মসজিদুল হারামের ভিতের থেকে তাওয়াফ করবে। বায়তুল্লাহ্র নিকট দিয়ে দূর দিয়ে যমযম ইত্যাদির বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই। কেউ যদি মাসজিদুল হারামের ছাদে আরোহন করে তাওয়াফ করে তুবও তাওয়াফ সহীহ্ হবে (ইরশাদুস্ সারী)।

তাওয়াফের সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَ اخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ بِخَيْرٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

তাওয়াফের সময় নিম্নোক্ত দু'আটিও পাঠ করা ভাল।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ

www.pathagar.com

## সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করার হুকুম ও নিয়ম

সাফা ও মারওয়া হচ্ছে মসজিদুল হারাম সংলগ্ন দু'টি পাহাড়। এ পাহাড় দু'টি সেই ঐতিহ্যবাহী স্থান যে স্থানে হযরত হাজেরা (আ.) পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করেছিলেন। সাফা পাহাড় থেকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো। হজ্জে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাত চক্কর দৌড়ানোকে সাঈ বলা হয় (কাওয়াইদুল ফিক্হ)।

যে তাওয়াফের পর সাঈ রয়েছে সে তাওয়াফ সমাপ্ত করে হাজরে আসওয়াদের নিকট আসবে। এবং সম্ভব হলে তাতে চুম্বন করবে। চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে। তাওয়াফে কুদূমের পর সাঈ না করলে তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায আদায় করার পর হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করতে হবে না। হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার পর বাবুস্ সাফা নামক দরজা দিয়ে মসজিদুল হারাম থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করবে। বাবুস্ সাফা দিয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব। অন্য দরজা দিয়ে বের হওয়া ও জায়িয। মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হবে। সাঈর সময় সাফা মারওয়া পাহাড়ে আরোহন করা সুন্নাত। আরোহণ না করা মাকরূহ। সাফা পাহাড়ে ঐ পরিমাণ আরোহণ করবে যাতে বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখা যায় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাফা পাহাড়ের নিকটে পৌছে তাতে আরোহণের আগে নিম্নের দু'আটি পড়বে (ইরশাদুস্ সারী)।

اَبْدأُ بِمَا بَدأُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ اِنَّ صَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

তারপর সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে দাড়াবে এবং উভয় হাত উপরের দিকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। তারপর তিনবার আল্লাহ্র হামদ-সানা পাঠ করবে এবং উচ্চস্বরে তিনবার তাক্বীর ও তাহ্লীল পাঠ করবে। এরপর দরূদ শরীফ পাঠ অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের জন্য এবং সকল মু'মিন মুসলমানের জন্য আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করবে। এটাও দু'আ কবুলের স্থান (ইরশাদুস্ সারী)।

এ সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করা ভাল (ইরশাদুস্ সারী)।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْلَا نَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمْنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَاكُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَا اَنْ هَدَا نَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَ يُمِيْتُ وَ هُوَحَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَ اَعَزَّ جُنْوْدَهٗ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَ لَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِى

www.pathagar.com

لِلْاِسْلَامِ اَسْئَلُكَ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَوَفَّانِيْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَشَايِخِيْ وَ لِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

এছাড়াও যে কোন দু'আ করতে পারবে। এ স্থানে দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে দু'আ করবে। তাড়াহুড়া করবে না। কমপক্ষে ২৫ আয়াত তিলাওয়াত করা যায় পরিমাণ সময় দু'আ করবে। তারপর যিক্‌র আযকার ও দু'আ করতে করতে স্বাভাবিক অবস্থায় পায়ে হেঁটে হেঁটে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবে (ইরশাদুস্ সারী)।

সাফা মারওয়ার মধ্য খানে পৌছে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে।

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

সাঈ করার সময় সবুজ বাতি থেকে মৃদু দৌড়িয়ে চলবে। সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করে আবার স্বাভাবিক গতিতে চলবে। এভাবে সাঈ করে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে আরোহণ করবে। তারপর কিব্‌লামূখী দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হামদ-সানা করবে এবং তাক্‌বীর ও তাহ্‌লীল পাঠ করে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে। মারওয়াতেও তাই করবে যা সাফা পাহাড়ে করেছে। এতে এক চক্কর পূর্ণ হবে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আরেক চক্কর। এভাবে সাত চক্কর সম্পন্ন করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাঈর প্রত্যেক চক্করে সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে মৃদু দৌড়িয়ে চলা সুন্নাত। সাঈ সমাপ্ত করে মাতাফে এসে দুই রাক'আত নামায আয় করা মুস্তাহাব (ইরশাদুস্ সারী)।

## সাঈ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

সাঈ সহীহ্ হওয়ার শর্ত সাতটি ঃ

১. সাফা এবং মারওয়ার মধ্যখানে সাঈ করা। পায়ে হেঁটে সওয়ার হয়ে অথবা কোন কিছুর উপর আরোহণ করে যে কোনভাবেই সাঈ করা যায়।

২. পূর্ণ তাওয়াফের পর সাঈ করা অথবা তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর আদায় করে সাঈ করা। পূর্ণ তাওয়াফের আগে অথবা তাওয়াফের অধিকাংশ চক্করের আগে সাঈ করলে সাঈ সহীহ্ হবে না। অবশ্য চার চক্করের পর সাঈ করলে সাঈ সহীহ্ হবে।

৩. সাঈ করার পূর্বে হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা। ইহ্‌রামের পূর্বে সাঈ করলে তা সহীহ্ হবে না।

৪. সাঈ সাফা থেকে আরম্ভ করে মারওয়াতে গিয়ে শেষ করা। মারওয়া থেকে সাঈ আরম্ভ করলে মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্তের এ চক্করটি সাঈ হিসাবে গণ্য হবে না।

www.pathagar.com

৫. সাঈ সহীহ্ হওয়ার জন্য তার পূর্ববর্তী তাওয়াফটি পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন হতে হবে।

৬. সাঈর নির্ধারিত সময়ে সাঈ সম্পন্ন করা। এটা হজ্জের সাঈর জন্য শর্ত। উমরার সাঈর জন্য এটা শর্ত নয়। অবশ্য যদি কিরান বা তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি উমরা পালন করে তবে তাঁর উমরার সাঈ ও নির্ধারিত সময়ে হওয়া আবশ্যক। হজ্জের সাঈর নির্ধারিত সময় হচ্ছে হজ্জের মাস সমূহ আরম্ভ হওয়া। হজ্জের মাস সমূহের আগে সাঈ করলে সাঈ সহীহ্ হবে না।

৭. সাঈর অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করা। যদি অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন না করা হয় তবে সাঈ সহীহ্ হবেনা (ইরশাদুস্ সারী)।

## সাঈর ওয়াজিবসমূহ

সাঈর ওয়াজিব ৪টি ঃ

১. সাত চক্কর পূর্ণ করা। অর্থাৎ ফরয চার চক্করের পর আরো তিন চক্কর পূর্ণ করা। কেউ যদি এই তিন চক্কর ছেড়ে দেয় তবে তার সাঈ সহীহ্ হবে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া প্রতি চক্করের পরিবর্তে সাদাকা করা ওয়াজিব হবে।

২. কোন ওযর না থাকলে পায়ে হেঁটে সাঈ করা। ওযর থাকলে সওয়ার হয়ে বা অন্যভাবেও সাঈ করা জায়িয আছে। অবশ্য বিনা ওযরে সাওয়ার হয়ে সাঈ করলে দম ওয়াজিব হবে।

৩. উমরার সাঈর ক্ষেত্রে উমরার ইহ্রাম সাঈ পর্যন্ত বহাল রাখা।

৪. সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ পথ সাঈ করা। অর্থাৎ সাফা থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়া পাহাড়ের উপর আরোহণ করা (ইরশাদুস্ সারী)।

## সাঈর সুন্নাতসমূহ

সাঈর সুন্নাত পাঁচটি ঃ

১. তাওয়াফের পর পরই সাঈ আরম্ভ করা।

২. সাফা ও মারওয়ার উভয় পাহাড়ের আরোহণ করা।

৩. সাঈর চক্কর সমূহ পরপর সমাপন করা।

৪. সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে মৃদু দৌড়িয়ে চলা।

৫. সতর ঢাকা।

যদিও সতর ঢাকা সর্বাবস্থায় ফরয। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সতর ঢাকার উপর আরো অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (ইরশাদুস্ সারী)।

## সাঈর মুস্তাহাবসমূহ

নিম্নোক্ত কাজ গুলো সাঈর মধ্যে মুস্তাহাব ঃ

www.pathagar.com

১. সাঈর অবস্থায় হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও যিক্‌র আযকার পাঠ করা.

২. শরীর ও কাপড় হুকমী ও হাকীকী নাপাকা থেকে পাক হওয়া.

৩. নিয়্যত করা.

৪. বিনয়ের সাথে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহন করা এবং পাহাড়দ্বয়ের উপর দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকা।

৫. তিনবার করে যিক্‌র ও দু'আ পাঠ কর.

৬. সাঈর চক্কর সমূহের মধ্যে বিনা ওযরে খুব বেশী ব্যবধান হলে নূতন করে সাঈ আরম্ভ করা.

৭. সাঈ সম্পন্ন করে মসজিদুল হারামের ভিতর দুই রাক'আত নামায আদায় করা (ইরশাদুস্ সারী)।

## সাঈর মুবাহ্ কাজসমূহ

সাঈ করা অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজ সমূহ মুবাহ্ ঃ

১. জায়িয কথা যা সাঈতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

২. সাঈর চক্কর সমূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে না এরূপ পানাহার।

৩. জামা'আতে ফরয নামায আদায়ের জন্য সাঈর চক্কর সমূহ তরক করা এবং পরে তা আদায় করা.

৪. জানাযার নামায আদায়ের জন্য সাঈর চক্কর সমূহ তরক করা এবং তা পরে আদায় করা। ফরযে কিফায়ার দায়িত্ব আদায়ের জন্য কোন লোক না থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য এ দায়িত্ব আদায়ের জন্য কোন লোক না থাকলে তার উপর জানাযা আদায়ের জন্য চক্কর সমূহ তরক করা ফরয হয়ে যাবে (ইরশাদুস্ সারী)।

## সাঈর মাকরূহ সমূহ

সাঈ করা অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজ সমূহ মাকরূহ্ ঃ

১. বিনা ওযরে সাওয়ার হয়ে সাঈ করা।

২. সাঈর চক্কর সমূহের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান করা।

৩. সাঈ অবস্থায় এমন ধরনের বেচা-কেনা এবং কথাবার্তা বলা যার ফলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দু'আ কালাম ইত্যাদি পাঠ করতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় অথবা সাঈর চক্কর সমূহ পর পর আদায় করা সম্ভব না হয়।

৪. সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহন না করা।

৫. সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে দ্রুত গতিতে না চলা।

৬. নির্ধারিত সময়ের পরে বিলম্বিত করে সাঈ আদায় করা।

www.pathagar.com

৭. সাঈর অবস্থায় সতর না ঢাকা (ইরশাদুস্ সারী)।

## সাঈর মাসাইল

ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীর জন্য উত্তম হল তাওয়াফে কুদূমের পর সাঈ না করে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করা। সাঈর অবস্থায় জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেলে সাঈ বন্ধ করে জামা'আতে শরীক হবে। তারপর নামায থেকে ফারিগ হয়ে যেখানে এসে সাঈ শেষ হয়েছে পুনঃরায় সেখান থেকে আরম্ভ করবে। জানাযা নামাযের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কিরান হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য উত্তম হল, তাওয়াফে কুদূমের সাথে সাথেই সাঈ করা। তাওয়াফের পর সাঈ করা ওয়াজিব। তবে সাথে সাথে করা ওয়াজিব নয়। বরং সুন্নাত। ওযর বা ক্লান্তিজনিত কারণে তাওয়াফের পর সাঈ করতে না পারলে তাতে কোন দোষ হবে না। তবে বিনা ওযরে বিলম্ব করা ভাল নয়। অবশ্য এরূপ করলে এতে দম ওয়াজিব হবে না (শামী ২য় খণ্ড)।

সাঈর করার জন্য বাবুস্ সাফার পথে বের হওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য অন্য পথে যাওয়া ও জায়িয আছে। হজ্জের সাঈ যদি তাওয়াফে কুদূমের পর আদায় করা হয় তবে সে সাঈ অবস্থায় হাজী তালাবিয়া পাঠ করবে। কিন্তু উমরাকারী ব্যক্তি সাঈ অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝখানে মৃদু দৌড়িয়ে চলবে। অর্থাৎ রমল থেকে একটু বেশী। সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উপরোক্ত নিয়মে দৌড়ানো সম্ভব না হলে স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। অবশ্য যখন সম্ভব হবে অর্থাৎ কোন ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে তখনই উক্ত নিয়মে দৌড়িয়ে চলবে। যদি কোন অবস্থাতেই দৌড়িয়ে চলা সম্ভব না হয় তবে দৌড়ে চলা ব্যক্তির মত শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে চলবে (শামী ২য় খণ্ড)।

## মাথা মুণ্ডান ও চুল ছাটার মাসাইল

সাঈ সম্পন্ন করে তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি মাথার চুল মুণ্ডাবে অথবা তা ছেটে নিবে। অনুরূপভাবে উমরা আদায়কারী ব্যক্তিও সাঈর পর নিজের মাথার চুল মুণ্ডাবে বা তা ছেটে নিবে। মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটার পর উমরা আদায়কারী ব্যক্তি এবং হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি হালাল হয়ে যাবে। এবং ইহ্রামের কারণে তাদের জন্য যে সব কাজ নিষিদ্ধ ছিল তা জায়িয হয়ে যাবে। হজ্জের জন্য পুনঃরায় ইহ্রাম না বাঁধা পর্যন্ত হালাল অবস্থায়ই মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করবে। তারপর যিলহজ্জের আট তারিখে অথবা এর পূর্বে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধবে। মক্কা মুকাররমায় অবস্থান কালে যতবেশী সম্ভব নফল তাওয়াফ ও নফল নামায আদায় করবে। মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য নফল তাওয়াফ নফল নামায অপেক্ষা উত্তম। অবশ্য মক্কাবাসী লোকদের জন্য নফল নামায নফল তাওয়াফ অপেক্ষা উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### মক্কা থেকে মিনা, মিনা থেকে আরাফা, আরাফা থেকে মুজদালিফায় রওয়ানার সময় ও করণীয়

#### মক্কা থেকে মিনায় রওয়ানার সময় ও করণীয়

৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ সকলেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। অবশ্য এর পূর্বে রওয়ানা করাও জায়িয। তবে প্রথমটি উত্তম। হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী হাজীগণ মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নিবে। কিন্তু কিরান হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তিকে নতুনভাবে ইহ্রাম বাঁধতে হবে না।

কেউ যদি ৮ ই যিলহজ্জ যুহরের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেউ যদি ৯ই যিলহজ্জ মক্কায় ফজরের নামায আদায় করার পর আরাফা চলে যায় এবং মিনার উপর দিয়ে যায় তবুও জায়িয আছে। তবে এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত তরীকার খেলাফ করার কারণে সে মন্দ কাজ করল (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি ৮ই যিলহজ্জ শুক্রবার হয় তবে দুপুরের পূর্বে মক্কা থেকে মিনায় গমন করা জায়িয। দুপুর পর্যন্ত মক্কা থেকে রওয়ানা না করলে জু'মুআর নামায আদায় না করে মক্কা থেকে বের হবে না।

মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় এবং সেখানে অবস্থানকালে বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। মিনায় পৌছে সেখানে রাত যাপন করবে এবং ফজর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। এ দিনের ফজরের নামায ইসফার তথা আকাশ কিছুটা পরিস্কার হওয়ার পর আদায় করা মুস্তাহাব (শামী, ২য় খণ্ড)।

৮ ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। মিনা ছাড়া অন্য কোথাও রাত যাপন করা সুন্নাতের পরিপন্থী (শামী, ২য় খণ্ড)।

#### মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ও করণীয়

৯ই যিলহজ্জ সূর্য উদয়ের কিছুক্ষণ পরে যখন এর আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। যাব পাহাড়ের পথে আরাফায় যাওয়া মুস্তাহাব। এটা মসজিদে খায়েফ বরাবর একটি পাহাড়। তাকবীর, তাহলীল, তালবিয়া দু'আ, যিক্র এবং দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে গাম্ভীর্য ও বিনয় সহকারে আরাফার দিকে গমন করবে।

সুব্হি সাদিকের পূর্বে অথবা ফজরের পূর্বে অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফায় গমন করা জায়িয। কিন্তু সুন্নাতের খেলাপ।

www.pathagar.com

আরাফায় যাওয়ার সময় নিম্নের দু'আটি পড়া মুস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ وَجْهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلْ ذُنُوْبِىْ مَغْفُوْرًا وَ حَجِّىْ مَبْرُوْرًا وَّارْحَمْنِىْ وَ لَا تُخَيِّبْنِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِىْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

যখন জাবালে রহমতের উপর নযর পড়বে তখন বেশী বেশী করে তাসবীহ্, তাহলীল ও তাকবীর পাঠ এবং ইস্তিগফার করবে। তারপর থেকে নিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে খুব বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে (ইরশাদুস্ সারী)।

## আরাফার ময়দান ও আরাফা দিবসের ফযীলত

আরাফা মক্কা থেকে প্রায় নয় মাইল এবং মিনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত একটি ময়দানের নাম। আরাফার সীমানা নির্ধারিত রয়েছে। বর্তমানে এর চতুর্দিকে নির্দেশিকা স্তম্ভ স্থাপিত আছে।

৯ ই যিলহজ্জ তথা আরাফা দিবসের ফযীলত অনেক বেশী। হাদীসে এ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আরোপ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ এমন কোন দিন নেই যাতে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য দিনের তুলনায় আরাফার দিনে তার বান্দাদেরকে অধিক সংখ্যক হারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। সেদিন তিনি তাদের অতি নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফিরিশ্তাগণের সাথে গর্ব করেন এবং বলেন, তারা কী চায় (আমি তাদেরকে তা দিব) (মিশকাত)।

অপর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সা.) বলেন ঃ শ্রেষ্ঠতম দু'আ হল, আরাফা দিবসের দু'আ। আরাফার দিনে আমি যে দু'আ করেছি আমার পরবর্তী নবীগণ যে দু'আ করেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'আটি হল ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অন্য এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ আরাফার দিন অপেক্ষা অন্য কোন দিনে শয়তানকে এত অধিক অপমানিত ধিকৃত, হীন ও রাগান্বিত অবস্থায় দেখা যায় না। এর কারণ এই যে, সে দিন সে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হতে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাদের বড় বড় গুনাহ মাফ হতে দেখতে পায়। কিন্তু বদরের দিনে যা দেখা গিয়েছিল অর্থাৎ শয়তানের অবস্থা আরো করুন এবং আরো বিপর্যস্ত ছিল। কেউ প্রশ্ন করলেন, বদরের দিন কি দেখা গিয়েছিল? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সেদিন সে নিশ্চিতরূপে দেখেছিল যে, হযরত জিব্রাইল (আ.) ফিরিশ্তাগণকে সারিবদ্ধ করছেন (মিশ্কাত)।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ আরাফার দিনে আল্লাহ্ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং হাজীগণকে নিয়ে ফিরিশ্তাগণের সাথে গর্ব করে বলেন, দেখ আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার নিকট এলোমেলো কেশে ধুলায় ধুলায়িত অবস্থায়,

www.pathagar.com

ফরিয়াদ করতে করতে বহু দূর দূরান্ত হতে এসেছে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।

তখন ফিরিশ্তাগণ বলেন, হে আমার প্রতিপালক ! অমুককে তো বড় গুণাহগার ধারনা করা হয় আর অমুক পুরুষ ও স্ত্রীকেও। তিনি বললেন ঃ তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তাদেরও মাফ করে দিলাম।"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ অন্যান্য দিন অপেক্ষা আরফার দিনে আল্লাহ্ তা'আলা অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় (মিশকাত)।

### আরাফার ময়দানে উকূফের (অবস্থানের) হুকুম ও সময়

আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয। উকূফের সময় হল, ৯ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে কেউ যদি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, ঘুমন্ত বা জাগ্রত, সুস্থ, পাগল কিংবা বে-হুশ, অবস্থায়ও এ স্থানে অবস্থান করে তবে তার হজ্জ সহীহ্ হয়ে যাবে। তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি উকূফে আরাফার সময়ের মধ্যে আরাফার ময়দানের উপর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে চলে যায় তবুও হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ যদি এ সময়ের আগে বা পরে আরাফার ময়দানে অবস্থান করে তবে তার হজ্জ সহীহ্ হবে না।

ইহ্রাম বাঁধার পর কেউ যদি ৯ই যিলহজ্জে আরাফার ময়দানে উকূফ করতে না পারে, এমতাবস্থায় যদি ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক হয়ে যায় তাহলে তার হজ্জ আদায় হবে না, এবং হজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো আদায় করতে হবে না। বরং উক্ত ব্যক্তির হজ্জের ইহ্রাম উমরার ইহরামে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কাজেই সে উমরা আদায় করে হালাল হয়ে যাবে। অবশ্য পরবর্তী বছর এ হজ্জের কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। হজ্জের মধ্যে দিন আগে এবং রাত পরে আসে। অবশ্য হজ্জ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রাত আগে এবং দিন পরে আসে বলে ধর্তব্য হয়ে থাকে। কাজেই ৯ই যিলহজ্জ দিনে এবং দিবাগত রাতে উভয় সময়েই উকূফ করা জায়িয। আরাফার ময়দান সবটাই মাওকিফ তথা অবস্থানের জায়গা। সুতরাং আরাফার যে কোন স্থানে অবস্থান করা জায়িয। অবশ্য 'বতনে উরানা' নামক স্থানে অবস্থান করা জায়িয নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### উকূফে আরাফার শর্ত

উকূফে আরাফা সহীহ্ হওয়ার শর্ত পাঁচটি ঃ

১. মুসলমান হওয়া। কাফিরের উকূফ সহীহ্ নয়।

২. সহীহ্ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা। সুতরাং উমরা বা ফাসিদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে অথবা বিনা ইহ্রামে উকূফ করলে উকূফ সহীহ্ হবে না।

৩. উকূফের স্থান অর্থাৎ আরাফার ময়দানে উকূফ করা। আরাফার ময়দানের বাইরে উকূফ

www.pathagar.com

করলে তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হলেও উকূফ সহীহ্ হবে না।

৪. উকূফের সময় হওয়া। অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ সুবিহ সাদিক পর্যন্ত সময়ের যে কোন সময়ে উকূফ করা।

৫. আরাফার ময়দানে উকূফের সময় উকূফ করা। এক মুহূর্তের জন্য হলেও তা করা। এটা উকূফের রুকন এ ক্ষেত্রে উকূফের নিয়্যত করা বা না করা, আরাফার ময়দান সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা বা না থাকা, ঘুমন্ত থাকা বা জাগ্রত থাকা, সুস্থ্ থাকা বা বেহুশ থাকা, পাগল বা মাতাল থাকা, অবস্থান করা বা পথ অতিক্রম করে যাওয়া এবং রাতে উকূফ করা বা দিনে উকূফ করা ইত্যাদিতে হুকুমের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। সব অবস্থায়ই উকূফ আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে উযূহীন বা হায়িয ও নিফাস অবস্থায় উকূফ করলেও তা সহীহ্ হয়ে যাবে (ইরশাদুস্ সারী)।

সামান্য কিছু সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা উকূফে আরাফার মধ্যে ফরয। অবশ্য দ্বিপ্রহর থেকে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত আরাফায় করা ওয়াজিব (ইরশাদুস্ সারী)।

## উকূফের সুন্নাতসমূহ

১. উকূফের জন্য গোসল করা।
২. মসজিদে নামিরাতে খুত্বা প্রদান।
৩. সূর্য হেলে যাওয়ার পর যুহরের নামাযের পূর্বে খুত্বা দেওয়া।
৪. যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা।
৫. উভয় নামায একত্রে আদায় করার পর বিলম্ব না উকূফ করা।
৬. আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে ইমামের সাথে মুযালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা। ওযরের কারণে বিলম্বে রওয়ানা করলে তাতে কোন দোষ নেই (ইরশাদুল সারী)।

## উকূফের মুস্তাহাবসমূহ

১. বেশী বেশী করে তালবিয়া, পাঠ করা এবং যিক্র ও ইস্তিগফার করা।
২. বিনয় ও একাগ্রতার সাথে উকূফ করা।
৩. দু'আ কবূলের ব্যাপারে প্রবল আশা পোষণ করা।
৪. ইমামের পিছনে তাঁর নিকটে উকূফ করা। অবশ্য ইমামের সামনে উকূফ করাও জায়িয।
৫. কিব্লামুখী হয়ে উকূফ করা।
৬. দ্বিপ্রহরের পূর্বেই উকূফের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।
৭. মনে মনে উকূফের নিয়্যত করা।
৮. হাত উঠিয়ে দু'আ করা।
৯. তিন তিনবার করে দু'আ পাঠ করা।

www.pathagar.com

১০. হামদ ও দরূদ শরীফের সাথে দু'আ শুরু এবং শেষ করা।
১১. পাক-পবিত্র অবস্থায় উকূফ করা।
১২. সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা অপারগ-ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা। কারো কারো মতে এ দিনে রোযা রাখা মাক্রূহ। কেননা রোযা রাখলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং হজ্জের আমল ঠিকমত আদায় করা কষ্টকর হতে পারে এ জন্য এদিনে রোযা না রাখাই উত্তম।
১৩. সম্ভব হলে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে উকূফ করা।
১৪. উকূফ অবস্থায় তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা।
১৫. সাওয়াবের কাজ বেশী-বেশী করে করা। যেমন হাজীদেরকে পানাহার কারানো এবং ফকীর মিস্কীনকে দান-সাদাকা করা ইত্যাদি (ইরশাদুস্ সারী)।

### উকূফের মাকরূহ কাজসমূহ

১. যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করার পর বিলম্বে উকূফ করা।
২. বতনে উরানা নামক স্থানে উকূফ করা।
৩. যাতায়াতের রাস্তায় উকূফ করা।
৪. দ্বিপ্রহের পূর্বে খুত্বা প্রদান করা।
৫. উকূফকালে অমনোযোগী থাকা।
৬. বিনা ওযরে সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে রওয়ানা করতে বিলম্ব করা।
৭. সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে রওয়ানা করা। যদিও এ সময় আরাফা অতিক্রম না করে থাকে।
৮. মাগরিব ও ইশার নামায আরাফার ময়দানে অথবা রাস্তায় আদায় করা।
৯. রাস্তায় এত দ্রুত চলা যার ফলে অন্য লোকদের কষ্ট হয় (ইরশাদুস্ সারী)।

### উকূফে আরাফার বিভিন্ন মাসাইল

'বতনে উরানা' ব্যতীত আরাফার সব জায়গায় উকূফ করা জায়িয। কিন্তু জাবালে রহমতের নিকটে উকূফ করা উত্তম। অন্যান্য লোকজন যেখানে অবস্থান করে সেখানে অবস্থান করবে। অন্যান্য হাজীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা কোথাও অবস্থান করবে না। জুনূবী – হায়িয ওয়ালী মহিলা এবং যে ব্যক্তি যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করেনি তারা সকলেই উকূফে আরাফা করতে পারবে। এতে তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

আরাফার ময়দানে পৌছে তালবিয়া ও দরূদ শরীফ বেশী বেশী করে পাঠ করবে। নিজের জন্য মাতা-পিতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য উলামা ও মাশায়িখে কেরামের জন্য এবং জীবিত ও মৃত সমস্ত মু'মিন মুসলমানদের জন্য দু'আ করবে।

এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়া উত্তম (ইরশাদুস্ সারী)।

www.pathagar.com

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَ يُمِيْتُ هُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

দু'আ করার সময় উভয় হাত উঠিয়ে কিব্লামুখী হয়ে দু'আ করবে। দু'আর আগে হামদ-সানা, তাক্বীর, তাহ্লীল ইত্যাদি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পড়ে দু'আ করবে। কিছুক্ষণ পর পরই তালবিয়া পাঠ করবে। খুব বিনয় ও খুশু ও খুযুর সাথে দু'আ করবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে দু'আর মধ্যে মশগুল থাকবে। নির্দিষ্ট কোন দু'আ পড়া এ ক্ষেত্রে জরুরী নয়। যে কোন দু'আ যে কোন ভাষায় করা জায়িয আছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নের দু'আটি পাঠ করা ভাল ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَ لَا نَعْرِفُ رَبًّا سِوَاهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَ يَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ اَللّٰهُمَّ هٰذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيْرِ الْعَائِذِ مِنَ النَّارِ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ وَادْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِذْ هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْهُ عَنِّىْ وَ لَا تَنْزِعْنِىْ عَنْهُ حَتّٰى تَقْبِضَنِىْ وَ اَنَا عَلَيْهِ

উচ্চ আওয়াজে দু'আ না করে আস্তে আস্তে দু'আ করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## আরাফার ময়দানে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করা

৯ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইমাম মিম্বরের উপর আরোহণ করবে এবং তাঁর মিম্বরে বসা অবস্থায় মুআয্যিন আযান দিবে। তারপর ইমাম দাঁড়িয়ে দু'টি খুতবা দিবে এবং উভয় খুতবার মাঝে বসবে। যেমন জুমু'আর নামাযে করা হয়ে থাকে। বসে খুত্বা পড়া জায়িয আছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। দ্বিপ্রহরের পূর্বে খুত্বা প্রদান করলে অথবা খুত্বা তরক করলে তাতে হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। খুত্বার মধ্যে ইমাম আরাফা ও মুযদালিফার অবস্থান, যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন, কংকর নিক্ষেপ, কুরবাণী, তাওয়াফে যিয়ারত এবং হজ্জের যাবতীয় মাসআলা-মাসাইল সম্বন্ধে আলোচনা করবে। এরপর মিম্বর হতে অবতরণ করে উপস্থিত মুসল্লীদের নিয়ে যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসরের নামায এক আযান ও দুই ইকামতে আদায় করবে। তবে কিরাআত অনুচ্চ স্বরে চুপে চুপে পাঠ করবে। এই দুই নামাযের মধ্যে যুহরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়বে না। এই দুই নামাযের মধ্যে নফল আদায় করা বা পানাহার করা মাকরূহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইমাম আসরের নামায আরম্ভ করতে বিলম্ব করলে এ অবস্থায় উভয় নামাযের মাঝখানে মুক্তাদীদের নফল নামায পড়া মাকরূহ নয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

মুকীম ব্যক্তি ইমাম হলে যুহর ও আসরের নামায পূর্ণ তথা চার রাক'আত করে আদায় করবে। অনুরূপভাবে মুক্তাদীগণ ও চার রাক'আত আদায় করবে। মুক্তাদী মুকীম হোক বা

www.pathagar.com

মুসাফির তাতে কোন পার্থক্য নেই।

মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হলে তিনি কসর আদায় করবেন। মুসাফির মুক্তাদীদের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য। অবশ্য মুকীম মুক্তাদীগণ ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে বাকী দুই রাক'আত যথানিয়মে পূরা করে নিবে। মুকীম ইমামের জন্য যুহর ও আসরের নামাযে কসর পড়া জায়িয নেই। যে ইমাম এরূপ করে তার পেছনে মুসাফির মুক্তাদীদের ইক্তিদা জায়িয নেই (ইরশাদুস্ সারী)।

আরাফার ময়দানে জুমু'আর নামায আদায় করা জায়িয নেই (ইরশাদুস্ সারী)।

আরাফার ময়দানে যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা সুন্নাত (শামী, ২য় খণ্ড)।

## যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করার শর্ত

যুহর ও আসরের নামায একত্রিত করে যুহরের ওয়াক্তে আদায় করার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে ঃ

১. যুহরের নামায আসরের নামাযের পূর্বে আদায় করা।
২. যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ হওয়া।
৩. আরাফার ময়দান হওয়া।
৪. হজ্জের ইহ্রাম অবস্থায় উভয় নমায আদায় করা।
৫. জামা'আতে নামায আদায় করা।
৬. ইমামুল হজ্জ বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি এ জামা'আতের ইমামত করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## উকূফে আরাফার মাসনূন তরীকা

যুহর ও আসরের নামায আদায় করার পর ইমাম এবং মুসল্লীগণ সকলেই মাওকিফে অবস্থান করবে। দাঁড়িয়ে উকূফ করবে। বসে বা শুয়ে উকূফে করবে। জাবালে রহমতের নিকটে উকূফ করবে। উকূফের সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। সম্ভব হলে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। অন্যথায় ইমামের ডানে সামনে বায়ে অথবা যে কোন স্থানে দাঁড়াবে। উকূফের সময় উভয় হাত উত্তোলন ও প্রসারিত করে দু'আ পড়তে থাকবে। এরপর তাক্বীর, তাহ্লীল, তাসবীহ্, তালবিয়া এবং দরূদ পাঠ করে মোনাজাত করবে। খুব কাকুতি মিনতি করে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করবে।

এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়া উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ

তারপর পড়বে ঃ

www.pathagar.com

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم

এ সময় নিজের জন্য পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করনব। এরপর পড়বে ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلاَةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَاب

আরো বলবে ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْراً

আরো পড়বে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْم

কবুলিয়্যতের ব্যাপারে দৃঢ় আশা নিয়ে দু'আ করবে। আস্তে আস্তে অনুচ্চ স্বরে দু'আ করা উত্তম। অবশ্য তালবিয়া উচ্চ আওয়াজে পাঠ করবে। তবে বেশী জোরে নয়। দু'আর বাক্যসমূহ তিন তিনবার করে পাঠ করবে। আল্লাহ্‌র হামদ-সানা, তাকবীর, তাসবীহ্ এবং দরূদ শরীফ পাঠ করে দু'আ শুরু ও শেষ করবে। দু'আর শেষে আমীন বলবে। উকূফে আরাফার সময় বিভিন্ন দু'আ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। উকূফে আরাফার সময় তিনি নিম্নের দু'আটি বেশী বেশী করে পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ نَقُوْلُ وَ خَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ وَ اِلَيْكَ مَاٰبِىْ وَ لَكَ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسْوَسَةِ الصُّدُوْرِ وَ شَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ

আরাফার দিন বিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرٰى مَكَانِىْ وَ يَسْمَعُ كَلاَمِىْ وَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَ عَلاَنِيَتِىْ وَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ اَمْرِىْ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الوحل الْمُشْفِقِ الْمُقِرِ الْمُعْتَرِف بِذَنْبِهِ اَسْاَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَ ابْتَهِلْ اِلَيْكَ

www.pathagar.com

ابْتَهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَ اَدْعُوْكَ بِدُعَاءِ الْخَائِفِ الشُّرُوْرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَ فَاضَتْ لَكَ عَيْنَا وَ تَجِلُّ لَكَ جَسَدُهُ وَ رَغِمَ اَنْفِهِ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِى بِدُعَاكَ رَبِّىْ شَقِيًّا وَ كُنْ بِىْ رَؤُفًا رَحِيْمًا يَا خَيْرُ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَ يَا خَيْرُ الْمُعْطِيْنَ

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ আরাফার দিন বিকালে কোন মুসলিম ব্যক্তি কিব্লামুখী হয়ে

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

একশ' বার সূরা ইখ্লাস একশ'বার এবং

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ

একশ' বার পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার ফিরিশ্তাগণ। আমার এ বান্দার কি প্রতিদান হতে পারে, যে আমার তাস্বীহ্, তাহ্লীল, তাক্বীর পাঠ করেছে ও আমার বড়ত্ব বর্ণনা করেছে, আমার মারিফাত লাভ করেছে, আমার প্রশংসা করেছে এবং আমার নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেছে? হে আমার ফিরিশ্তাগণ ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এব তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করলাম। আর আমার বান্দা যদি আমার নিকট দু'আ করে তবে আরাফায় অবস্থানকারী সকলের ব্যাপারে আমি তার সুপারিশ কবুল করব। এছাড়া আরো যে দু'আ ইচ্ছা করতে পারবে (ইরশাদুস্ সারী)।

যুহরের আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে দু'আ ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে। দু'আর মাঝে কিছুক্ষণ পর পর তালবিয়া পাঠ করবে। পাক পবিত্র অবস্থায় আরাফায় উকূফ করবে। এ সময় হারাম বস্তু পানাহার করা, হারাম পোশাক পরিধান করা, হারাম বস্তুর প্রতি নযর করা এবং নাজায়িয কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে (ইরশাদুস সারী)।

### আরাফা থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এবং গাম্ভীর্যের সাথে আরাফা থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় চলা উত্তম। অবশ্য ভিড় না থাকলে কিছু দ্রুত চলবে। ইমামের সাথে আরাফা থেকে রওয়ানা করবে। ইমামের আগে রওয়ানা করবে না। কিন্তু সূর্যাস্তের পর ইমাম যদি রওয়ানা করতে বিলম্ব করে তাহলে ইমামের রওয়ানা হওয়ার অপেক্ষা করবে না। রাস্তায় চলার সময় তাকবীর, তাহ্লীল পাঠ করবে, আল্লাহ্র হামদ সানা করবে, মাঝে মধ্যে তালবিয়া পাঠ করবে এবং বেশী বেশী করে ইসতিগফার করবে। যদি

www.pathagar.com

কেউ ভিড় এড়ানোর জন্য ইমামের পূর্বে অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা করে কিন্তু আরাফার সীমা অতিক্রম না করে তবে তাতে কোন দোষ নেই।

যদি ভিড়ের কারণে সূর্যাস্ত এবং ইমামের রওয়ানা করার পরও কেউ আরাফার ময়দানে বিলম্ব করে তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই। পায়ে হেঁটে মুযদালিফায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায়

মাগরিব ও এশার নামায আরাফা ময়দানে কিংবা মুযদালিফার পথে আদায় করবে না। বরং উভয় নামায মুযদালিফা পৌছে এশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করবে। সূর্যাস্তের পর মুযদালিফা পৌছার আগে মাগরিবের নামায আদায় করলে মুযদালিফা পৌছার পর পুনরায় তা আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে এশার ওয়াক্ত হওয়ার পর রাস্তায় এশার নামায আদায় করলে মুযদালিফায় পৌছে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। মুযদালিফা পৌছার আগে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাবে বলে আশংকা দেখা দিলে রাস্তায় মাগরিব ও এশা আদায় করে নিলে তা জায়িয হবে। এশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মুআয্যিন আযান ও ইকামত দিবে। তারপর ইমাম মুসল্লীদেরকে নিয়ে এশার ওয়াক্তে প্রথমে মাগরিবের নামায আদায় করবে। এরপর এশার নামায আদায় করবে। এতদুভয় নামাযের মধ্যে নফল পড়া জায়িয নেই। কিন্তু পড়লে ইকামত পুনরায় বলতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করার জন্য জামা'আত শর্ত নয়। একা পড়াও জায়িয। কিন্তু জামা'আতে পড়া উত্তম। মুযদালিফায় এই দুই নামাযকে একত্রে আদায় করার জন্য বাদশাহ্ বা তার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। এমনিভাবে খুত্‌বা এবং জামা'আত ও শর্ত নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করার শর্তসমূহ

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায়ে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ রয়েছে ঃ

১. হজ্জের ইহ্‌রাম হওয়া। হজ্জের ইহ্‌রাম না থাকলে এই দুই নামায একত্রে আদায় করা জায়িয নয়।

২. উকূফে মুযদালিফার আগে উকূফে আরাফা করা।

৩. ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রি হওয়া। ১০ই যিলহজ্জের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এ দুই নামায একত্রে আদায় করা যায়।

৪. এ একত্রিকরণ মুযদালিফার ময়দানে সংঘটিত হওয়া। মুযদালিফায় পৌছার আগে অথবা মুযদালিফা ত্যাগ করার পর এ দুই নামায একত্রিত করা জায়িয হবে না।

৫. এশার ওয়াক্ত হওয়া। এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে এই দুই নামাযকে একত্রে আদায় করা জায়িয নেই। মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে আরাফার ময়দানে যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা সুন্নাত (ইরশাদুস্ সারী)।

৬. উভয় নামায ক্রমানুসারে আদায় করা। যদি কেউ প্রথমে এশা এবং পরে মাগরিব পড়ে থাকে তবে তাকে এশার নামায পুনঃরায় আদায় করতে হবে।

### মুযদালিফায় রাত্রি যাপন এবং সেখানে করণীয় কাজ

মাগরিব ও এশার নামায আদায় করার পর মুযদালিফায় অবস্থান করবে। এখানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নাত। ওয়াজিব নয়, এ সময় মুযদালিফার যে কোন স্থানে অবস্থান করা জায়িয। মানুষের চলার পথে অবস্থান করবে না। মুযাহ্ পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করা উত্তম। এ রাতে জাগ্রত থাকা, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা, নফল নামায আদায় এবং দু'আ দরূদ ইত্যাদি পাঠ করা মুস্তাহাব। খুব কান্নাকাটি করে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে। এটি দু'আ কবূলের জায়গা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও ইরশাদুস্ সারী)।

### উকূফে মুযদালিফার হুকুম ও সময়

মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব। সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত হল উকূফের সময়। এর আগে বা পরে উকূফ করলে উকূফ আদায় হবে না। কেউ যদি এ সময়ের মধ্যে উকূফ করে অথবা মুযদালিফার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করে যায় তবে তার উকূফ হয়ে যাবে। যদি কেউ সুবহে সাদিকের পূর্বে মুযদালিফার সীমা অতিক্রম করে চলে যায় তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি ভিড়ে আশংকায় সুবহে সাদিকের পূর্বেই সেখান থেকে রওয়ানা করে তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি অতিরিক্ত ভিড়ের আশংকায় কোন মহিলা রাতেই মুযদালিফা থেকে রওয়ানা করে চলে আসে তবে তার উপরও দম ওয়াজিব হবে না (ইরশাদুস্ সারী)।

৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে সুবহে সাদিকের পর ইমামুল হজ্জ অন্ধকার অবস্থায় লোকদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করবে। তারপর ইমাম এবং অন্যান্য সকলেই মুযদালিফার ময়দানে উকূফ করবে। মুযদালিফার সর্বত্রই উকূফ করা জায়িয। কিন্তু ওয়াদীয়ে মুহাস্সারে উকূফ করা জায়িয নয়। ইমামের পিছনে অথবা যেখানে ইচ্ছা উকূফ করবে। উত্তম হল, ইমামের পিছনে কুযাহ পাহাড়ের নিকটে উকূফ করা। উকূফের সময় তাসবীহ্, তাহ্লীল, তাকবীর এবং আল্লাহ্র হামদ-সানা পাঠ করবে। তালবিয়া পড়বে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে। আসমানের দিকে উভয় হাত উত্তোলন করে দু'আ করবে। ওয়াদীয়ে মুসাস্সারে পৌছা মাত্রই দ্রুত চলবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুযদালিফার উকূফ সহীহ্ হওয়ার জন্য উকূফের পূর্বে ইহ্রাম বাধা অবস্থায় থাকা, উকূফে আরাফা করা এবং উকূফে মুযদালিফার স্থান, কাল ও সময় হওয়া শর্ত। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য হলেও উকূফ করা ওয়াজিব। মুযদালিফা নামক

www.pathagar.com

ময়দানে উকূফ করা উকূফে মুযদালিফার রুক্ন (ইরশাদুস্ সারী)।

**মাশ'আরুল হারামে যিক্র্ ও দু'আ**

বিশুদ্ধ মতে মাশ'আরুল হারাম মুযদালিফার একটি বিশেষ বরকতময় স্থান। ভিন্ন মতে এটি একটি ছোট পাহাড় (ইরশাদুস্ সারী )।

এ স্থানে যিক্র করার জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوْا اللّٰهَ كَمَا هَدٰكُمْ

যখন তোমরা আরাফার হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তোমরা মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌছে আল্লাহ্র যিকর করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক যেভাবে তার যিক্র করবে (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)।

মাশআরুল হারামে. নিম্নোক্ত দু'আ সমূহ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَئِىْ وَ جَهْلِىْ وَ اِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جَدِّىْ وَ هَزْلِىْ وَ خَطَئِىْ وَ عَمَدِىْ وَ كُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْكُفْرِ وَ الْفُجُرِ وَ الْكَسَلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ ضَلْعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَقْضِىْ عَنِّى الْمَغْرَمَ وَ اَنْ تَعْفُوَ عَنِّىْ مَظَالِمَ الْعِبَادِ وَ اَنْ تَرْضٰى عَنِّى الْخُصُوْمَ وَ الْغُرَمَاءَ وَ اَصْحَابِ الْحُقُوْقِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَ زَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَ اِذَا اَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ الْوَفْدِ الْمُتَقَبَّلِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ مِنْ ذِكْرِكَ الْغٰفِلُوْنَ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ فِيْهِ

www.pathagar.com

الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ وَ اجْعَلْ لَهُ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى وَ اَدْخِلْنَا فِى شَفَاعَتِهِ اَجْمَعِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

এ সময় বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে ।

**কংকর সংগ্রহ**

হাজীগণ ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়া যায় পরিমাণ সময় বাকী থাকতে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। মুযদালিফা হতে রওয়ানা করার পূর্বে এখান থেকে খেজুরের বীচির ন্যায় ছোট ছোট সত্তরটি কংকর সংগ্রহ করে নেওয়া মুস্তাহাব। অন্য স্থান থেকে সংগ্রহ করাও জায়িয। কিন্তু জামরা যেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়।. থেকে কংকর সংগ্রহ করা মাকরুহ.। মসজিদে খায়ফ এবং নাপাক স্থান থেকে কংকর সংগ্রহ করা মাকরূহ। এ সত্ত্বেও এরূপ স্থান থেকে কংকর সংগ্রহ করে তা নিক্ষেপ করলে তা মাকরূহ অবস্থায় জায়িয হবে। বড় পাথর ভেঙ্গে ছোট ছোট করে কংকর বানানো মাকরূহ। বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করাও জায়িয। কিন্তু মাকরূহ। রমী করার আগে কংকর সমূহ ধুইয়ে করে নেওয়া মুস্তাহাব (ইরশাদুস্ সারী)।

www.pathagar.com

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা

১০ই যিলহজ্জ সুর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে হাজীগণ অত্যন্ত শান্তভাবে ও গাম্ভীর্যের সাথে মুযদালিফা হতে মিনা অভিমুখে রওয়ানা করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রাস্তায় যিক্‌র ও তালিবিয়া পাঠ করতে থাকবে। সুবহে সাদিক হওয়ামাত্র অথবা সূর্যোদয়ের পরে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা করা অনুচিত। কেননা এরূপ করা সুন্নাতের খেলাফ তবে এতে দম বা কোন কিছু ওয়াজিব হয় না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### ১০ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত করনীয় কাজসমূহ

১০ই যিলহজ্জ সুর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। মিনায় পৌঁছে প্রথমে জামরায়ে আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। এরপর কুরবানী করবে। তারপর মাথার চুল কামাবে অথবা ছাঁটবে। এরপর তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করবে। তাওয়াফ শেষে মিনায় এসে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং প্রত্যহ জামরাত্রয়ের উপর কংকর নিক্ষেপ করবে। ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করলে এ তারিখেরও জামরাত্রয়ের উপর কংকর নিক্ষেপ করবে (শামী, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ

মিনায় এমন তিনটি স্থান রয়েছে যে স্থানে কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এ স্থান তিনটিতে তিনটি পাথরের খুটি প্রোথিত আছে। এগুলোকে জামরাত বা জিমার বলা হয়। এদের প্রত্যকটিকে জামরা বলে অভিহিত করা হয়। এগুলোর মধ্যে যেটি মক্কা শরীফের দিকে অবস্থিত সেটিকে 'জামরাতুল আকাবা' বা 'জামরাতুল কুবরা' বলা হয়। আর যেটি মাঝখানে রয়েছে সেটিকে 'জামরাতুল উস্‌তা' বলা হয়। আর তৃতীয়টি যেটি মসজিদে খায়েফের দিকে অবস্থিত সেটিকে 'জামরাতুল উলা' বলা হয়।

১০ই যিলহজ্জ তারিখে শুধু জামরাতুল আকাবায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। কংকর নিক্ষেপের সময় নিম্নভূমিতে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন মিনা ডান দিকে আর কা'বা বাম দিকে থাকে। এর পর তাক্‌বীর বলে বলে এক একটি কংকর নিক্ষেপ করবে। এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়া উত্তম।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَ ذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَ سَعْيًا مَشْكُوْرًا

তাক্‌বীরের বদলে সুবহানাল্লাহ্ অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ইত্যাদি বলাও জায়িয। এ দিন জামরাতুল উলা এবং জামরাতুল উস্‌তায় কংকর নিক্ষেপ করবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ১ম খণ্ড)।

কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। তা তরক করলে দম ওয়াজিব হবে (শামী, ১ম খণ্ড)।

১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকে ১১ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম দিনের কংকর নিক্ষেপ করা যায়। ১১ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর কংকর নিক্ষেপ করলে দম ওয়াজিব হবে। অনুরূপ কেউ যদি ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করে তবে তাতে রমী সহীহ্ হবে না। তবে রমী করার মাসনূন সময় হচ্ছে, ১০ তারিখের সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা। সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা জায়িয। সূর্যাস্তের পর হতে ১১ তারিখের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময় মাকরূহ ওয়াক্ত। তবে ওযর থাকলে মাকরূহ হবে না। সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা, মাকরূহ (শামী, ১ম খণ্ড)।

১০ই যিলহজ্জ জামরাতুল উস্‌তা ও জামরাতুল উলায় রমী করবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মিনায় প্রবেশের পর প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। তারপর অন্য কাজ করবে। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি শাহাদাত অঙ্গুলির তৃতীয় পিঠে স্থাপন করে বৃদ্ধাঙ্গুলি নখের উপর কংকর রেখে তা নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব (শামী, ১ম খণ্ড)।

কংকর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি জামরা হতে অন্তত পাঁচ হাত দূরে দাঁড়াবে। এর চেয়ে বেশী দূরত্বে দাঁড়ালেও জায়িয। অবশ্য এর চেয়ে কম দূরত্বে দাঁড়ানোও জায়িয। অবশ্য এর চেয়ে কম দূরত্বে দাড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাতের বরখেলাপ কাজ। নিক্ষেপের পর কংকর যদি কারো গায়ে লেগে জামার নিকটে গিয়ে পড়ে তবে এতে রমী আদায় হয়ে যাবে। আর তা যদি কোন ব্যক্তির নাড়া দেওয়ার ফলে জামরার নিকটে গিয়ে পড়ে এতে রমী আদায় হবে না (শামী, ১ম খণ্ড)।

জামরাতুল আকাবায় রমী করার পর এখানে দাঁড়িয়ে বিলম্ব করবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যিলহজ্জের ১০ তারিখে জামরাতুল আকাবায় প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু সর্বপ্রকার হজ্জের ক্ষেত্রেই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে (বাহরুর রাইক ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## কুরবানী ও দম

জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর নিজের অবস্থানে চলে আসবে। পথে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হবে না। অতঃপর হজ্জের শুকরিয়া স্বরূপ দমে শোকর (কুরবানী) আদায়

www.pathagar.com

করবে। এই দম আদায় করা মুফরিদের জন্য মুস্তাহাব। কিন্তু কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায় কারীর উপর ওয়াজিব। মুফরিদ ব্যক্তি যদি প্রথমে চুল কামায় বা ছাঁটে অতঃপর কুরবানী অর্থাৎ দমে শোকর আদায় করে তবে তার উপর দমে জেনায়েত অর্থাৎ ত্রুটি জনিত দম ইত্যাদি ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তার জন্য মুস্তাহাব হল প্রথমে রমী করা, পরে দমে শোকর আদায় করা এবং এরপর মাথার চুল মুণ্ডান বা ছাটা। কিরান এবং তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর উপর ওয়াজিব হল প্রথমে দমে 'শোকর' আদায় করা এবং পরে চুল কামানো বা ছাটা। এর ব্যতিক্রম করলে দম ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যে ব্যক্তি নিজে যবাহ্ করতে সক্ষম তার জন্য উত্তম হল, নিজের দম বা কুরবানীর পশু। নিজেই যবাই করা। আর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে যবাহ্ করতে সক্ষম নয় সে অন্যের দ্বারা যবাহ্ করাবে। তবে কুরবানী করার সময় নিজে সামনে উপস্থিত থাকা। এই দম ও কুরবানীর হুকুম আহকামও ঈদুল আযহার কুরবানীর অনুরূপ। যেসব পশু ঈদুল আযহার কুরবানীতে জায়িয এ ক্ষেত্রে ও সেগুলো কুরবানী করা জায়িয। আর যেভাবে ঈদুল আযহার কুরবানীতে গরু,উট ও মহিষে সাত ব্যক্তি শরীক হতে পারে এ ক্ষেত্রেও তেমনি শরীক হতে পারবে। উট,গরু ও মহিষে সাত জনের কমও শরীক হতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কারো অংশ সপ্তমাংশ হতে কম না হয়। ঈদুল আযহায় যে পশু কুরবানী করা জায়িয নেই এ ক্ষেত্রেও তা জায়িয হবে না।

যে হাজী মুসাফির তার উপর ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু মুকীম ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে (শামী, ১ম খণ্ড)।

ইহ্রামের অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ কোন হাজী যদি তা করে তবে তার উপর কোন কোন অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্রী, ভেড়া ও দুম্বা ওয়াজিব হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গরু বা উট কুরবানী করা ওয়াজিব হয়। কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে যে যে শর্ত রয়েছে, এ ক্ষেত্রে ঐসব শর্ত প্রযোজ্য হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## হাদীর মাসাইল

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের নিমিত্তে হাজী সাহেবগণ কুরবানী বা দমে শোকর আদায়ের নিয়্যতে যে সব পশু হরমে নিজেদের সাথে নিয়ে যায় একে শরীয়াতের পরিভাষায় 'হাদী' বলা হয় (শামী ২য় খণ্ড ও মারাকিল ফালাহ্)।

উট, গরু ও বকরী হাদী হিসাবে গণ্য হতে পারে। অন্য প্রকারের পশু হাদী হিসাবে গণ্য হবে না। এ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উট, তারপর গরু, তারপর বকরী (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

যে সব পশু কুরবানী করা জায়িয সেগুলো হাদী হিসাবে নিয়ে যাওয়াও জায়িয। আর যে সব পশুর কুরবানী জায়িয নেই তা হাদী হিসাবে নিয়ে যাওয়াও জায়িয নেই। জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে অথবা আরাফায় উকূফের পরে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে অথবা স্ত্রী সহবাস করলে এই দুই ক্ষেত্রে উট বা গরু দিয়ে দম আদায় করতে হবে দুম্বা বা

www.pathagar.com

বকরী দিয়ে এক্ষেত্রে দম আদায় হবে না. অন্যান্য ক্ষেত্রে দুম্বা ও বক্রী দিয়ে দম আদায় হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হাদীর গলায় চামড়ার টুকরা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদির দ্বারা মালা পরানো সুন্নাত। হাদী যদি উট বা গরু হয় অথবা কিরান কিংবা তামাত্তু অথবা নফল বা মানতের হয় তবে তার গলায় মালা পরানো হবে। বক্রীর গলায় মালা পরানো সুন্নাত নয়। অনুরূপ ইহ্সার (বাধাপ্রাপ্ত হওয়া) ও জিনায়েতের জানোয়ারের গলায়ও মালা পরানো হবে না। তবে কেউ যদি পরায় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হাদী -এর জানোয়ারের উপর সাওয়ার হওয়া উচিত নয়। অনুরূপ হাদীর উপর বোঝা উঠানোও সমীচীন নয়। অনন্যোপায় অবস্থায় হাদীর উপর সাওয়ার হওয়া অথবা বোঝা উঠানো যাবে। তবে এ কারণে যদি হাদীতে কোন খুত দেখা দেয় তবে সেই ক্ষতির সমান টাকা পয়সা মিস্কীনকে সাদাকা করে দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হাদী যদি দুধেল হয় এবং যবহের সময় খুব নিকটবর্তী হয় তবে তা দোহন করবে না। বরং এর স্তন্যে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিবে যেন দুধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। যবাহ্ বিলম্ব করার কারণে দুগ্ধ দোহন না করাতে ক্ষতির আশংকা থাকলে দুগ্ধদোহন করে তা সাদাকা করে দিবে। কিন্তু নিজে ভক্ষণ করলে অনুরূপ পরিমাণ দুধ অথবা এর মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। হাদীর দুগ্ধ ধনী ব্যক্তিকে দান করা জায়িয নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি হাদী বাচ্চা প্রসব করে তবে হয় তা সাদাকা করে দিবে অথবা হাদীর সাথে তাও যবাই করে দিবে। আর বিক্রি করলে এর মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। ওয়াজিব হাদী যদি মরে যায় অথবা ত্রুটি যুক্ত হয়ে যায় তবে এর স্থলে আরেকটি কুরবানী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি যুক্ত জানোয়ারটি যবাই, সাদাকা যা ইচ্ছা করতে পারবে। আর ত্রুটি যুক্ত জানোয়ারটি যদি নফল হাদী হয়ে থাকে তাহলে তা যবাই করবে। এর পর এর রক্ত দ্বারা গলার মালাটি রংগীন করে তার চুটের উপর ছাপ মেরে দিবে। যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে এটি গরীবদের হক। এই রকমের জানোয়ারের গোশ্ত নিজেও ভক্ষণ করবে না এবং কোন বিত্তশালী ব্যক্তিকেও দান করবে না।

উটকে নহর করা এবং গরু, বক্রী ইত্যাদিকে যবাই করা উত্তম। নহ্র অর্থ উটকে দাঁড় করিয়ে তার ঘাড়ের নীচে গলা ও সিনার সংযোগস্থলে বর্শা দিয়ে আঘাত করে রগসমূহ কেটে দেওয়া। গরু, বক্রী ইত্যাদিকে দাঁড় করিয়ে যবাহ্ করা উচিত নয়। বরং এগুলোকে শায়িত করে যবাহ্ করাই সুন্নাত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

দমে তামাত্তু ও দমে কিরান আইয়ামে নহর (কুরবানীর দিন সমূহ) এর মধ্যে যবাহ্ করতে হবে। এ সময়ের পূর্বে যবাহ্ করলে তা সর্বসম্মত মতে জায়িয হবে না। আর আইয়ামে নহরের পরে যবাহ্ করলে জায়িয হবে। কিন্তু বিলম্বের কারণে দম ওয়াজিব হবে। নফল হাদী আইয়ামে নহরের পূর্বেও যবাহ্ করা জায়িয আছে। তবে আইয়ামে নহরের মধ্যে যবাহ্ করা উত্তম। এ ছাড়া অন্য যত প্রকারের হাদী আছে তা বছরের যে কোন সময় যবাহ্ করা জায়িয আছে। হাদীর জানোয়ার হরমের অভ্যন্তরে যবাহ্ করা শর্ত। এর বাইরে যবাহ্ করা জায়িয নেই।

গরীব হোক অথবা ধনী হোক হাজীর জন্য দমে মাতাত্তু ও দমে কিরান হতে ভক্ষণ করা

www.pathagar.com

মুস্তাহাব। নফল হাদী যদি হরমে পৌছার পর যবাহ্ করা হয় তবে তার গোশ্‌ত ভক্ষণ করাও হাজীর জন্য মুস্তাহাব। এভাবে কোন বিত্তশালী ব্যক্তিকেও তা হতে আহার করানো জায়িয আছে। দমে জিনায়েত ও দমে ইহ্‌সার এবং দমে-মানত হতে নিজে খাওয়া বা কোন মালদারকে খাওয়ানো জায়িয নয়। নফল হাদী যদি হরমে পৌঁছার আগে যবাহ্ করা হয় তবে এর গোশ্‌ত হাদীর মালিক এবং কোন বিত্তশালী ব্যক্তির জন্য ভক্ষণ করা জায়িয নেই। যদি কেউ ভক্ষণ করে তবে এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে পরিমাণ গোশ্‌ত খাওয়া হয়েছে তার সমপরিমাণ গোশত বা উহার মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

দম হিসাবে প্রদত্ত যে সব জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া জায়িয। যবাহ্. এর পর তার গোশ্‌ত সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং এক তৃতীয়াংশ সাদাকা করা মুস্তাহাব আর যে সব জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া জায়িয নেই তার সমুদয় গোশত্ সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব। হাদীর গোশ্‌ত কুরবানী গোশ্‌তের ন্যায় মিস্‌কীনদের মধ্যে বন্টন করা জায়িয। শুধু হরমের মিসকীনদেরকে প্রদান করা জরুরী নয়। হরমের বাইরের মিস্‌কীনদেরকের দান করাও জায়িয আছে। তবে হরমের মিস্‌কীনদেরকে দান করা উত্তম(আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হাদীর চামড়া, লাগাম, দড়ি ইত্যাদি সাদাকা করে দিতে হবে। কিরান, তামাত্তু কিংবা নফল হাদীর চামড়া কাকে দিয়ে দেওয়া অথবা নিজের কাজে লাগানো সবই জায়িয আছে। কিন্তু বিক্রয় করলে এর সমুদয় মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। দমে জিনায়েত ও দমে মানতের চামড়া নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়িয নেই। পারিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে হাদীর গোশ্‌ত চামড়া ইত্যাদি দেওয়া জায়িয নেই। অবশ্য হাদিয়া হিসাবে গোশ্‌ত প্রদান করা জায়িয আছে। কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে এ সবের কোন কিছু দান করলে তার মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। (আলমগীরী ১ম খন্ড)

মানত করলেও হাদী ওয়াজিব হয়ে যায়। কেউ যদি বলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর একটি হাদী ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সে যদি উট অথবা গরুর নিয়্যত করে তবে যে পশুর নিয়্যত করবে তাই তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি বিশেষ কোন পশুর নিয়্যত না করে তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে। মানতের হাদী হতে মালিকের ভক্ষণ করা এবং মালদার ব্যক্তিকে ভক্ষণ করানো জায়িয নেই। মানতের হাদী হরমের এলাকা ব্যতীত অন্য কোথাও যবাহ্ করা জায়িয নেই। কিন্তু উট মানত করলে হরমের বাইরেও নহর করতে পারবে। কেউ যদি মক্কার অভ্যন্তরে নহ্‌র করার মানত করে তবে মক্কার অভ্যন্তরেই তা নহর করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী ও দম আদায় করাও জায়িয আছে। তবে কুরবানীর আগে পরে যেহেতু আরো অন্যান্য আমল রয়েছে এবং এসব আমলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষ করা যেহেতু ওয়াজিব। তাই কখন কুরবানী করা হবে সময়টি জেনে নেওয়া খুবই জরুরী। অন্যথায় আমলের ধারাবাহিকতায়র জন্য নিজ দায়িত্বে তা আদায় করাই উত্তম।

## হলক্ বা কসর

কুরবানী সমাপ্ত করার পর মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলবে অথবা ছাটিয়ে নিবে। কিবলামূখী হয়ে বসে ক্ষৌরকার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির দ্বারা মাথার ডান দিক থেকে চুল মুণ্ডানো বা ছাটার কাজ শুরু করাবে। মাথা মুণ্ডন করা ছাটা থেকে উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ সময় মাথা মুণ্ডন করবে না। মাথার চুলের এক চতুর্থাংশ মুণ্ডন করা বা ছাটা ওয়াজিব। এতটুকুন না করলে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। পুর্ণ মাথা মুণ্ডন করা অথবা ছাটানো সুন্নাত। চুল ছাটার ক্ষেত্রে আঙ্গুলের এক করের চেয়ে বেশী ছাটতে হবে। কেননা চুল ছোট বড় হয়ে থাকে। কাজেই এক করের চেয়ে বেশী কাটলে সব জায়গা দিয়ে ন্যূনপক্ষে এক কর পরিমাণ ছাটা হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন রোগব্যধির কারণে কেউ যদি হলক করতে না পারে তবে ছেটে নেওয়াই তার জন্য যথেষ্ট। মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো হারাম। মাথার এক চতুর্থাংশের এক কর পরিমাণ চুল কাটানোই তাদের জন্য যথেষ্ট অবশ্য সমগ্র মাথার চুল হতে এক কর পরিমাণ ছাটা সুন্নাত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হজ্জের ইহ্‌রামে হলক বা কসরের সময় ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পর হতে শুরু হয় এবং ১২ই যিল হজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত বহাল থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে হলক বা কসর করা ওয়াজিব। জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পরে এবং যার উপর কুরবানী ওয়াজিব সে কুরবানীর পরে হলক বা কসর সম্পাদন করবে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে। আইয়্যামে নহরের প্রথম দিনে হলক বা কসর সম্পাদন করা উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হলক বা কসরের সময় এবং পরে তাকবীর বলবে এবং এই দু'আ পাঠ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا وَ اَنْعَمَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ وَ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَامْحُ بِهَا عَنِّىْ سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِىْ بِهَا دَرَجَةً اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ لِلْحَلِقِيْنَ وَ الْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ-اٰمِيْن

কর্তিত চুল দাফন করা মুস্তাহাব। ফেলে দিলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু গোসলখানা এবং পায়খানায় ফেলা মাকরূহ। (আলমগীরী ১ম খন্ড)

ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত করার পর এই দু'আ পাঠ করবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا اَللّٰهُمَّ زِدْنَا اِيْمَانًا وَ يَقِيْنًا

তারপর নিজের জন্য মাতাপিতার জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। যদি মাথা মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে কোন ওযর থাকে যেমন ক্ষুর না থাকে অথবা ক্ষৌর করার লোক না থাকে অথবা মাথায় যখম ইত্যাদি থাকে তাহলে চুল ছেটে নেওয়া ওয়াজিব। আর যদি ছাটা সম্ভব না হয় যেমন চুল খুব ছোট এবং মাথায় কোন যখমও নেই তবে মুণ্ডানো ওয়াজিব। যদি যখমের কারণে হলক বা কসর কোনটাই সম্ভব না হয় তবে সে হলক ও কসর ছাড়াই হালাল হয়ে যাবে। তার জন্য উত্তম হবে আইয়্যামে নহরের শেষ ওয়াক্তের দিকে হালাল হওয়া। অবশ্য আগে হালাল হলেও কোন অসুবিধা নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ যদি বনে জঙ্গলে অথবা এমন কোন জায়গায় চলে যায় যেখানে ক্ষুর এবং ক্ষৌরের কোন ব্যবস্থা নেই তবে তা ওযর হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত হলক অথবা কসর না করবে হলাল হতে পারবে না। যদি কারো মাথায় টাক থাকে অথবা পূর্বে মাথা কামিয়ে

www.pathagar.com

ফেলার কারণে বর্তমানে মাথায় চুল না থাকে তবে মাথার উপর শুধু ক্ষুর চালানোই যথেষ্ট হবে। চুনা অথবা লোম নাশক কোন বস্তু দ্বারা চুল পরিষ্কার করে নেওয়া ও জায়িয আছে। হলক অথবা কসর করার পর নখ এ গোঁফ কাটা এবং বগল ইত্যাদির পশম পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। হলক অথবা কসরের পূর্বে নখ ইত্যাদি কাটলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

উমরার ইহ্‌রামে সাঈর পর হলক বা কসর করা উচিত। সায়ী আগে হলক বা কসর করলে দম ওয়াজিব হবে। হলক বা কসর করার পর ইহ্‌রামের কারণ যে সব কাজ নিষিদ্ধ ছিল তা জায়িয হয়ে যায়। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাই যুক্ত কাপড় পরিধান করা, স্থলজ প্রাণী শিকার করা ইত্যাদি। হজ্জের ইহরামের ক্ষেত্রে স্ত্রী-সহবাস, স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তাকে চুম্বন করা ইত্যাদি হলক বা কসর করার পরেও জায়িয হবে না। এসব কাজ তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর জায়িয হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## তাওয়াফে যিয়ারত

কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী এবং হলক বা কসর সমাপ্ত করার পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করতে হবে। এই তাওয়াফ হজ্জের রুকন এবং ফরয। একে 'তাওয়াফে যিয়ারত' বলা হয়। ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক হতে তাওয়াফের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা উত্তম। ১০ই যিলহজ্জ হতে ১২ ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা ওয়াজিব। এরপর তাওয়াফ করা মাক্রূহ তাহরিমা। কাজেই ১২ই যিলহজ্জের পর 'তাওয়াফে যিয়ারত' আদায় করলে দম ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি কেউ তাওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ করে থাকে তবে তাওয়াফে যিয়ারতে রমল ইযতিবা ও সায়ী করতে হবে না। কিন্তু যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকে তবে তাওয়াফে যিয়ারতের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে এবং তাওয়াফের নামায আদায় করতে হবে। এরপর সম্ভব হলে হজরে আসওয়াদের চুম্বন করে। এরপর বাবুস সাফার পথে বের হয়ে সাঈ সম্পন্ন করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের সময় যদি সেলাইযুক্ত কাপড় পরিহিত থাকে তবে ইযতিবা করতে হবেনা। অন্যথায় করতে হবে। কেউ যদি তাওয়াফে কুদূমে সাঈ করে থাকে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে রমল ও ইযতিবা ছেড়ে দিয়ে থাকে তা হলেও এই তাওয়াফের সময় রমল এবং ইযতিবা করতে হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

উত্তম হল তাওয়াফে যিয়ারতে সাথে রমল ও সাঈ করা। কেউ যদি যথাসময় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করতে না পারে তবে তার যিম্মায় ঐ তাওয়াফ আদায় করার দায়িত্ব থেকে যাবে। যদি এই তাওয়াফ করার পূর্বে মারা যায় তাহলে অসিয়্যত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব (শামী, ২য় খণ্ড)।

তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সহবাস হালাল হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এ তাওয়াফ সম্পন্ন না করে তবে তার জন্য বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী সহবাস হালাল যদিও সে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

কেউ যদি হলক বা কসরের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে তাহলে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী তার জন্য হালাল হবে না। হলক বা কসরের মাধ্যমেই হালাল হতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

কোন মহিলা যদি হায়িয বা নিফাসের কারণে যথাসময়ে 'তাওয়াফে যিয়ারত' সম্পন্ন করতে সক্ষম না হয় তবে পবিত্র হওয়ার পর সে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করবে। যদি কোন মহিলা এমন সময় হায়িয বা নিফাস হতে পবিত্র হয় যে, ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে গোসল করে সে পূর্ণ তাওয়াফ বা তাওয়াফের চার চক্কর আদায় করতে পারে এ অবস্থায় সে যদি তা আদায় না করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সে এতটুকু সময় না পায় তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## তাওয়াফে যিয়ারত সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান হওয়া,

২. তাওয়াফের পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা,

৩. তাওয়াফের আগে আরাফায় উকূফ করা,

৪. তাওয়াফের নিয়্যত করা,

৫. সাত চক্করের অধিকাংশ আদায় করে নেওয়া,

৬. তাওয়াফের সময় হওয়া,

৭. নির্ধারিত স্থানে তাওয়াফ করা। অর্থাৎ মসজিদুল হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহ্ শরীফের চারিপাশে তাওয়াফ করা,

৮. নিজের তাওয়াফ নিজে করা। যদি কেউ মাযূর হয় তবে অন্য লোকের সাহায্য নিয়ে হলেও নিজেকেই এই তাওয়াফ আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কেউ যদি ইহ্‌রামের পূর্বে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তাওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত সংজ্ঞা ফিরে না আসে তাহলে অপর কোন ব্যক্তি তার পক্ষ হতে ইহ্‌রাম ও তাওয়াফ করে নিলে তা আদায় হয়ে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিবসমূহ

১. পদব্রজে তাওয়াফ করা -এর শর্ত হল পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

২. ডান দিক থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করা,

৩. সাত চক্কর পূর্ণ করা,

৪. হদস (উযূহীনতা) হতে পাক হওয়া,

৫. সতর ঢাকা,

৬. কুরবানীর দিন সমূহের মধ্যে তাওয়াফ সম্পন্ন করা। কংকর নিক্ষেপ এবং ক্ষৌরকার্যের পরে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। এই তাওয়াফ কোন

www.pathagar.com

কারণে ফাসিদ হয় না এবং রহিতও হয় না। অর্থাৎ মওতের পূর্ব পর্যন্ত তা আদায় করার দায়িত্ব যিম্মায় থেকে যায়। অবশ্য কুরবানীর দিন সমূহের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব জায়িয নেই।

কেউ যদি আরাফায় উকূফ করার পর তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মারা যায় এবং হজ্জ সম্পন্ন করার জন্য কাউকে অসিয়্যত করে যায় তবে তাওয়াফে যিয়ারত না করতে পারার কারণে তার পক্ষ হতে একটি উট কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। এবং হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। মুযদালিফার উকূফ, কংকর নিক্ষেপ এবং সাঈ না করতে পারায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জে রমী করার মাসাইল

তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর পুনরায় মিনাতে চলে আসবে। এবং জামরাত্রয়ে কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ১১ ও ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবে। এ সময় মক্কা বা মক্কার রাস্তায় কোথাও রাত্রিযাপন করবে না। এ সময় মিনা ছাড়া অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করা মাক্রূহ। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে কেউ ১৩ই যিলহাজ্জ মিনায় থেকে গেলে সেদিন ও তাকে জামরাত্রয়ে যথানিয়মে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামরাত্রয়ে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রথমে মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী জামরায়ে উলায় রমী করবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্বীর বলবে এবং রমীর দু'আ পড়বে। এ সময় যথাসম্ভব জামরার নিকটবর্তী স্থান থেকে কিব্লামূখী হয়ে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন জামরার বেশী অংশ ডান দিকে এবং কম অংশ বাম দিকে থাকে। তারপর তার নিকটবর্তী জামরা তথা জামরায়ে উসতার কাছে এসে অনুরূপভাবে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। তারপর জামরায়ে আকাবায় অনুরূপ সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। জামরায়ে উলা এবং জামরায়ে উসতায় কংকর নিক্ষেপের পর এর নিকটবর্তী স্থানে যেখানে সাধারণত মানুষ জন দাঁড়ায় সেখানে দাঁড়াবে। তারপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও হামদ সানা পাঠ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে খুব কান্নাকাটি সহ নিজের জন্য আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং সকল মু'মিন মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। দু'আর সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে হাতের তালু আসমানের দিকে রেখে দু'আ করবে। আকাবার রমীর পর সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাসস্থানে চলে আসবে। সেখানে কোন দু'আ করবে না। ১২ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে যাওয়ার পর অনুরূপভাবে জামরাত্রয়ে কংকর নিক্ষেপ করবে। ১২ তারিখে রমী সম্পন্ন করে মিনা হতে মক্কায় চলে আসাতে কোন দোষ নেই। তবে সুবহি সাদিকের পর কিছু সময়ও মিনায় অবস্থান করলে যথা নিয়মে জামরাত্রয়ে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী ২য় খণ্ড)।

যদি ১২ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমা যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা এলাকা হতে রওয়ান হয়ে যাবে। সূর্যাস্তের পর ১৩ই যিলহজ্জ আরম্ভ হয়ে গেলে ১৩ই যিলহজ্জের রমী ওয়াজিব না হলেও রমী সমাপ্ত না করে মিনা হতে রওয়ানা করা মাক্রূহ। যদি মিনায় ১৩ তারিখে সুবহে সাদিক হয়ে যায় তবে এ দিনের রমী ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি রমী

www.pathagar.com

না করে চলে তবে দম ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

১১ ও ১২ তারিখের রমীর ওয়াক্ত সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে আরম্ভ হয়। এর পূর্বে রমী করা মাকরূহ। সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রমীর সুন্নাত ওয়াক্ত। সূর্যাস্ত হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাকরূহ্ ওয়াক্ত। ১৩ই যিলহজ্জ তারিখের রমীর সময় সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সূর্যাস্তের পর ১৩ তারিখের রমীর সময় সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়।

যদি কোন দিনের রমী তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় তবে এর কাযা এবং দম উভয়ই ওয়াজিব হবে। এভাবে কেউ যদি একটি রমীও আদায় না করে এবং সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তবে এ অবস্থায়ও একটি দম ওয়াজিব হবে। রমীর কাযা সম্পন্ন করার সময় ১৩ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী থাকে। সূর্যাস্তের পর রমীর নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায় এবং কাযার সময়ও বাকী থাকে না। এ ক্ষেত্রে শুধু দমই ওয়াজিব হবে। যদি কেউ ১০ অথবা ১১ অথবা ১২ তারিখে দিবাভাগে রমী করতে না পারে তবে ঐ দিনের রাত্রিতে রমী আদায় করে নিবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

রমী করার সময় বিরতিহীনভাবে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। কংকর নিক্ষেপের মধ্যে বিলম্ব ও ব্যবধান সৃষ্টি করা মাকরূহ। এমনিভাবে এক জামরার পরে অন্য জামরায় কংকর নিক্ষেপের মধ্যে দু'আ করা ছাড়া অন্য কোনভাবে বিলম্ব করাও মাক্রূহ। সাতটি কংকর পৃথক পৃথকভাবে নিক্ষেপ করতে হবে। একাধিক কংকর একসাথে নিক্ষেপ করলে সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে পতিত হলেও একটি কংকর নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করা জরুরী। জামরাতে কংকর রেখে দেওয়া যথেষ্ট নয়। বরং কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। নিক্ষেপের পর কংকর জামরার নিকটে পতিত হওয়া জরুরী। যদি দূরে পতিত হয় তবে রমী সহীহ্ হবে না। তিন হাতের ব্যবধানকে দূর এবং এর চেয়ে কম দূরত্বকে নিকট বলে গণ্য করা হয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

নিজের হাতে রমী করা ওয়াজিব। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে ও বিনা ওযরে অন্য কারো মাধ্যমে রমী করানো জায়িয নেই। অবশ্য অসুস্থ ব্যক্তি যদি কাউকে তার পক্ষ হতে রমী করার আদেশ করে তবে তা সহীহ্ হবে। অনুরূপ পাগল বেহুশ এবং শিশুর পক্ষ হতেও অন্য জনের রমী করা জায়িয আছে। অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ হতে রমী করার জন্য তার অনুমতি থাকা শর্ত। কিন্তু পাগল ও বেহুশের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি আবশ্যক নয়। রমীর ব্যাপারে এমন ব্যক্তিকে অসুস্থ ও অপরাগ বলে বিবেচনা করা হবে যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয় এবং জামরাত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে অথবা সাওয়ার হয়ে যেতে সক্ষম না হয়। যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ হতে রমী করবে সে প্রথমে নিজের রমী সম্পন্ন করবে। এরপর অন্যের পক্ষ হতে রমী করবে। অন্যের দ্বারা রমী করানোর পর যদি মাযূর ব্যক্তির ওযর রমীর সময় বাকী থাকতেই বিদূরীত হয়ে যায় তবে তাকে পুনঃরায় নিজ হাতে রমী করতে হবে না। পাগল, অজ্ঞান এবং শিশু যদি জামরাত্রয়ের কোনটাতে কোন দিনই রমী না করে তবে তাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য অসুস্থ ব্যক্তি যদি কাউকে দিয়ে করায় তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কংকর মাটি জাতীয় বস্তু হওয়া শর্ত। মাটি জাতীয় ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা রমী করা জায়িয নেই। পাথর দ্বারা রমী করা উত্তম (শামী, ২য় খণ্ড)।

জামরার নিকট থেকে কংকর সংগ্রহ করে তা দ্বারা রমী করা মাক্রূহ। অনুরূপ একটি

www.pathagar.com

পাথর সত্তর টুকরা করে তা দ্বারা রমী করাও মাক্রূহ। পাথরের টুকরা দ্বারা রমী করাও মাকরূহ (শামী, ২য় খণ্ড)।

কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার বিধান একই রকম। অবশ্য মহিলাদের জন্য রাতের বেলাও রমী করা জায়িয। ভিড় জনিত কারণে মহিলার পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে রমী করা কারো জন্য জায়িয নেই। যদি ভীড়ের কারণে কোন মহিলা রমী না করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যদি কোন মহিলা ভিড়ের আশংকায় ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং ১১ ও ১২ ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পরে রাত্রে রমী করে তবে তা মাকরূহ হবে না। তাদের ছাড়া অন্যদের জন্য এরূপ করা মাকরূহ। প্রত্যেক জামরার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে সাতের অধিক কংকর নিক্ষেপ করা মাক্রূহ। সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে বেশী নিক্ষেপ করলে তাতে কোন দোষ নেই। একই কংকর সাতবার নিক্ষেপ করা যদিও জায়িয। তবে এরূপ করা উচিত নয় খেলাপ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মিনায় কংকর নিক্ষেপের দিনগুলোতে নিজে মিনায় অবস্থান করা এবং সামানপত্র মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া মাকরূহ। কিন্তু সামানা রেখে যাওয়ার কারণে দুশ্চিন্তা না থাকে তবে হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

যে কংকর দ্বারা রমী করা হবে তা ধৌত করে নেওয়া উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন

রমী সম্পন্ন করার পর ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ মক্কায় ফিরে আসবে। আসার পথে মুহাস্সাব নামক স্থানে অল্পক্ষণের জন্য হলেও অবতরণ করে দু'আ করবে। এখানে অবতরণ করে দু'আ করা সুন্নাত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় সাওয়ারী থামিয়ে দু'আ করলেও সুন্নাত আদায় হবে। উত্তম হল ১২ অথবা ১৩ ই যিলহজ্জ রমী সমাপ্ত করার পর যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায বতনে মুহাস্সাবে পৌঁছে আদায় করা। তারপর সামান্য নিদ্রা যাওয়া এবং মক্কায় চলে আসা (শামী, ২য় খণ্ড)।

এরপর যতদিন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করবে একে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করবে। এ সময় হরম শরীফে নামায আদায় করা এবং নফল তাওয়াফ করাকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রদত্ত বিশেষ নি'আমত হিসেবে বিবেচনা করে, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বেশীবেশী করে নফল তাওয়াফ ও উমরা আদায় করবে। এবং তাদের প্রতি সাওয়াব রেসানী করবে। তারপর যখন মক্কা মুকাররমা হতে রওয়ানা হওয়ার সময় হবে তখন তাওয়াফে বিদা আদায় করে নিবে।

## তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ

হজ্জের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করার পর যখন মক্কা মুকাররমা হতে দেশে রওয়ানা করার ইচ্ছা করবে তখন এই তাওয়াফ আদায় করে নিবে। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে সফর তাওয়াফে বিদা, তাওয়াফে ইফাযা এবং তাওয়াফে ওয়াজিব বলা হয়। আফাকী লোকদের

www.pathagar.com

জন্যই এই তাওয়াফ ওয়াজিব। এই তাওয়াফের মধ্যে রমল ও সাঈ করবে না (শামী ২য়, খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এই তাওয়াফের জায়িয ওয়াক্ত আরম্ভ হয় তাওয়াফে যিয়ারতের পর হতেই, যদি সফরের ইচ্ছা থাকে। সুতরাং কেউ যদি এই তাওয়াফের পর মক্কায় এক বছরও থাকে এবং ইকামতের নিয়্যত না করে এবং মক্কায় বাড়ী ঘর না বানায় তাহলে তার তাওয়াফ সহীহ্ হবে। এর আখিরী ওয়াক্তের কোন সীমা নেই। কাজেই কেউ যদি মক্কায় এক বছরও অবস্থান করে এবং ইকামতের নিয়্যত না করে তবে সে তখনও তাওয়াফে বিদা আদায় করতে পারবে এবং তা আদায় হিসাবেই গণ্য হবে। তাওয়াফে বিদার মুস্তাহাব সময় হল মক্কা মুকাররমা হতে সফরের ইচ্ছা করার প্রাক্কালে এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

কুরবানীর দিন সমূহের পরেও যদি কেউ এ তাওয়াফ আদায় করে তবে এতে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তাওয়াফে বিদা মীকাতের বাইরে বসবাসকারী হাজী সাহেবগণের উপর ওয়াজিব। ইফরাদ, কিরান এবং তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী সকলের ক্ষেত্রেই সমান। এই তাওয়াফ হরম, হিল্ল ও মীকাতের অধিবাসী, ঋতুমতী মহিলা, পাগল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, যার হজ্জ ফাওত হয়ে গিয়েছে এবং হজ্জ পালনে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ওপর ওয়াজিব নয়। উমরা আদায়কারী ব্যক্তিদের উপরও এই তাওয়াফ ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

তাওয়াফে বিদা হরমী, হিল্লী ও মীকাতীদের জন্য মুস্তাহাব (শামী, ২য় খণ্ড)।

মীকাতের বাইরের কোন ব্যক্তি যদি মক্কা মুকাররমায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে তবে তার উপর হতে এ তাওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। শর্ত এই যে, ১২ই যিলহজ্জের পূর্বে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়্যত করতে হবে। যদি ১২ তারিখের পর নিয়্যত করে তবে এই তাওয়াফ রহিত হবে না।

মীকাতের বাইরের কোন ব্যক্তি মক্কা মুকাররমায় স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়্যত করার পর যদি সময় করে অন্যত্র চলে যায় তবে তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি ঋতুমতী কোন মহিলা মক্কার আবাদী হতে বের হওয়ার পূর্বেই পাক হয়ে যায় তবে ফিরে এস তাওয়াফে বিদা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি আবাদী হতে বের হয়ে সফরের দুরত্ব অতিক্রম করার পর পাক হয় তবে ফিরে এসে তাওয়াফে বিদা সম্পন্ন করা তার উপর ওয়াজিন নয়। অনুরূপ যদি হায়িয অবস্থায় আবাদী অতিক্রম করার পর কারো রক্ত বন্ধ হয় এবং এ অবস্থায় যদি উক্ত মহিলা গোসল করে মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই মক্কা ফিরে আসে তবে তার উপর তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যদি কোন ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন না করে মক্কা মুকাররমা হতে রওয়ানা করে তবে মীকাত অতিক্রম না করা পর্যন্ত মক্কা ফিরে এস এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা তার উপর ওয়াজিব। মীকাত অতিক্রম করে গিয়ে থাকলে দম পাঠিয়ে দিবে অথবা সেখান থেকে উমরার ইহ্রাম বেঁধে মক্কাতে ফিরে এসে প্রথমে উমরা আদায় করবে, পরে তাওয়াফে বিদা সম্পন্ন করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

এই বিলম্বের জন্য কোন দম সাদাকা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু বিনা কারণে এরূপ করা উচিত নয়। মীকাত হতে বের হয়ে যাওয়ার পর তাওয়াফে বিদা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা ফিরে আসার ক্ষেত্রে উমরার ইহরাম বাঁধা জরুরী। ইহ্‌রাম ছাড়া আসা জায়িয নেই।

তাওয়াফে বিদা আদায় করার পর মাকামে ইব্‌রাহীমে এসে তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায আদায় করবে। তারপর যমযমের নিকট গিয়ে পেটভরে খুব পানি পান করবে। পানি কিবলামুখী হয়ে কয়েক শ্বাসে পান করা উত্তম এবং প্রত্যেক শ্বাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রতি নযর করবে। যমযমের পানি কিছু মুখমন্ডল, মাথা এবং শরীরে ও ছিটিয়ে দিবে। সম্ভব হলে কিছু পানি শরীরের উপর ঢালবে। এর পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের চৌকাঠের নিকট এসে তা চুম্বন করবে। এরপর হজরে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ্‌র দরজার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত মুলতাযামে এসে এর উপর নিজের ডান গাল এবং বুক লাগিয়ে ডান হাত দ্বারা কা'বার চৌকাঠ ধরে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

اَلسَّائِلُ بِبَابِكَ يَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ وَمَغْفِرَتِكَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَتَكَ

এভাবে বায়তুল্লাহ্‌র চৌকাঠ জড়িয়ে ধরেও খুব কান্নাকাটি করবে। যদি সম্ভব হয় তবে কা'বার গিলাফ ধরবে। সম্ভব না হলে দুই হাত মাথার উপর রেখে মাথা দেয়ালের সাথে লাগাবে। সম্ভব হলে মুখমণ্ডল দেয়ালের সাথে লাগাবে। তারপর আল্লাহ্ আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্‌হামদু লিল্লাহ্ ইত্যাদি তাসবীহ্ পড়ে এবং নবী (সা.) -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের নেক মাকসূদ সমূহ পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করবে। তারপর তাকবীর বলে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। সম্ভব হলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করবে। সম্ভব না হলে কোন অসুবিধা নেই। এরপর ক্রন্দনরত অবস্থা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে উল্টোপায়ে আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলে আসবে। এভাবে আফসোস করতে করতে মসজিদুল হারাম থেকে বাবুল বিদা দিয়ে বের হবে। দরজায় দাঁড়িয়ে দু'আ করবে। এ সময় নিম্নের দু'আটিও পাঠ করা যায় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الْعُوْدَ بَعْدَ الْعُوْدِ الْمَرَّةِ بَعْدَ الْمَرَّةِ اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ عِنْدَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ اٰخِرُ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ اِنْ جَعَلْتَهُ اٰخِرُ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِىْ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ اَصْحٰبِهِ اَجْمَعِيْنَ

মক্কার নীচু অঞ্চল 'সানিয়্যাতুস সুফলা' হয়ে মক্কা মুকাররমা হতে বের হওয়া উত্তম (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

# উমরা

**উমরার পরিচিতি**

'উমরা' শব্দের আভিধানিক অর্থ যিয়ারত করা। শরী'আতের পরিভাষায় বিশেষ নিয়মে তথা ইহ্রাম সহ কা'বা ঘরের তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাকে 'উমরা' বলা হয়। যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ এই পাঁচ দিন ব্যতীত বছরের যে কোন সময় উমরা আদায় করা যায়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা শর্তে জীবনে একবার উমরা পালন করা সুন্নাত।

এক বছরে একাধিক বার উমরা পালন করা জায়িয। উমরাকে হজ্জে সোগরা অর্থাৎ ছোট হজ্জ বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে উমরার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ

عَن أَبِى هُرَيرة رضى الله عنه قَال قَال رسُولُ الله صلى الله على و سلم اَلعُمرة إِلَى العُمرة كَفَّارة لما بنيهُمَا الحج المبرُور لَيس لَه ُجَزَاء إِلَّا الجَنَّة

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ একে উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর হজ্জে মাবরূর-এর একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত (বুখারী ও মুসলিম)।

عَن ابنِ عبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِوَ سَلَّمَ ان عمرة فى رَمَضَان تَعدِل حجة

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ রামাযান মাসে একটি উমরা একটি হজ্জের সমান (বুখারী ও মুসলিম)।

عن ابنِ مَسعود رضى الله عنه قَال قَال رسُولُ الله صلى الله عَليهِو سلم تابعوا بين الحج و العمرة فَا نهُما يَنفِيَان الفَقر و الذُنوب كَمَا ينفى الكِير خبث الحَدِيد وَ الذَهَبِ وَ الفِضَة و لَيس للحجة المبرورة ثَواب إِلَّا الجَنَّة

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে আদায় করবে। কেননা হজ্জ ও উমরা উভয় গুনাহ এবং দারিদ্র দূর করে

www.pathagar.com

সেভাবে যেভাবে হাপর লোহা এবং সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। হজ্জে মাবরূর এর একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত (তিরমিযী ও নাসাঈ)।

## উমরা ও হজ্জের মধ্যে পার্থক্য

যে সব শর্তে হজ্জ ফরয হয় উমরার জন্য ও ঐ সব প্রযোজ্য হবে। হজ্জ ও উমরার ইহ্রামের নিয়মাবলী একই। হজ্জের ইহ্রামের পর যে সব বিষয় হজ্জকারীর জন্য হারাম, মাকরূহ্, সুন্নাত এবং মুবাহ্ হয়ে থাকে ঠিক উমরার বেলায়ও ইহ্রাম বাঁধার পর উমরাকারীর জন্য সে সকল বিষয় হারাম, মাকরূহ, সুন্নাত এবং মুবাহ্ বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য নিম্ন বর্ণিত ব্যাপারে হজ্জ ও উমরার মধ্যে পার্থক্য বিদ্ধমান রয়েছে।

১. হজ্জের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু উমরার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। উমরা বছরে পাঁচ দিন অর্থাৎ যিল হজ্জের ৯, ১০, ১১, ১২, ও ১৩ তারিখে উমরা করা মাক্রূহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

২. হজ্জ ফরয। কিন্তু উমরা ফরয নয় বরং সুন্নাতে মু'আক্কাদা।

৩. হজ্জের মধ্যে আরাফাহ ও মুযদালিফায় অবস্থান করা জরুরী। কিন্তু উমরার মধ্যে তা করতে হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

৪. হজ্জের মধ্যে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করা নিয়ম রয়েছে। কিন্তু উমরার মধ্যে এসব জায়িয নেই।

৫. হজ্জের মধ্যে খোত্বার বিধান রয়েছে, কিন্তু উমরার মধ্যে এ ধরণের খোত্বার বিধান নেই।

৬. হজ্জের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তাওয়াফে কুদূমের বিধান রয়েছে। কিন্তু উমরার মধ্যে তাওয়াফে কুদূমের বিধান নেই।

৭. হজ্জের জন্য তাওয়াফে বিদার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু উমরার মধ্যে তাওয়াফে বিদার নিয়ম নেই।

৮. হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করতে না পারলে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। কিন্তু উমরার ক্ষেত্রে এ সব আবশ্যিক নয়।

৯. হরম এলাকায় অবস্থানকারী লোকেরা হরম থেকে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে। কিন্তু উমরার ক্ষেত্রে তাঁরা হিল্ল থেকে ইহ্রাম বাঁধবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

১০. উমরার ক্ষেত্রে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্তে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হয়, কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে ১০ই যিলহজ্জ জামরায়ে আকাবায় র'মি আরম্ভ করার পূর্বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হয় (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

## উমরার ফরয

উমরার ফরয দু'টি ঃ ইহ্রাম ও তাওয়াফ।

www.pathagar.com

ইহ্রামের জন্য দু'টি কাজ ফরয ঃ নিয়্যত করা ও তালবিয়া পাঠ। তাওয়াফের জন্য কেবল ফরয (শামী, ২য় খণ্ড)।

**উমরার ওয়াজিব**

উমরার ওয়াজিব দু'টি যথা ঃ

১. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

২. মাথার চুল মুণ্ডানো কিংবা ছোট করা (শামী,২য় খণ্ড)।

**উমরার সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ**

হজ্জের ইহ্রাম, তাওয়াফ, সাঈ এবং মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটার জন্য যে সব কাজ সুন্নাত ও মুস্তাহাব উমরার ক্ষেত্রে ও ইহ্রাম তাওয়াফ সাঈ এবং মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটার বেলায় ঐ সব কাজ সুন্নাত ও মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**উমরার বিভিন্ন মাসাইল**

৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ এই (পাঁচ দিন) ব্যতীত বছরের যে কোন সময় উমরা আদায় করা জায়িয। উল্লেখিত পাঁচ দিন উমরার ইহ্রাম বাঁধা মাক্রূহ্ তবে যদি কিরান হজ্জ আদায়কারী কোন ব্যক্তির হজ্জ ছুটে যায় তবে তার জন্য পূর্ববর্তী ইহ্রাম দ্বারা উক্ত দিন সমূহে উমরা আদায় করা মাকরূহ নয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত দিন সমুহে উমরার ইহ্রাম বাঁধে তবে তার উপর উমরা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু এ দিন সমুহে উমরার ইহ্রাম বাঁধা মাকরূহ তাহ্রিমী তাই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য উমরার ইহ্রাম ভঙ্গ করা তার উপর ওয়াজিব। পরবর্তী সময়ে উমরার কাযা করে একটি দম আদায় করবে। আর যদি উমরা তরক না করে এ দিন সমূহে উমরা আদায় করে নেয় তবে উমরা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহ কাজ করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

মক্কাবাসী কিংবা যারা মক্কায় বা মীকাতের ভিতরে অবস্থানরত আছে তাদের জন্য হজ্জের মাস সমুহে উমরা পালন করা জায়ি।য যদি তারা এ বছর হজ্জ করার ইচ্ছা না করে থাকে। কিন্তু যদি হজ্জ করার ইচ্ছা থাকে তবে উমরা করতে পারবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

উমরা পালনকারী ব্যক্তি যদি তাওয়াফ করার পূর্বে কিংবা অধিকাংশ তাওয়াফের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তবে তার উমরা ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং এর কাযা করতে হবে। আর তাকে একটি বক্রী দম হিসাবে দিতে হবে। কিন্তু যদি কেউ অধিকাংশ তাওয়াফ অর্থাৎ চার চক্কর দেওয়ার পর কিংবা পূর্ণ তাওয়াফের পর সাঈর পূর্বে অথবা তাওয়াফ ও সাঈর পর মাথা মুণ্ডানো পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তবে তার উমরা ফাসিদ হবে না। কিন্তু দম দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তি এক উমরা পালন করে একাধিক ব্যক্তির প্রতি তার সাওয়াব রেসানীর

www.pathagar.com

নিয়্যত করে তবে তা সহীহ্ হবে। কিন্তু একাধিক ব্যক্তির পক্ষ হতে এক উমরা আদায় করলে কারো উমরাই আদায় হবে না। বরং প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। হিল্ল এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা হরমের এলাকা থেকে বাইরে যে কোন স্থান থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধতে পারবে (বাদায়েউস্ সানায়ে)।

হরম এলাকায় বসবাসকারী লোকদের উমরার ইহ্রাম বাঁধার জন্য হরমের বাইরে গিয়ে ইহ্রাম বেঁধে আসতে হবে। তানঈম নামক স্থান থেকে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম। অতঃপর জিয়ির্‌রানা থেকে ইহ্রাম বাঁধা ভাল। মীকাতের বাইরের কোন লোক যদি উমরা আদায় করার নিয়্যতে মক্কায় আগমন করে তবে সে মীকাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে আসবে। রামাযান মাসে উমরা পালন করা মুস্তাহাব।

রামাযানের এক উমরা এক হজ্জের সমান। এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রামাযান মাসে উমরা আদায় করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হজ্জ করার সমান সাওয়াব পাওযা যায়। যদি কেউ শা'বান মাসে উমরার ইহ্রাম বাঁধে এবং রামাযান মাসে শেষ করে তবে যদি সে তার তাওয়াফের অধিকাংশ অর্থাৎ চার চক্কর রামাযান মাসে সম্পন্ন করে তবে এ উমরা রামাযান মাসে পালিত হয়েছে বলে গন্য হবে। এমনিভাবে যদি কেউ রামাযান মাসে উমরা শুরু করে এবং শাওয়াল মাসে শেষ করে তবে যদি তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর রামাযান মাসে শেষ করে থাকে তাহলে এই উমরা রামাযানের উমরা বলে গন্য হবে। নতুবা শাওয়ালের উমরা বলে বিবেচিত হবে। একাধিক উমরা আদায় করা মাকরূহ নয়। অধিক সংখ্যক উমরা আদায় করার চেয়ে অধিক সংখ্যক তাওয়াফ আদায় করা উত্তম।

**উমরা আদায় করার নিয়ম**

যে নিয়মে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে হয় সে নিয়মে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধবে। তবে ইহরামের দুই রাক'আত নামায আদায় করার পর উমরার জন্য নিয়্যত করবে। এবং আরবীতে নিয়্যত করলে এভাবে নিয়্যত করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْ هَا لِيْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

ইহ্রাম বাঁধার পর যে সকল কাজ ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এ গুলো থেকে দূরে থাকবে। বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে, প্রত্যেক উঁচুস্থানে উঠতে, নিচের দিকে অবতরণ করতে, কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে, শেষ রাতে, প্রতি নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করবে। যখনই তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করবে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করবে। সফরে বেশীবেশী দরূদ পাঠ করবে। জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করবে। উমরার জন্য হজ্জের মত সকল আদব কায়দার প্রতি লক্ষ্য রেখে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করবে। তার পর বাবুস্ সালামের পথে মসজিদের হারামে প্রবেশ করবে। কারো কারো মতে বাবুল উমরার পথে প্রবেশ করবে। মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

www.pathagar.com

যখনই বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি নযর পড়বে তখন আস্তে আস্তে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে (বাদায়েউস্ সানায়ে)।

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَظَمَتُهُ وَ شَرَفَتُهُ وَ كَرَمَتُهُ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا وَ تَشْرِيْفًا وَ تَكْرِيْمًا

এতদ্ব্যতীত নিজের প্রয়োজনীয় ও পসন্দনীয় বস্তুর জন্য বেশী বেশী দু'আ করবে। কেননা এ সময় দু'আ কবুল হয়। তারপর রমল ও ইজতিবা সহকারে তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ হজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ করবে। রমলের পদ্ধতি তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে, কাঁধ দুলিয়ে, ঘন ঘন কদম ফেলে, ইসৎ দ্রুত গতিতে চলা। ইজতিবার পদ্ধতি তাওয়াফের অবস্থায় চাদরের ডান অংশকে ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা। সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদে চুমু দিবে। যদি সম্ভব না হয় তবে দূর থেকে ইশারা করাই যথেষ্ট (বাদায়েউস্ সানায়ে)।

হজরে আস্ওয়াদে চুমু খাওয়ার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। সম্ভব হলে মুলতাযাম অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র দরজা ও হজরে আস্ওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে স্বীয় বুক ও চেহারা লাগিয়ে দু'আ করবে (বাদায়েউস্ সানায়ে ও তাহতাবী)।

অধিক পরিমাণে যমযমের পানি পান করা। যে পান করা কিছু পানি মাথায় ও শরীরে দেওয়া এবং এসময় দু'আ করা মুস্তাহাব। তাওয়াফ শেষে তাওয়াফের দু' রাক'আত নামায আদায় করবে। তারপর হজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে কিংবা ইশারা করে বাবুস্ সাফার পথে বের হয়ে প্রথমে সাফা এরপর মারওয়ায় সাঈ করা সাঈর সময় সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মাঝখানে ঈসৎ দৌড়িয়ে চলা। এ হুকুম কেবল পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়, মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবে। সাফা পাহাড়ে এতটুকু উপরে উঠবে যাতে সেখান থেকে কা'বা ঘর দেখা যায়। কা'বা ঘর নযরে পড়লে সে দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে তাক্‌বীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) আল্লাহু আকবার, তাহ্‌লীল (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, তাহ্‌মীদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) আল্-হামদু লিল্লাহ্ ইত্যাদি পড়বে। তারপর হাতের তালু আকাশের দিকে করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে। মারওয়ার সাঈর পর মাতাফের প্রান্তে এসে দু' রাক'আত নামায আদায় করবে। তারপর ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### উমরা পালনের সময়

৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত এই পাঁচ দিন ব্যতীত বছরের যে কোন সময়ই উমরা আদায় করা জায়িয। এক বছরে একাধিক উমরা আদায় করা জায়িয। উমরা আদায়ের সবচেয়ে উত্তম সময় হল রামাযানুল মুবারাকের মাস (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উমরা কতবার আদায় করেছেন এ ব্যাপারে সাহাবী কেরাম (রা.) থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) হযরত আনাস (রা.) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বমোট চার বার উমরা আদায় করেছেন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমি হযরত আনাস

www.pathagar.com

(রা.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম যে নবী করীম (সা.) কতবার উমরা আদায় করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ চার বার পবিত্র উমরা আদায় করেছেন (বুখারী)।

হিজরী ষষ্ঠ সনে নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উমরার আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বেঁধে রওয়ানা করেন। হুদায়বিয়ায় পৌছে মক্কার কাফির কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের সাথে সন্ধি করেন। তারপর কুরবানী করে ইহ্রাম ছেড়ে দেন। সপ্তম হিজরী সনে ছুটে যাওয়া উমরার কাযা আদায় করেন। একে 'উমরাতুল কাযা' কলা হয়। অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন কালে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে ইহ্রাম বেঁধে উমরা আদায় করেন। যাকে 'উমরাতুল জিয়িরব়ানা' বলা হয়। দশম হিজরী সনে যিলহজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরেকটি উমরা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বমোট চারবার উমরা আদায় করেছেন। তারমধ্যে তিনটি যিলকদ মাসে এবং শেষ উমরাটি বিদায় হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে আদায় করেছেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر اَرْبَع عمر كَانَ فِى ذِى الْقَعْدَة الا التى مع حجته

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চারটি উমরা আদায় করেছেন তম্মধ্যে হজ্জের মাসের উমরাটি। বাকী তিনটি উমরা যিলকদ্ মাসে আদায় করেছেন (আবূ দাঈদ)।

### এক নযরে উমরা

উমরা আদায় করতে হলে প্রথমে যথানিয়মে ইহ্রাম বাঁধবে। তারপর ইহ্রামের অবস্থায় যে সকল কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ও মাক্রূহ সে সকল কাজ থেকে বিরত থাকবে। উমরার জন্যও হজ্জের ন্যায় সকর আদব কায়দার প্রতি লক্ষ রেখে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করবে। এরপর বাবুস্ সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। করে কারো মতে বাবুল উমরার পথে প্রবেশ করবে। তারপর রমল ও ইযতিবা সহকারে তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ শেষে তাওয়াফের দু' রাক'আত নামায আদায় করবে। তারপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করবে। সাঈ শেষ করে মাথা মুণ্ডিয়ে বা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

# বদলী হজ্জ

## বদলী হজ্জের পরিচিতি

বদলী হজ্জ অর্থ অন্যের দ্বারা হজ্জ করানো। যিনি অন্যের দ্বারা হজ্জ করাবেন তাকে 'আমির' (আদেশদাতা) এবং যিনি অন্যের আদেশে বদলী হজ্জ করবেন তাকে 'মামূর' (আদিষ্ট) ব্যক্তি বলা হয়।

বস্তুত নিজের আমলের সাওয়াব অন্য ব্যক্তিকে বখশিশ্ করা জায়িয আছে। সে আমল নামায, রোযা, হজ্জ, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ্, তাহ্লীল ইত্যাদি যা কিছুই হোক না কেন। উল্লেখ্য যে ইবাদত তিন প্রকার ঃ

১. ইবাদতে মালী (আর্থিক ইবাদত)। যেমন- যাকাত, সাদাকায়ে ফিত্‌র ইত্যাদি। এ জাতীয় ইবাদত প্রতিনিধির মাধ্যমে করানো জায়িয। চাই প্রয়োজনের কারণে প্রতিনিধি নিয়োগ করা থেকে অথবা বিনা প্রয়োজনে।

২. ইবাদতে বদনী (দৈহিক ইবাদত)। যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি। এ জাতীয় ইবাদত প্রতিনিধির মাধ্যমে করানো কখনো জায়িয নয়।

৩. ইবাদতে বদনী ও মালী (দৈহিক ও আর্থিক সমন্বিত ইবাদত)। যেমন- ফরয হজ্জ। এ জাতীয় ইবাদত তখনই প্রতিনিধির মাধ্যমে করানো জায়িয হবে। যখন কোন ব্যক্তি নিজে সে ইবাদত সম্পন্ন করতে দৈহিকভাবে অপারগ হবে। যদি নিজে আদায় করতে সক্ষম থাকে তবে অন্যের দ্বারা আদায় করানো জায়িয হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অবশ্য নফল হজ্জ এবং নফল উমরা সর্বাবস্থায় অন্যের মাধ্যমে আদায় করানো জায়িয (শামী, ২য় খণ্ড)।

যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এবং আদায় করার সময় পাওয়া সত্ত্বেও আদায় করেনি এমন ব্যক্তি যদি পরবর্তী সময়ে হজ্জ আদায় করতে দৈহিকভাবে অপারগ হয়ে যায় তবে তার উপর অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করানো ফরয। হয়ত জীবদ্দশায় অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করানো অসিয়্যত করে যাবে। মৃত্যুর পূর্বে এভাবে অসিয়্যত করা তার উপর ওয়াজিব। যদি অসিয়্যত না করে তবে গুনাহগার হবে। আর যদি শর্তানুযায়ী কারো উপর হজ্জ ফরয হয়। কিন্তু আদায় করার সময় না পায় অথবা হজ্জের পথে মারা যায় তাহলে তার উপর থেকে ফরয হজ্জ মাফ হয়ে যাবে। তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করার জন্য কাউকে অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

**বদলী হজ্জের শর্ত**

ফরয হজ্জ অন্য কারো দ্বারা করাতে হলে এর জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। উক্ত শর্তসমূহ পাওয়া না গেলে অন্যের দ্বারা বদলী হজ্জ করানো হলে তা আদায় হবে না।

১. যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ করাবে নিজে হজ্জ করার ব্যপারে অক্ষম হওয়া। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সুস্থ থাকে এবং নিজে হজ্জ করতে সক্ষম হয় তবে তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ জায়িয হবে না।

২. বদলী হজ্জ করানোর পূর্বে স্বয়ং হজ্জ করতে অক্ষম হওয়া এবং এ অক্ষমতা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকা। যদি মৃত্যুর পূর্বে ওযর দূরীভূত হয়ে যায় এবং স্বয়ং হজ্জ করতে সক্ষম হয় তবে তার উপর নিজে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে।

৩. যার পক্ষ হতে হজ্জ করা হবে সে যদি জীবিত থাকে তবে তার পক্ষ হতে হজ্জ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে আদেশ করা শর্ত আর উক্ত ব্যক্তি যদি জীবিত না থাকে এবং ইন্তিকালের আগে তার পক্ষ হতে হজ্জ করার জন্য ওসিয়্যত করে যায় তবে অসী অথবা ওয়ারিসের আদেশ করা শর্ত। অবশ্য ওয়ারিস যদি নিজের ওয়ারিসের পক্ষ হতে অথবা সন্তান তার পিতামাতার পক্ষ হতে তাদের মৃত্যুর পর বিনা অসিয়্যতে হজ্জ করেন, তবে জায়িয হবে। যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়্যত না করে থাকে এমতাবস্থায় ওয়ারিস অথবা অপরিচিত ব্যক্তি তার পক্ষ হতে হজ্জ করে নিলে ইনশাআল্লাহ্ তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

৪. যিনি হজ্জ করাচ্ছেন হজ্জের সফরের যাবতীয় খরচ তারই বহন করা আবশ্যক। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের টাকা ব্যয় করে তবে তার নিজের হজ্জ হবে, আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না। অবশ্য যদি আদেশদাতার অধিকাংশ টাকা সফরে ব্যয় হয় এবং অল্প কিছু টাকা আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হতে ব্যয় হয় তবে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি অদিষ্ট ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে সমস্ত টাকা ব্যয় করে অথচ তাকে হজ্জ করার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা হজ্জের খরচের জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবাস্থায় আদিষ্ট ব্যক্তি যদি আদেশদাতার মাল থেকে এ পরিমাণ টাকা উস্‌ল করে নেয় তবে আদেশদাতার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি প্রদত্ত টাকা হজ্জ করার জন্য পর্যাপ্ত না হয় তবে অধিকাংশের বিবেচনা করা হবে। যদি হজ্জের খরচের অধিকাংশ টাকা আদেশদাতার সম্পদ হতে খরচ করা হয়ে থাকে তবে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

৫. ইহ্‌রামের সময় আদেশদাতার পক্ষ হতে হজ্জের নিয়্যত করা। যদি ইহ্‌রামের সময় শুধু হজ্জের নিয়্যত করে এবং হজ্জের কাজকর্ম শুরু করার পূর্বে আদেশদাতার পক্ষ হতে নিয়্যত করে তবে এতে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। যদি হজ্জের কাজকর্ম শুরু করার পর আদেশদাতার পক্ষ থেকে নিয়্যত করে তাহলে আদেশদাতার টাকা পয়সা ফেরত দেওয়া আবশ্যক (শামী, ২য় খণ্ড)।

মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করা উত্তম, কিন্তু জরুরী নয়। মনে মনে নিয়্যত করাই যথেষ্ট (শামী, ২য় খণ্ড)।

www.pathagar.com

যদি কেউ আদেশদাতার নাম ভুলে যায় তবে শুধু আদেশদাতার পক্ষ থেকে নিয়্যত করলেই যথেষ্ট হবে। নাম মনে না থাকার দরুণ কোন অসুবিধা হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি কারো উপর হজ্জ ফরয থাকে এবং তার আদেশে কেউ তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে।কিন্তু ফরয বা নফল কিছুই নিয়্যত না করে তবে আদেশদাতার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে আর যদি নফলের নিয়্যত করে তবে আদেশদাতার ফরয হজ্জ আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

৬. শুধু এক ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা। যদি কেউ দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ করে তবে দু'জনের কারো হজ্জই শুদ্ধ হবে না। এটা তার নিজের হজ্জ হয়ে যাবে এবং উভয়ের টাকাই ফেরত দিতে হবে। হজ্জ আদায় করার পর একে কোন একজনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করলে এত আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না।

৭: শুধুমাত্র একটি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা। যদি কেউ প্রথমে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইহ্রাম বাঁধে এবং পরে দ্বিতীয় ইহ্রাম নিজের পক্ষ থেকে বাঁধে তবে আদেশদাতার হজ্জ সহীহ্ হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের ইহ্রাম বর্জন করবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

৮. আদিষ্ট ব্যক্তি নিজে আদেশদাতার পক্ষ থেকে হজ্জ করা। আদিষ্ট ব্যক্তি যদি কোন ওযরবশত অপর কাউকে দিয়ে হজ্জ করান, তবে আদেশদাতার হজ্জ সহীহ্ হবে না। এবং আদিষ্ট ব্যক্তি ও হজ্জ আদায়কারী উভয়ই এ ব্যাপারে দায়ী থাকবে। অবশ্য যদি আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে অনুমতি দিয়ে থাকে যে, আদিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা হলে নিজে হজ্জ করলে অথবা অন্য কারো দ্বারা করাবেন, তা হলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। আদেশদাতার জন্য উচিৎ যে, আদিষ্ট ব্যক্তিকে এ ক্ষেত্রে ইখ্তিয়ার প্রদান করা যাতে ওযরের অবস্থায় অন্যকে দিয়া হজ্জ আদায় করানো যায় (শামী, ২য় খণ্ড)।

৯. আদিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট হওয়া। যদি আদেশদাতা কাউকে হজ্জ করার জন্য এভাবে নির্ধারিত করে দেন যে আদিষ্ট ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে হজ্জ করবে অন্য কেউ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির দ্বারা হজ্জ করানো জায়িয হবে না। আর যদি অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করাতে নিষেধ না করে থাকে তবে আদিষ্ট ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর অন্য ব্যক্তির দ্বারা হজ্জ করানো জায়িয হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

১০. আদেশদাতার আবাসস্থল হতে হজ্জ করা। যদি এক তৃতীয়াংশ মাসের মধ্যে এর সুযোগ থাকে। নতুবা মীকাতের বাইরে যে জায়গা থেকে সম্ভব সেখান থেকে হজ্জ করিয়ে নিবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

১১. সাওয়ারীতে (যানবাহনে) চড়ে হজ্জ করা, যদি কেউ পদব্রজে হজ্জ করে, তবে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না। এ অবস্থায় আদিষ্ট ব্যক্তির উপর টাকা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। অবশ্য যদি খরচের টাকা অপর্যাপ্ত হওয়ার করণে পদব্রজে হজ্জ করে তবে আদেশদাতার হজ্জ সহীহ্ হবে। যানবাহনে চলাফেরা করার ব্যপারে অধিকাংশ পথ ধর্তব্য হবে। যদি অধিকাংশ রাস্তা সওয়ারীর উপরে চলা হয় তবে ফরয আদায় হবে, অন্যথায় ফরয আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

১২. আদেশদাতার হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ না করা। যদি আদেশদাতা ইফরাদ হজ্জের

www.pathagar.com

আদেশ করে থাকে এবং আদিষ্ট ব্যক্তি কিরান বা তামাত্তু পালন করে তবে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

১৩. মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি মীকাত থেকে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে এবং মক্কা মুকাররমায় পৌছে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে তবে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

কিন্তু যদি আদেশদাতা কিরান বা তামাত্তু হজ্জের অনুমতি দেয় তা হলে এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কিরামের কতেকের মতে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না। তবে কাযীখান, হিদায়া ও অন্যান্য ফিকহ্ গ্রন্থের আলোকে পরবর্তী ফকীহ্‌গণ বলেন, আদেশদাতার অনুমতিক্রমে কিরান বা তামাত্তু হজ্জ আদায় করা জায়িয আছে। এ ক্ষেত্রে কিরান বা তামাত্তুর দম আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আদায় করবে। অবশ্য এর জন্য আদেশদাতা অনুমতি দিলে তার টাকা থেকেও আদায় করতে পারবে। বদলী হজ্জের আদেশদাতা ব্যক্তির জন্য বাঞ্ছনীয় হল, আদিষ্ট ব্যক্তিকে যে কোন প্রকার হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ ইখ্‌তিয়ার দেওয়া এবং তার দেওয়া টাকা পয়সা খরচ করার ব্যাপারে ও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা। এটাই সর্বাধিক নিরাপদ পন্থা (জাওয়াহিরুল ফিকহ্ ১ম খণ্ড )।

১৪. আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক হজ্জ ফাসিদ না করা। যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস দ্বারা হজ্জ ফাসিদ করা হয় তবে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না। এক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর টাকা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর নিজের মাল দ্বারা উক্ত ফাসিদ হজ্জের কাযা আদায় ওয়াজিব হবে। এ কাযা হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হবে, আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না। যদি আদেশদাতার হজ্জ আদায় করতে হয় তবে পুনরায় নতুন করে আরেকটি হজ্জ আদায় করতে হবে। কাযা দ্বারা আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না। আর যদি আরাফায় অবস্থানের পর হজ্জ ফাসিদ করে তবে তার উপর টাকা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব হবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজের টাকায় এ হজ্জের কাযা করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

১৫. আদেশদাতা এবং আদিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের মুসলমান হওয়া।

১৬. আদেশদাতাও আদিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের জ্ঞানবান হওয়া (শামী, ২য় খণ্ড)।

১৭. আদিষ্ট ব্যক্তির ভালমন্দ বুঝার এতটুকু ক্ষমতা থাকা যাতে সে হজ্জের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়।

১৮. কোন কারণবশত হজ্জ না ছুটে যাওয়া। যদি আদিষ্ট ব্যক্তির অলসতা অথবা কর্মব্যস্ততার কারণে হজ্জ ছুটে যায় তবে প্রদত্ত টাকা ফেরৎ দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে আর যদি কো আসমানী বিপদের কারণে ছুটে যায় তবে টাকা ফিরৎ দিতে হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

১৯. পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হজ্জ করা বা করানো জায়িয নয়। সুতরাং এমন শব্দের দ্বারা হজ্জের আদেশ করতে নেই যাতে পারিশ্রমিকের অর্থ বুঝায়। কিন্তু যদি কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হজ্জ করে তবে আদেশদাতার পক্ষ থেকেই হজ্জ আদায় হবে। এবং আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে পারিশ্রমিক ফেরত নেয়া হবে। তবে খরচ পরিমাণ টাকা হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে। যদি আদিষ্ট ব্যক্তির অলসতার দরুণ হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়, তবে হজ্জের সফরে

www.pathagar.com

ব্যয়িত টাকার জন্য সে দায়ী হবে। এবং এ পরিমাণ টকা আদেশদাতাকে ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু যদি পরবর্তী বছর নিজের মাল দ্বারা আদেশদাতার হজ্জ আদায় করে দেয় তবে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি আদিষ্ট ব্যক্তির অলসতা ছাড়া অন্য কোন কারণে হজ্জ ছুটে যায় তবে সফরে ব্যয়িত টাকার জন্য সে দায়ী হবে না। তবে পরবর্তী বছর আদেশদাতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দিতে হবে। বদলী হজ্জে দমে ইহ্সার আদেশদাতার মাল থেকে আদায় করা জায়িয। হজ্জ সমাপন করে আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদেশদাতার আবাসস্থলে ফিরে আসা উত্তম, যদি মক্কা মুকাররমায় থেকে যান তবে কোন অসুবিধা নেই (শামী, ২য় খণ্ড)।

## বদলী হজ্জ আদায়ের উত্তম ব্যক্তি

বালিগ, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, পরহিযগার আলিম এবং হজ্জের মাসাইল পথ-ঘাট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তি এবং যিনি পূর্বে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেছেন। এমন ব্যক্তির দ্বারা বদলী হজ্জ করানো উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুরাহিক অর্থ্যাৎ বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়স্ক কিশোর যে সচেতন ও হজ্জের মাসাইল সম্পর্কে অবগত তার দ্বারা বদলী হজ্জ করানো জায়িয। কিন্তু উত্তম নয়। মহিলার দ্বারা বদলী করানো জায়িয। তবে উত্তম নয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

হজ্জ ফরয হওয়ার পর যে ব্যক্তি তা আদায় করেনি তার দ্বারা বদলী হজ্জ করানো মাকরূহ আদেশ দাতার জন্য মাকরূহ তানযিহী এবং আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য মাকরূহ তাহরিমী। হজ্জ আদায় হয়ে যারে আর যার উপর হজ্জ ফরয হয়নি এরূপ ব্যক্তি দ্বারা বদলী হজ্জ করানো জায়িয। তবে উত্তম নয়। বদলী হজ্জ করানো পর ওযর দূরীভূত হলে বদলী হজ্জ করানোর পর যদি মাযূর ব্যক্তির ওযর দূরীভূত হয় এবং সে নিজে হজ্জ করতে সক্ষম হয়, তবে পুনরায় হজ্জ আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি এমন কোন কারণ থাকে যা সাধারণত দূর হয়না যেমন অন্ধত্ব তাহলে এমন ওযর অবস্থায় হজ্জ করানো পর যদি যে ভাল হবে যায়, তাহলে পুনরায় হজ্জ করা ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

## বদলী হজ্জের ব্যয় নির্বাহ

বদলী হজ্জ আদায়কারীকে এই পরিমাণ টাকা দিতে হবে যা আদেশদাতার আবাসস্থল হলে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত আসা যাওয়া করার জন্য যথেষ্ট হয় এবং যাতে ব্যয় সংকোচন কিংবা অপব্যয় কোনটারই সুযোগ না থাকে।

খরচের মধ্যে সাওয়ারী (বাহন), খাদ্য, গোশ্ত, ঘি, ইহ্রামের কাপড়, পানির সামান, সফরের কাপড়-চোপড়, কাপড় ধোয়া ও গোসল সাবান, শীলের মজুরী, বাড়ী বাড়া. এবং আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় আদেশদাতার মান মর্যাদা অনুসারে অন্তর্ভূক্ত হবে। আর আদিষ্ট ব্যক্তি প্রদত্ত মাল হতে কোন সংকীর্ণতা ও অপব্যয় না করে উল্লিখিত খাতসমূহে খরচ করবে। এছাড়া অন্যান্য খরচাদির ব্যাপারে আদেশদাতার পক্ষ হতে অনুমতি দিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদেশদাতার মাল থেকে কাউকে দাওয়াত খাওয়ানো অথবা সাদাকা বা ঋণ

www.pathagar.com

দেওয়া জায়িয নাই। অবশ্য যদি আদেশদাতা এসব বিষয়ের অনুমতি প্রদান করে থাকে তবে জায়িয হবে।

যদি কেউ হজ্জ সমাপনের পর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করার ইচ্ছা করে এবং আদেশদাতার. আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা না করে তবে অবস্থানের ইচ্ছার পর থেকে আদেশদাতার মাল হতে খরচ করা জায়িয হবে না। কিন্তু সার্বিক ব্যয়ের অনুমতি থাকলে ব্যয় করা জায়িয হবে।যদি আদিষ্ট ব্যক্তির থেকে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তবে নিজের মাল হতে এর দাম আদায় করতে হবে। আদেশদাতার অনুমতি ব্যতিত তার মাল হতে দমের জন্য টাকা ব্যয় করা জায়িয হবে না। অবশ্য অনুমতি থাকলে জায়িয হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

আদিষ্ট ব্যক্তি যদি তামাত্তু বা কেরান পালন করে তবে দমে কিরান বা দমে তামাত্তু নিজের মাল থেকে প্রদান করতে হবে। আদেশদাতার অনুমতি ছাড়া তার মাল হতে দমে কিরান বা দমে তামাত্তু আদায় করলে জরিমানা প্রদান করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

আদিষ্ট ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধা পর্যন্ত আদেশদাতা নিজের মাল ফিয়ে নিতে পারবে। ইহ্‌রাম বাঁধার পর ফিরিয়ে নিতে পারবেন না (শামী, ২য় খণ্ড)।

হজ্জ সমাপ্ত করার পর যা কিছু নগদ টাকা পয়সা বা বস্ত্র সামগ্রী আদেশদাতার মাল থেকে অবশিষ্ট থাকবে বা আদেশদাতা বা তার উত্তারাধিকারীদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি তারা তাকে এসব কিছু দিয়ে দেয়; তবে তার জন্য গ্রহন করা জায়িয হবে। আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদত্ত টাকার ব্যাপারে সার্বিক অধিকার দিয়ে থাকলে অবশ্যিক পয়সা ফেরৎ দিতে হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

### বদলী হজ্জের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহন করা

পারিশ্রমিক এর বিনিময়ে হজ্জ করা বা করানো জায়িয নেই। সুতরাং এমন শব্দ দ্বারা আদেশ করতে নাই যাতে পারিশ্রমিকের অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করে তবে এ হজ্জ আদেশদাতার হজ্জ বলেই গন্য হবে। এবং আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে প্রারিশ্রমিক ফেরৎ লওয়া হবে। তবে খরচ পরিমাণ টাকা সমাপণকারীকে প্রদান করতে হবে।

### মানত হজ্জ

হজ্জ অথবা উমরার মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন কেউ বলল ঃ 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর হজ্জ রয়েছে' অথবা শুধু বলল 'আমার উপর হজ্জ রয়েছে,' তাহলে এ কথা মানত হিসাবে গণ্য হবে এবং তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেউ বলল, 'আল্লাহ্‌ যদি আমাকে ঐ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন' অথবা 'আমার রোগীকে আরোগ্য দান করেন', তাহলে আমার উপর হজ্জ অথবা উমরা রয়েছে। এটা মানত হয়ে যাবে। রোগী আরোগ্য লাভ করলে হজ্জ বা উমরা যার মানত করেছিল তা পালন করা ওয়াজিব। কেউ বলল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার দায়িত্বে ইহ্‌রাম রয়েছে অথবা 'হজ্জের ইহ্‌রাম রয়েছে' তাহলে হজ্জ বা উমরা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এবং হজ্জ অথবা উমরার যে কোন একটি আদায়

www.pathagar.com

করলেই মানত পুরণ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করলে তার জন্য পায়ে হেঁটে হজ্জ করাই ওয়াজিব। কোন বাহনে আরোহন হজ্জ করলে দাম দিতে হবে। (হেদায়া ১ম খণ্ড)।

## হজ্জের অসিয়্যত

যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এবং তা আদায় করার সময়ও পেয়েছে। কিন্তু হজ্জ আদায় করেনি, মৃত্যুর পূর্বে তার উপর হজ্জ আদায় করানোর জন্য অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। যদি ওয়াসিয়্যত না করে মারা যান তবে সে গোনাহগার হবে। যদি কেউ হজ্জ ফরয হওয়ার পর সে বছরই হজ্জে গমন করে এবং পথে মারা যান তবে তার উর হজ্জ আদায় করানোর জন্য অসিয়্যত করা ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়্যত না করে যায় এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারীগন অথবা অন্য কোন লোক তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে আশা করা যায় তার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়্যত করে থাকে তাহলে উত্তরাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত মৃত ব্যক্তির ফরয হজ্জ আদায় হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি হজ্জ আদায়ে অপরাগ ব্যক্তি কিংবা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী কাউকে হজ্জ পালন করার জন্য আদেশ প্রদান করে, কিন্তু টাকা পয়সা না দেয় তবে ফরয হজ্জ আদায় হবে না। অবশ্য যদি আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের খরচে হজ্জ করে পরে আদেশদাতা বা ওয়ারিসদের নিকট থেকে তা উসূল করে নেন তবে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। বদলী হজ্জের জন্য সে সকল শর্ত রয়েছে অসিয়্যতের ক্ষেত্রে ও সে সকল শর্ত প্রযোজ্য হবে। অসিয়্যত কারীর হজ্জ করানোর জন্য তার এক তৃতীয়াংশ মাল পযর্ন্ত ব্যয় করা যাবে। কেননা অসিয়্যত শুধু এক তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে কার্যকর হয়। যদি হজ্জের জন্য এক তৃতীয়াংশ মালের অধিক প্রয়োজন হয় তবে উত্তরাধিকারগণ ক্ষমতা বলে এক তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করে অসিয়্যতের হজ্জ করা যাবে। যদি এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্জ করা যায় তহেলে মৃত ব্যক্তির আবাসস্থল থেকে হজ্জ করাবে। অন্যথায় সে স্থান থেকে এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্জ আদায় করা সম্ভব হয় সেখান থেকে হজ্জ করাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড )।

যদি মৃত ব্যক্তির স্থায়ী কোন বাসস্থান না থাকে তবে যে স্থানে ইন্তিকাল করেছে সেখান থেকে হজ্জ করাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড )।

যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক বাসস্থান থাকে তবে যে বাসস্থান মক্কার অধিক নিকটবর্তী সেখান থেকে হজ্জ করাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড )।

যদি অসী মৃত ব্যক্তির বাসস্থান ব্যতীত অন্য কোন জায়গা হতে হজ্জ করায় অথচ এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা বাসস্থান হতে হজ্জ করানো সম্ভব ছিল, তাহলে সে ক্ষেত্রে ওসি দায়ী হবে। এবং এ হজ্জ ওসির হজ্জ বলে গণ্য হবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে পুনরায় হজ্জ করাতে হবে। কিন্তু যদি এ জায়গা অর্থাৎ সেখান থেকে হজ্জ করানো হয়েছে মৃত ব্যক্তির বাসস্থানের এত নিকটবর্তী হয় যে, সেখানে গমন করে একজন লোক সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসতে পারে।

www.pathagar.com

তাহলে মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হয়ে যাবে এবং অসীর উপর জামানত ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়্যত করেন যে, তার মাল হতে যে হজ্জ করানো হয় এবং প্রদত্ত টাকা দিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করার পর কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকলে তা যেন হজ্জ পালন কারীকে দিয়া দেয়া হয়। এরূপ অসিয়্যত জায়িয আছে ও অবশিষ্ট টাকা হজ্জ পালনকারীর জন্য গ্রহন করা জায়িয হবে। যদি অসিয়্যতকারী হজ্জপালনকারীকে অনুমতি প্রদান করে যে প্রয়োজন হলে ঋণ গ্রহন করবেন আমি পরে তা আদায় করে দিব, তবে ঋণ গ্রহন করা জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি মক্কা মুকাররমায় অথবা এর নিকটবর্তী কোন স্থানে হজ্জ পালনকারীর ত্রুটিজনিত কারণ ছাড়া টাকা পয়সা নষ্ট হয়ে যায় এবং নিজের মাল হতে খরচ করত হজ্জ সম্পন্ন করে নিজের মাল হতে খরচ তবে মৃত ব্যক্তির মাল থেকে ঐ টাকা গ্রহন করতে পারবে। কোন ব্যক্তি হজ্জের অসিয়্যত করে মারা যাওয়ার পরে যদি ওসির হাতে মাল বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা ওসি কর্তৃক হজ্জ পালনকারীকে অর্থ সমর্পন করার পর হজ্জ পালনকারী হাত থেকে তার সফরে বের হওয়ার পূর্বে অথবা সফরের মধ্যে ঐ অর্থ চুরি বা যে কোনভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় তবে এ সকল ক্ষেত্রে অসিয়্যতকারীর এক তৃতীয়াংশ মালের অবশিষ্ট অংশ থেকে অসিয়্যত পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ হজ্জ করাতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এক ব্যক্তি অসিয়্যত করল আমার এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্জ করাবে। এক হজ্জ করাবে অথবা একাধিক এমন কিছুই বলেনি। এ অবস্থায় তার এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা যতটা হজ্জ করানো সম্ভব হয় ততটা হজ্জই করাতে হবে। একই বছরে করাক বা একাধিক বছরে এই পরিমাণ তার এই বছরে করানো উত্তম। সর্বশেষে যদি টাকা অবশিষ্ট থাকে যে তা দিয়ে মৃত ব্যক্তির বাড়ী থেকে হজ্জ করানো সম্ভব হয় না তবে মক্কার পার্শ্ববর্তী যে এলাকা থেকে উক্ত অবশিষ্ট টাকা দিয়ে হজ্জ করানো সম্ভব হয় সেরূপ জায়গা থেকেই হজ্জ করা অবশিষ্ট টাকা ওয়ারিসদের নিকট ফিরিয়ে দিবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তি একশ' দিরহাম দ্বারা তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো অসিয়্যত করে যায় তবে একশ' দিরহাম দ্বারা যে স্থান থেকে হজ্জ করানো সম্ভব স্থান থেকে হজ্জ করা আর যদি তার এক তৃতীয়াংশ মালে একশ' দিরহাম না হয়। তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা স্থান থেকে হজ্জ করানো সম্ভব সে স্থান থেকে হজ্জ করা তবুও অসিয়্যত বাতিল হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট একশ' দিরহাম বা টাকা দিয়ে হজ্জ করানো অসিয়্যত করে মারা যায় এবং ঐ টাকার কিছু অংশ বা অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে স্থান থেকে হজ্জ করানো সম্ভব সে স্থান থেকে হজ্জ করাবে। অসিয়্যত বাতিল করা যায় না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য এক হাজার গরীব মিস্কীনদের জন্য এক হাজার এবং হজ্জ আদায়ের জন্য এক হাজার টাকার অসিয়্যত করে মারা গেল। তারপর দেখা গেল যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মালে মাত্র দুই হাজার টাকা হয়। এমতাবস্থায় দুই হাজার টাকাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এক ভাগ দেওয়ার পর দেখতে হবে অবশিষ্ট দুই অংশের এক অংশ দিয়ে হজ্জ আদায় করা সম্ভব হয় কিনা যদি হয় তবে এক অংশ

www.pathagar.com

দিয়ে হজ্জ করাবে। আর বাকী অংশ মিস্‌কীনদেরকে দিবে। আর যদি এক অংশ দিয়ে হজ্জ করানো সম্ভব না হয়, তবে মিস্‌কীনদের অংশ হজ্জ আদায়ের অংশের সাথে মিলিয়ে হজ্জ করাবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা মিস্‌কীনদের মধ্যে বন্টন করে দিবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে বছর হজ্জ করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল, কোন কারণবশত আদিষ্ট ব্যক্তি সে বছর হজ্জ না করে পরবর্তী বছর হজ্জ করলে মৃত ব্যক্তি হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হজ্জ করার অসিয়্যত করার পর ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি হজ্জ করার পূর্বে মারা গেলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে অন্য ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে। আর যদি এমন বলে থাকে যে অমুক ব্যক্তিই আমার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবে অন্য কেউ নয় সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি মারা গেলে অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কাউকে হজ্জ করার জন্য আদেশ দেওয়ার পর আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সে অন্য কাউকে হজ্জের টাকা সোপর্দ করেন হজ্জ করার জন্য বলে এতে মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হবে না। অবশ্য আদেশদাতা এর জন্য অনুমতি প্রদান করে থাকে তবে আদায় হয়ে যাবে। আদেশদাতার জন্য এধরণের অনুমতি দিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করার পর নিজের জন্য উমরা পালন করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যতক্ষণ পযর্ন্ত উমরার কাজে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ নিজের মাল খরচ করতে হবে, মৃত ব্যক্তির মাল খরচ করতে পারবে না। আর যখন উমরা থেকে অবসর হয়ে যাবে, তখন হতে মৃত ব্যক্তির মাল খরচ করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## নবম পরিচ্ছেদ

# জিনায়াত

### (ইহ্‌রাম ও হরমে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ও তার ক্ষতিপূরণ)

'জিনায়াত' -এর আভিধানিক অর্থ অপরাধ এবং ভুল-ত্রুটি। পরিভাষায় 'জিনায়াত' বলতে বুঝায় হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর অথবা হরমে প্রবেশের কারণে যে সকল কর্ম নিষিদ্ধ হয় সে গুলোতে লিপ্ত হওয়া।

**ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ আটটি**

১. সুগন্ধি ব্যবহার করা,

২. সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা,

৩. মাথা ও মুখ আবৃত করা,

৪. চুল বা পশম কর্তন করা,

৫. নক কাটা,

৬. স্ত্রী সহবাস করা,

৭. হজ্জের ওয়াজিব সমূহ হতে কোন ওয়াজিব তরক করা,

৮. স্থলজ প্রাণী শিকার করা।

**হরমে নিষিদ্ধ কাজ দু'টি**

১. হরমের কোন প্রাণী শিকার করা অথবা কষ্ট দেওয়া,

২. হরমের বৃক্ষ ও উদ্ভিদ কর্তন করা (শামী, ২য় খণ্ড)।

জিনায়াতের কারণে কখনো দু'টি দম, কখনো একটি, কখনো সাদাকা কখনো রোযা ওয়াজিব হয়।

যদি কোন কর্ম বিনা ওযরে সংঘটিত হয় এবং সে কাজটি পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করা হয় তাহলে অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে। আর যদি অসম্পূর্ণরূপে করা হয় তাহলে শুধু সাদাকা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি ওযরবশত করা হয় এবং পরিপূর্ণরূপে করা হয় তাহলে দম, রোযা অথবা সাদাকা ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে এর কোন একটি আদায় করলেই তা আদায়

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। আর যদি অসম্পূর্ণরূপে করা হয় তবে রোযা অথবা সাদাকা জায়িয হবে। এ ক্ষেত্রেও যে কোন একটি আদায় করা জায়িয।

ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হলে কিরান হজ্জ পালনকারীর উপর দু'টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর মুফরিদের উপর একটি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অবশ্য কারিন যদি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করে তবে এ ক্ষেত্রে তার উপর একটি মাত্র দম ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

হরমের নিষিদ্ধ কাজ এবং স্থলজ প্রাণী শিকার করলে এর ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ইখ্‌তিয়ার রয়েছে। যদি শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য দ্বারা অনুরূপ কোন প্রাণী খরীদ করা যায় তবে তা খরীদ করে যবাই করে দিবে। তা সম্ভব না হলে এর মূল্য সাদাকা করে দিবে অথবা এর পরিবর্তে রোযা রাখবে।

দম (দম মুত্‌লাক) বলতে বুঝায়, হজ্জের ক্ষেত্রে একটি বক্‌রী বা একটি ভেড়া বা একটি মেষ যবাই করা। আল্লামা কাহাস্‌তানী 'উযহিয়্যা' কিতাবে লিখেছেন যে যদি হজ্জে তামাত্তু বা কিরানে জিনায়াতের কারণে দম ওয়াজিব হলে অথবা শিকার বা মাথা মুণ্ডনের কারণে দম ওয়াজিব হলে এ ক্ষেত্রে উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ দ্বারা দম আদায় হয়ে যাবে।

জিনায়াতের কাফ্‌ফারা বা ক্ষতিপূরণ দিতে যেখানে সাদাকার কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য পৌনে দু'সের গম (১ কে জি ৭৫০ গ্রাম) অথবা সাড়ে তিন সের যব (শামী, ২য় খণ্ড)।

## দম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

জিনায়াত দ্বারা দম বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল জিনায়াতকারীর প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া। নাবালিগ বা পাগলের উপর দম বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব নয়।

নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ইচ্ছায় হোক, ভুলে হোক, অজ্ঞতাবশত হোক বা জ্ঞাতসারে হোক বা জোরপূর্বক চাপের মুখে হোক, জাগ্রতাবস্থায় হোক বা ঘুমন্ত অবস্থায় হোক বা কারো প্ররোচনায় হোক সর্বাস্থায় দম বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ কর্মসমূহে লিপ্ত হওয়া কঠিন গুনাহ। তজ্জন্য কাফ্‌ফারা আদায়সহ তাওবা করা বাঞ্ছনীয়।

কাফ্‌ফারা যথাশীঘ্র আদায় করা বাঞ্ছনীয়। তবে বিলম্বে আদায় করা জায়িয আছে। যদি মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয় তখন কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আদায় না করেই মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হবে। এ অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বেই ওসিয়্যত করে যাওয়া কর্তব্য। ওসিয়্যত না করে গেলে ওয়ারিসদের উপর তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে রোযা রাখা বৈধ নয় (শামী, ২য় খণ্ড)।

## সুগন্ধি দ্রব্য এবং তেল ব্যবহার করা

সুগন্ধি দ্রব্য বলতে এমন বস্তুকে বুঝায় যার মধ্যে তৃপ্তিদায়ক উত্তম ও আকর্ষণীয় ঘ্রাণ রয়েছে যা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং যার দ্বারা সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করা হয়। যেমন- কস্তুরি, কর্পূর, আম্বর, চন্দন, জাফরান ইত্যাদি।

www.pathagar.com

শরীরে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত তিন প্রকার ঃ

১. যা মূলতই সুগন্ধি দ্রব্য এবং যা সুগন্ধি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- মি্শক, আম্বর, কর্পূর ইত্যাদি। এ সব দ্রব্য যে ভাবেই ব্যবহার করা হোক তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এমনকি এ সব দ্রব্য ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

২. যা মূলত সুগন্ধি নয় এবং সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃতও হয় না। যেমন- চর্বি, ঘি, গিলিসারিন, ভ্যাসলিন ইত্যাদি। এ সব দ্রব্য যে ভাবেই ব্যবহার করা হোক তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৩. যা মূলত সুগন্ধি নয় কিন্তু সুগন্ধী দ্রব্য তৈরীর উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- যায়তুন তৈল, তিলের তৈল ইত্যাদি। এ সকল দ্রব্য কখনো সুগন্ধির জন্য এবং কখনো ঔষধ হিসাবে শরীরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইহ্রাম অবস্থায় এ সকল দ্রব্য সুগন্ধী হিসাবে ব্যবহার করা হলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর সুগন্ধী হিসাবে ব্যবহার না করে ওষুধ বা অন্য কোর প্রয়োজনে ব্যবহার করলে তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

মুহরিম যদি অধিক পরিমাণে সুগন্ধী ব্যবহার করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অল্প পরিমাণ ব্যবহার করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। বেশী পরিমাণ নির্ণয়ে ফকীহ্গণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কেউ অধিক বলতে দেহের কোন বড় অংগে সুগন্ধী লাগানো বুঝিয়েছেন। যেমন- মাথা, গোড়ালী, মুখমন্ডল, দাড়ি, হাত, হাতের তালু, উরু ইত্যাদি। কেউ অধিক বলতে বড় অংগের এক চতুর্থাংশ ধরে নিয়েছেন। ইমাম আবূ জাফর (র.) কম-বেশীর বিবেচনা করে সুগন্ধীর পরিমাণের উপর নির্ণয় করেছেন। যদি সুগন্ধীর পরিমাণ যে লোক একে বেশী মনে করে তবে তা অধিক বলে গন্য হবে। আর যদি সে পরিমাণ না হয় তবে অল্প হিসাবে গণ্য হবে। তবে বিশুদ্ধ কথা এবং সমন্বয়মূলক বক্তব্য হল, যদি সুগন্ধী অল্প হয় তখন অংগ ধর্তব্য হবে। এবং পরিমাণের উপর বিবেচনা করা হবে। সুতরাং অল্প সুগন্ধিও যদি একটি পুরো অংগে মাখা হয় তা হলে তা অধিক হিসাবে গণ্য হবে এবং এতে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সুগন্ধী পরিমাণে বেশী হয় তখন তা ধর্তব্য হবে। এর দ্বারা যদি একটি অংগের এক চতুর্থাংশও মাখা হয় তা হলেও দম ওয়াজিব হবে। শরীরে সুগন্ধী মাখার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কাপড়, লুংগি ও চাদরে সুগন্ধী মাখা নিষিদ্ধ। এ সবের মধ্যে অধিক পরিমাণ সুগন্ধী ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে আর কম পরিমাণ ব্যবহার করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই ইহ্রামের অবস্থায় সুগন্ধী মাখা না জায়িয।

পুরো শরীরে এক সাথে সুগন্ধী লাগালে একটি দম ওয়াজিব হবে। পুরো শরীর একটি অংগ হিসাবে গন্য।

আর যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একেক অংগে সুগন্ধী লাগানো হয় তাহলে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে প্রতিটি অংগের জন্য একটি করে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে যদি সে প্রথমটির কাফ্ফারা আদায় করে থাকে এর পর অন্য অংগে সুগন্ধী লাগায় তাহলে দ্বিতীয় অংগে লাগানোর অপরাধে আরো একটি

www.pathagar.com

কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রথমটির কাফ্ফারা আদায় না করে থাকে তাহলে একটি কাফ্ফারাই যথেষ্ট হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মেহেদি দ্বারা মাথা রংগালে দম ওয়াজিব হবে। মেহেদির রস ব্যবহার করলে একটি দম ওয়াজিব হবে। বাটা মেহেদি চুলে এক দিন এক রাত্র লাগিয়ে রাখলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের কারণে এবং দ্বিতীয়টি মাথা ঢাকার অপরাধে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি মুহরিম শরীর পরিস্কারক সুগন্ধি যুক্ত কোন দ্রব্য দিয়ে গোসল করে এবং দর্শক সেটাকে শরীর পরিস্কারক দ্রব্য হিসাবে গন্য করে তবে সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর যদি সেটাকে সুগন্ধি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইমাম মোহাম্মদ (র.) -এর মতে কেউ সুগন্ধি যুক্ত সুরমা একবার দু'বার ব্যবহার করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর যদি একাধিকবার ব্যবহার করে তখন দম ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শরীরে বিভিন্ন স্থানে লাগানো খুশবু একত্র করলে যদি এক অংগের সমান বলে অনুমিত হয় তবে দম ওয়াজিব হবে। অন্যথায় সাদাকা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এমন খাদ্যদ্রব্য যা রান্নার প্রয়োজন হয় না, তার সাথে যদি সুগন্ধি মিশ্রিত করা হয় আর এতে যদি সুগন্ধির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যায় তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে ঘ্রাণ অব্যাহত থাকলে মাকরূহ হবে। আর সুগন্ধির পরিমাণ বেশী থাকলে এর জন্য দম ওয়াজিব হবে। পানীয় বস্তুর সাথে সুগন্ধি মিশ্রিত করলে এবং সুগন্ধির পরিমাণ বেশী হলে দম ওয়াজিব হবে। অন্যথায় সাদাকা ওয়াজিব হবে। তবে একাধিক বার পান করলে এক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি খাদ্যের সাথে সুগন্ধি মিশিয়ে রান্না করা হয় আর রান্নার ফলে যদি ঘ্রাণ পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে তা আহার করলে কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সরাসরি সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে।

যায়তুন তৈল, তিলের তৈল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করলে বা ক্ষত স্থানে লাগালে, বা পায়ের আংগুলের ফাকে ব্যবহার করলে অথবা কানে ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করলে দম বা সাদাকা কোনটাই ওয়াজিব হবে না। তবে সরাসরি সুগন্ধি যেমন - মিশ্ক, আম্বর, কর্পুর এগুলো ব্যবহার করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি শরীর বা কাপড় হতে সুগন্ধি দূর না করে কাফ্ফারা করে তবে পুনরায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কিনা এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে কাফ্ফারা দম ওয়াজিব (বাহরুর রাইক ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সুগন্ধ যুক্ত ফল বা ফুলের ঘ্রাণ নিলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না, তবে মাকরূহ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আতরের দোকান অথবা ব্যবসা কেন্দ্রে বসতে কোন ক্ষতি নেই তবে সুঘ্রাণ ভোগ করার

www.pathagar.com

জন্য সেখানে গমনাগমন করলে মাকরূহ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুহরিমের জন্য জাফরান মিশ্রিত হালুয়া খাওয়াতে কোন দোষ নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**সেলাই যুক্ত কাপড় ব্যবহার করা**

ইহ্‌রাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। সেলাইযুক্ত কাপড় বলতে এমন কাপড়কে বুঝায় যা সাধারণত পূর্ণ বা কোন অংগের মাপ অনুসারে তৈরী; যা অংগকে আবৃত করে রাখে এবং কাজ কর্মের সময় খুলে যাবার আশংকা থাকে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

মুহরিম সেলাইযুক্ত কাপড় এক দিন এক রাত পর্যন্ত বা এর চেয়ে বেশী সময় ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম সময় ব্যবহার করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান চাই ভুলে হোক, সেচ্ছায় হোক, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক এক দিন এক রাত হলে দম ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

বুতাম লাগানো বা আস্তিনে হাত ঢুকানো ব্যতীত বা চোগা সেরোয়ানী ইত্যাদি সেলাইযুক্ত কাপড় যদি চাদরের মত জড়িয়ে দেয় বা লুংগির মত গিড়া দিয়ে রাখে বা কঁধে ফেলে রাখে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে এমন করা মাকরূহ হবে। বুতাম লাগালে বা আস্তিনে হাত ঢুকালে এবং এক দিন এক রাত পরিধান করলে দম ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

কেউ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করে ইহ্‌রাম বাঁধলে অতঃপর ঐ কাপড় একদিন ব্যবহার করলে একটি দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম সময় ব্যবহার করণে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি পরিধান না করার ইচ্ছায় খুলে ফেলে এবং দম আদায় করে দেয় পরে আবার পরিধান করে তখন দ্বিতীয় আরও একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি প্রথমটির কাফ্‌ফারা আদায় না করে থাকে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে দুঁটি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি এমন হয় যে সেলাই করা কাপড় দিনে পরিধান করে এবং রাতে এ নিয়তে খুলে ফেলে যে সকালে পরবে তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এ নিয়্যতে করে ফেলে যে আর পরবে না তারপরও পরিধান করে তাহলে দু'টি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এক মুহ্‌রিম অন্য মুহরিমকে সেলাইযুক্ত কাপড় বা সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরিয়ে দিলে যিনি পরিয়ে দেবেন তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সে গুনাহগার হবে এবং পরিধানকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মুহ্‌রিম সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধাণ করতে বাধ্য হল এবং দু'টি কাপড় পরিধাণ করল। তাহলে দু'টিই যদি প্রয়োজনে ব্যবহার করে একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি একটি জামা পরিধানের প্রয়োজন হয় কিন্তু সে পরল দু'টি অথবা একটি জামা ও একটি জোব্বা পরল বা টুপির প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে টুপি পাগড়ী দু'টিই লাগাল তাহলে এগুলো যদি ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে পরিধাণ করে তখন দু'টি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। একটি প্রয়োজনের দ্বিতীয়টি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত পরিধানের জন্য।

www.pathagar.com

কোন কাপড় প্রয়োজনে পরিধাণ করল এরপর ঐ প্রয়োজন দূর হয়ে গেল। কিন্তু সে পোশাক পরতেই থাকল এরূপ একদিন বা দু'দিন পর্যন্ত একাধারে পরলো তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি প্রয়োজন দূরীভূত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকীন হয়ে থাকে তারপর ব্যবহার করে তখন দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। একটি প্রয়োজনে দ্বিতীয়টি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সময় পরিধানের জন্য।

মুহ্রিম অসুস্থ হয়ে পড়ল বা শরীরে জ্বর দেখা দিল এ অবস্থায় তিনি বাধ্য হলেন সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে। কিন্তু অবস্থাটা এমন যে কখনো কাপড় পরার প্রয়োজন হয় কখনো হয় না অথচ একাধারে ব্যবহার করে যাচ্ছে তখন একটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে আর যদি প্রথম জ্বর দূর হয়ে দ্বিতীয় বার জ্বর এসে যায় অথবা প্রথম রোগ দূর হবার পর অন্য রোগের পাদুর্ভাব ঘটে কিন্তু সে অনবরত কাপড় ব্যবহার করতে থাকে তাহলে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) অভিমত অনুযায়ী দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ইহ্রাম অবস্থায় মোজা বা পায়ের উপরিভাগ আবৃত করে জুতা পরিধান করা নিষিদ্ধ। এরূপ জুতা মোজা পরিহিত অবস্থায় এক দিন বা এক রাত অতিবাহিত করলে দম ওয়াজিব হবে এর কম সময় হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে এক চতুর্থাংশের কম জায়গা আবৃত করে রাখলেও সাদাকা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)।

মুহ্রিম এমন বস্তু মাথার উপর বহন করল বা ধরে রাখলে যা মাথা ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয় না যেমন- থালা, পেয়ালা, গোসলের টপ ইত্যাদি তাহলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি কাপড় জাতীয় হয় যা দিয়ে মাথা ঢাকা যায় তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

সাদাকা বলতে পৌনে দুই সের ( ১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) গম বুঝায়। আর কম সময় বলতে কমপক্ষে এক ঘন্টা হতে হবে। 'খিয়ানাতুল আকমাল' গ্রন্থের বর্ণনা মতে এক ঘন্টা পরিমাণ সময় আবৃত রাখলে পৌনে দুই সের গম ওয়াজিব হবে। আর এর চেয়ে কম সময় আবৃত রাখলে হলে এক মুঠো গম দেওয়া ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

## চুল বা পশম মুণ্ডন করা বা ছাঁটা

মুহ্রিম ব্যক্তি শরয়ী ওযর ব্যতিত মাথা মুণ্ডন করলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে দম ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না। চুল, পশম, মুণ্ডন, ছাঁটা, উপড়ানো বা লোমনাশক দ্রব্য দ্বারা দূরীভূত করা ইত্যাদির হুকুম একই।

মাথার চার ভাগের এক ভাগ মুণ্ডন করলে দম ওয়াজিব হবে। এক চতুর্থাংশের কম হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

ঘাড়ের সম্পূর্ণ পশম মুণ্ডন করলে দম ওয়াজিব হবে।

যদি দাড়ির এক চতুর্থাংশ বা এর অধিক মুণ্ডন করে তবে দম ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে এক চতুর্থাংশের কম হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

নাভীর নিচের পশম বা বগলের পশম মুণ্ডন করলে বা উপড়িয়ে ফেললে একটি দম ওয়াজিব হবে।

পূর্ণ একটি অংগের পশম মুণ্ডন করা হলে দম ওয়াজিব হবে। আর আংশিক মুণ্ডন করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে অংগ দ্বারা উরু, গলা, বগল, নাভীর নিম্নাংশের পশম কর্তন করা বুঝানো হয়েছে। মাথা ও দাড়ি এ হুকুমের অর্ন্তভুক্ত নয়।

মাথা, নাক এবং দাড়ি থেকে একাধিক চুল উপড়ালে প্রতিটি চুলের পরিবর্তে এক মুঠো পরিমাণ খাদ্য দান করতে হবে।

রান্না করতে যেয়ে কিছু চুল পুড়ে গেলে এর জন্য সাদাকা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ মাথা বা দাড়ি চুলকাতে যেয়ে দু'একটি চুল উপড়ে গেলেও সাদাকা করতে হবে। তবে অসুখ বিসুখের কারণে যদি চুল পড়ে যায় অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় যদি তা পড়ে যায় তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

একই স্থানে বসে মুহরিম যদি মাথা দাড়ি বা বগলের পশম মুণ্ডন করে তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এর সকল কাজ আলাদা আলাদা স্থানে করে তাহলে প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক দম ওয়াজিব হবে।

মুহরিম ব্যক্তি যদি মাথা মুণ্ডনের পর দম আদায় করে তারপর ঐ স্থানে বসেই দাড়ি মুণ্ডন করে তাহলে পুনরায় দম ওয়াজিব হবে।

যদি মুহরিম ব্যক্তি চার স্থানে বসে এক চতুর্থাংশ করে মাথা মুণ্ডন সমাপ্ত করে এবং মাঝখানে কোন দমই আদায় না করে থাকে তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

মুহরিম যদি অন্য কোন মুহরিম বা হালাল (যিনি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেনি) ব্যক্তির চুল মুণ্ডন করে দেয় তবে মুণ্ডনকারী মুহ্রিমের উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

হালাল ব্যক্তি মুহরিমের আদেশে অথবা আদেশ ছাড়াই তার মাথা মুণ্ডন করে দিলে দম মুহরিমের উপরই ওয়াজিব হবে। মুণ্ডনকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

গোফ মুণ্ডন করলে বা মাথার চার ভাগের একভাগের কম মুণ্ডন করলে বা গর্দানের কিছু অংশ মুণ্ডন করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে (শামী ২য় খণ্ড)।

**নখ কর্তন করা**

মুহ্‌রিম নখ কর্তন করা জায়িয নয়। যদি একহাত বা এক পায়ের আংগুলের সমস্ত নখ শরয়ী ওযর ব্যতিত কর্তন করে তবে দম ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি একই মজলিসে হাত পায়ের সব নখ কর্তন করে তাহলেও একটি দম যথেষ্ট হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি এক হাতের তিনটি বা এক পায়ের তিনটি নখ কর্তন করে তাহলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। প্রতিটি নখের জন্য পৌনে দু'সের (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) গম ওয়াজিব হবে।

একই হাতের পাঁচটি নখ কর্তন করার পর কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বেই অন্য হাতের নখ কর্তন করলে এবং একই স্থানে করলে একটি দমই যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি ভিন্ন স্থানে কর্তন

www.pathagar.com

করে তাহলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে।

যদি উভয় হাত এবং পা তথা অঙ্গ চতুষ্টয় থেকে মোট পাঁচটি নখ কর্তন করে তাহলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। প্রতিটি নখের জন্য পৌনে দু'সের গম ওয়াজিব হবে। যদি অঙ্গ চতুষ্টয়ের প্রতিটি অঙ্গ থেকে চারটি করে নখ কর্তন করে তাহলে প্রতিটি নখের জন্য পৌনে দু'সের গম দিতে হবে। তবে এর মূল্য দম পরিমাণ হয়ে গেলে দমের মূল্য থেকে কিছু কম আদায় করবে (আলমগীরী ১ম খণ্ড)।

মুহ্‌রিমের নখ ভেংগে লটকে থাকলে তা আলাদা করে ফেললে এতে কিছুই ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## স্ত্রী-সহবাস করা

যোনীদ্বার ছাড়া অন্যভাবে সংগম করা, স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা উত্তেজনার সাথে চুমো খাওয়া দ্বারা হজ্জ ও উমরা নষ্ট হয় না। বীর্যপাত হোক বা না হোক তবে দম ওয়াজিব হবে। কামোদ্দীপনার সাথে স্ত্রীর সংগে কোলকোলি করলেও দম ওয়াজিব হবে। স্ত্রী-লিংগের প্রতি উত্তেজনার সাথে দৃষ্টিপাতের দরুন বীর্যপাত হলে কিছুই ওয়াজিব হবে না(আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

স্বপ্নের দোষ দ্বারা গোসল ছাড়া আর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

হস্ত-মৈথুন দ্বারা বীর্যপাত ঘটালে দম ওয়াজিব হবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইফরাদ হজ্জ পালনকারী হলে তারা যদি উকূফে আরাফার পূর্বে ইহ্‌রাম অবস্থায় সহবাস করে তবে উভয়ের হজ্জই বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় প্রত্যেকের উপর একটি করে দম ওয়াজিব হবে। আর অবশিষ্ট কার্যাবলী বিশুদ্ধ হজ্জের ন্যায় যথানিয়মে আদায় করে যেতে হবে। এ সময় ইহ্‌রাম নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকেও বিরত থাকতে হবে। যদি নিষিদ্ধ কোন কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তবে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অবশ্য পরবর্তী বছর উভয়েরই এ হজ্জের কাযা করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আরাফায় অবস্থান পূর্বেই একবার সহবাস করার পর কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বে যদি পুনঃসহবাস করে তাহলে একাজ একই স্থানে করে থাকলে একটি দমই ওয়াজিব হবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয় তবে তিনবার সহবাস করলে ততটি দম ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রেও পরবর্তী বছর এ হজ্জ কাযা করতে হবে।

যদি আরাফায় উকূফ করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে হজ্জ ফাসিদ হবে না চাই তা ইচ্ছায় হোক বা ভুলে হোক। তবে এর জন্য স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের উপর গরু বা উট কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি পুনরায় একই স্থানে সহবাস করে তাহলে একই উট বা গরু যথেষ্ট হবে। আর যদি বিভিন্ন স্থানে হয় তাহলে উভয়ের উপর প্রথম সহবাসের কারণে গরু বা উট এবং দ্বিতীয় সহবাসের কারণে বকরী যবাহ্‌ করা ওয়াজিব হবে।

মাথা মুণ্ডনের পর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সহবাস করলে বকরী ওয়াজিব হবে। যদি তাওয়াফে জিয়ারতের পর সহবাস করে, যদি মাথা মুণ্ডনের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে বকরী ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

মুহ্রিম যদি কিরান হজ্জ আদায়কারী হয় এবং উমরার জন্য তাওয়াফ করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে হজ্জ ও উমরা উভয়টিই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে হজ্জ ও উমরার অবশিষ্ট কাজগুলো যথানিয়মে আদায় করবে এবং পরবর্তীতে এ হজ্জ ও উমরা কাযা করবে এ অবস্থায় তার দায়িত্ব থেকে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু তার উপর দু'টি বকরী যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে। যদি কিরান হজ্জ আদায়কারী উমরার পর উকূফে আরাফার পূর্বে সহবাস করে তাহলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু উমরা নষ্ট হবে না। তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করতে হবে। আর যদি উকূফে আরাফার পর সহবাস করে তাহলে তার হজ্জ ও উমরা কোনটিই নষ্ট হবে না। এ অবস্থায় তার উপর হজ্জের জন্য একটি উট বা গরু এবং উমরার জন্য একটি বকরী ওয়াজিব হবে এবং কিরানের দমও তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর বা অধিকাংশ আদায় করার পর সহবাস করে তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে যদি মাথা মুণ্ডনের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে তাহলে দু'টি বকরী যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে। একবার সহবাস করার পর যদি পুনরায় সহবাস করে এবং তা প্রথম স্থানেই হয়, তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**হজ্জের ওয়াজিবসমূহ থেকে কোন ওয়াজিব তরক করা**

হজ্জের ওয়াজিবসমূহের মধ্য থেকে যদি কেউ কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি শরী'আত স্বীকৃত কোন ওযরের কারণে কোন ওয়াজিব আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

মুহ্রিম ব্যক্তি মাথা মুণ্ডনে বিলম্ব করলে এমনকি কুরবাণীর দিন পার হয়ে গেলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অনুরূপ তামাত্তু ও কিরান হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি কুরবাণীর দিন সমূহে কুরবাণী না করলে দম ওয়াজিব হবে। কিরান হজ্জ আদায়কারী কুরবাণীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি কুরবাণীর পূর্বে মুণ্ডনের অপরাধে দ্বিতীয়টি কিরানের দম হিসাবে (আলমগীরি, ১ম খণ্ড)।

মুহ্রিম ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারত উযূবিহীন অবস্থায় আদায় করলে বকরী যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে। আর জুনূবী (গোসল ফরয হয়) অবস্থায় তাওয়াফ করলে উট যবাহ্ করতে হবে। পূর্ণ তাওয়াফ কিংবা অধিকাংশ তাওয়াফ এ অবস্থায় আদায় করলে এ হুকুম কার্যকর হবে। এ ক্ষেত্রে উত্তম হল, পুনরায় তাওয়াফ করা যদি সে তখন মক্কায় অবস্থান করে। পুনরায় তাওয়াফ করার পর যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে না। বিশুদ্ধ মতে উযূবিহীন অবস্থায় তাওয়াফ করলে পুনরায় তাওয়াফ করা মুস্তাহাব এবং জুনূবী অবস্থায় তাওয়াফ করলে পুনরায় তাওয়াফ করা ওয়াজিব (আলমগীরি, ১ম খণ্ড)।

তাওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর বা এর চেয়ে কম ছেড়ে দিলে বকরী যবাহ্ করতে হবে। এ অবস্থায় বাড়ী চলে আসলে পুনরায় তাওয়াফ না করে একটি বকরী পাঠিয়ে দিলে তা যথেষ্ট হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের অর্ধেকের কম উযূবিহীন অবস্থায় আদায় করে বাড়ী চলে আসলে সাদাকা ওয়াজিব হবে এবং প্রতিটি চক্করের জন্য পৌনে দু'সের (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) গম

www.pathagar.com

দিতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের অর্ধেকের কম অংশ জুনূবী অবস্থায় আদায় করে বাড়ী ফিরে আসলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর তখন মক্কায় অবস্থান করলে পবিত্র হয়ে পুনরায় তাওয়াফ আদায় করে নিলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত হল, কুরবানীর দিনসমূহে আদায় করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। অন্যথায় সাদাকা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

বিদায়ী তাওয়াফ উযূবিহীন অবস্থায় আদায় করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর যদি তাওয়াফের কিছু অংশ উযূহীন অবস্থায় আদায় করে তাহলেও সাদাকা ওয়াজিব হবে। পুনরায় তাওয়াফ করলে সাদাকা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি বিদায়ী তাওয়াফের পুরোটা বা অধিকাংশ জুনূবী অবস্থায় আদায় করে তাহলে বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি বাড়ী চলে থাকে। আর তখনও মক্কায় অবস্থান করলে পুনরায় তাওয়াফ করে নিলে কুরবানী রহিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে কিছুই ওয়াজিব হবে না। বিদায়ী তাওয়াফের কিছু অংশ জুনূবী অবস্থায় আদায় করে বাড়ী চলে আসলে সাদাকা ওয়াজিব হবে এবং প্রতিটি চক্করের জন্য পৌনে দু'সের গম দিতে হবে। তবে মক্কায় থাকা কালে পুনরায় তাওয়াফ আদায় করে নিলে কিছুই ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তাওয়াফে যিয়ারত জুনুবী অবস্থায় আদায় করলে পুনরায় তাওয়াফ করা ফরয। বিদায়ী তাওয়াফ আইয়ামে তাশরীফের শেষের দিন পবিত্রাস্থায় আদায় করলে বিদায়ী তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারত হিসেবে গন্য হবে। এ ক্ষেত্রে বিদায়ী তাওয়াফ না করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি বিনা উযূতে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় তরে থাকে এবং বিদায়ী তাওয়াফ পবিত্রাস্থায় তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি তাওয়াফে যিয়ারত উযূ ছাড়া এবং বিদায়ী তাওয়াফ জুনূবী অবস্থায় আদায় করে তাহলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তাওয়াফে কুদূম উযূবিহীন অবস্থায় আদায় করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে এবং জুনূবী অবস্থায় আদায় করলে বকরী যবাহ্ করতে হবে। বিনা উযূতে তাওয়াফ করার পর পর সাঈ ও রমল করলে তা জায়িয হবে। উত্তম হল তাওয়াফে যিয়ারতের পর এ দু'টো আদায় করা। যদি তাওয়াফে কুদুম জুনূবী অবস্থায় আদায় করে এর পরই সাঈ ও রমল করে তাহলে তা ধর্তব্য হবে না এবং তার উপর তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করা ওয়াজিব এবং সে সাঈতে রমল করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হদস বা জুনুবী অবস্থায় উমরাহ জন্য তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থান করলে পুনঃরায় তাওয়াফ করতে হবে। বাড়ী চলে আসলে হদস অবস্থায় তাওয়াফের জন্য ওয়াজিব হবে এবং জুনূবী অবস্থার জন্যও বক্‌রী যবাহ্ করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য দমের এ বক্‌রী হরমের এলাকার মধ্যেই যবাহ্ করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

বিনা উযূতে কেউ যদি উমরার তাওয়াফ ও সাঈ করে এবং এর পারও মক্কায় অবস্থান করে তাহলে তাকে এ দুটোই পুনঃরায় আদায় করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর না করা অবস্থায় বাড়ী ফিরে থাকলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

সাফা মারওয়ার সাঈ পরিত্যাগ করলে হজ্জপূর্ণ হয়ে যাবে। অবশ্য এ জন্য দম ওয়াজিব হবে। জানাবাত বা হায়িয নিফাস অবস্থায় সাঈ করলে সাঈ শুদ্ধ হবে। কাধে আরোহন করে

www.pathagar.com

অথবা কোন কিছুর উপর সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ বা সাঈ করলে যদি তা ওযরের কারণে হয় তাহলে তখন কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি বিনা ওযরে এরূপ করে এবং এর পরও মক্কায় আবস্থান করে তাহলে পুনরায় তাওয়াফ ও সাঈ করবে। আর বাড়ী দিয়ে আসলে দম দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুযদালিফার অবস্থান তরক করলে দম ওয়াজিব হবে। যদি কেউ পুরো চারদিনের রমী তরক করে অথবা এক দিনের পুরা রমী তরক করে চাই তা দশ যিলহজ্জের হোক না কেন অথবা কেউ যদি এক দিনের রমীর অধিকাংশ কংকর নিক্ষেপ তরক করে যেমন দশ তারিখের রমী হতে চারটি মাত্র কংকন নিক্ষেপ করল অথবা অন্যান্য দিনগুলির রমী হতে এগারটি কংকর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল তাহলে এসব অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এক দিনের রমী হতে অল্প সংখ্যক কংকর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয় যেমন দশই যিলহজ্জ তারিখে তিনটি বা তার থেকে কম এবং অন্যান্য দিনে দশটি অথবা তা থেকে কম এরূপ অবস্থায় প্রতিটি কংকরের পরিবর্তে সাদাকা ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি মোট সদাকা দমের সমান হয়ে যায় তবে সাদাকার পরিমাণ সামান্য হ্রাস করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ উমরার ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে হরমের বাইরে মাথা মুণ্ডন করে অথবা হজ্জের ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য হরমের বাইরে কুরবানীর দিনসমূহে মাথা মুণ্ডন করে তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি হজ্জের মধ্যে হরমের বা ঈদের কুরবানীর দিনসমূহের পরে মাথা মুণ্ডন করে তাহলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে।

রমী, কুরবানী, মাথা মুণ্ডন ও তাওয়াফে যিয়ারত এই চারটি আমলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। কাজেই যদি ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি রমী করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে অথবা কিরান বা তামাত্তু পালনকারী ব্যক্তি যদি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে অথবা কিরান বা তামাত্তু পালনকারী ব্যক্তি যদি রমী করার পূর্বে যবাহ্ তরে তবে দম ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

### স্থলজ প্রাণী শিকার করা এবং একে কষ্ট দেওয়া

স্থলজ প্রাণী বলতে সে সক'ল প্রাণীর জন্ম স্থলে যদিও তা পরে পানিতে বাস করে। আর জলজ প্রাণী বলতে সে সকল প্রাণীকে বুঝায় সেগুলোর জন্ম পানিতে যদিও পরে তা স্থলে বাস করে। জন্মস্থান মূল ভিত্তি। এ হিসাবেই জলজ ও স্থলজ নির্ধারণ করা হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুহরিমের জন্য স্থলজ প্রাণী শিকার করা হারাম। শিকার করলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জলজ প্রাণী শিকার করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুহরিমের জন্য কোন ব্যক্তিকে শিকার দেখিয়ে দেওয়া বা শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হারাম। এরূপ করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে শিকারী ব্যক্তির মুহরিম হওয়া শর্ত নয়। যদি মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তিকে শিকার দিখিয়ে দেয় বা ইঙ্গিত করে এবং সে মোতাবেক শিকার করা হয় তাহলে দিখিয়ে দেওয়ার কারণে মুহরিম ব্যক্তির উপর দম ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

যদি মুহরিমের নিকট থেকে ছুরি নিয়ে তা দিয়ে যবাহ করা হয় তাহলে মুহরিমের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি মুহরিমের সাহায্য নিয়ে যবেহ্ করা হয় তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মুহরিম শিকারীকে শিকার করার নির্দেশ দিলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। স্থলজ হারাম প্রাণী হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

পাগলা কুকুর, নেকড়ে বাঘ, চিল, দাড় কাক, সাপ বিচ্ছু, ইদুর এবং সর্বপ্রকার সরীসৃপ ও বিষাক্ত প্রাণী, ভিমরুল, পিপড়া, মশা, মাছি, কাকড়া, আটলী, কিট, বানর, কচ্ছপ, ইত্যাদি হত্যা কারলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

হরমের ভিতরে হোক বা বাইরে হোক। তবে যে সকল প্রাণী অনিষ্ট করে না সেগুলো হত্যা করা বৈধ নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ কোন প্রাণীকে আহত করে কাফ্ফারা আদায় করার পর যদি পুনঃ সেটাকে হত্যা করে তবে পুনরায় তার উপর কাফ্ফারা ওযাজিব হবে। যদি কোন পশু আহত করার পর তা পংগু হয়ে যায় তারপর একে হত্যা করা হয় তাহলে তার উপর একটি কফ্ফারাই ওয়াজিব হবে যদি আহত করার কাফ্ফারা আগে আদায় না করে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি দু'জন মুহরিম কোন একটি শিকার হত্যা করে চাই তা হরমের ভিতর হোক বা হরমের বাইরে, তাহলে প্রত্যেকের উপর স্বতন্ত্রভাবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী)

যদি মুহরিম ব্যাক্তি হালাল হওয়া বা ইহ্রাম ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছায় একাধিক শিকার হত্যা করে তাহলে প্রতিটি পশু হত্যার কারণে একটি তরে দম দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি ফাঁদ পাতা হয় এবং কোন শিকার এতে আটকে গিয়ে মারা যায় অথবা পানির জন্য খননকৃত কুপে পড়ে শিকার মারা যায় তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

যদি শিকার আহত হওয়ার পর উধাও হয়ে যায় এবং তার বাঁচা মরা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া না যায় তাহলে পূর্ণ কাফ্ফারা দিতে হবে। শিকার আহত করার পর তা মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি শিকার যখমী হবার পর চলে যায়, পরে তা মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তা অন্য কোন কারণে মারা গেছে তাহলে কেবলমাত্র যখমের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

**শিকারের ক্ষতিপূরণ**

শিকারের ক্ষতিপূরণ এই যে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবাদী মুসলমান হত্যাকৃত পশুটির মূল্য নির্ধারণ করবে এবং তা আদায় করা। এবং মূল্য বলতে যেখানে পশুকে হত্যা করা হবে সেখানকার বাজার মূল্য বা তার নিকটবর্তী স্থানের মূল্য আদায় করা (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি এমন স্থানে শিকার হত্যা করা হয় যেখানে বেচা-কেনা হয় না তাহলে এর নিকটবর্তী স্থানের মূল্য ধর্তব্য হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

শিকারের মূল্য সাব্যস্ত হওয়ার পর মুহরিমের জন্য ইখ্তিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে এর মূল্য দ্বারা পশু কিনে তা হরমে যবাহ্ করবে অথবা ঐ টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে সাদাকা আদায় করে দিবে। এবং প্রত্যেকে মিস্কীনকে রোযার ফিতরার সম পরিমাণ প্রদান করা জায়িয

www.pathagar.com

নেই। মিসকীনকে ফিতরার সম পরিমাণ খাদ্য প্রদানের পরিবর্তে একটি রোযা রাখাও জায়িয আছে। যদি খাদ্য ফিতরার পরিমাণ থেকে কম বাচে অথবা কোন প্রাণীর ক্ষতিপূরণ যে প্রাথমিক পর্যায়ে এত অল্প পরিমাণ অর্থ ওয়াজিব হয় যে তা ফিতরার পরিমাণ থেকে কম (যেমন চড়ুই পাখির মূন্য) তাহলে তা সম্পূর্ণ একজন মিসকীনকেই দিয়ে দিবে অথবা একটি রোযা রাখবে। ক্ষতিপূরণের পশু হরমেই যবাহ করতে হবে এবং এর গোশত মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। খাদ্য প্রদান এবং রোয়া রাখা যে কোন স্থানেই জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শিকারের মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণের পশু খরীদ করার পর যদি এমন পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে যার দ্বারা আরেকটি পশু ক্রয় করা যায় না তবে এই অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে খাদ্য খরীদ করে তা মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে অথবা প্রতি পৌনে দু'সের গমের মূল্যের পরিবর্তে একটি করে রোযা রাখতে পারবে। যদি শিকারের মূল্য দু'টি কুরবাণীর সম পরিমাণ হয় তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে যে ইচ্ছা করলে সে দু'টি পশু খরীদ করে তা হরমে যবাহ্ করতে পারবে অথবা দু'টির মূল্যই সাদাকা করতে পারবে অথবা একটি যবাহ্ করে অন্যটির মূল্য মিস্‌কীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে পারবে কিংবা রোযা রেখে কাফ্‌ফারা আদায় করবে অথবা তিনটির সমন্বয়ের মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় করতে পারবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুহরিম ব্যক্তি কোন পাখীর ডিম ভাংগলে কোণ কিছুই ওয়াজিব হবে না। ভাল ডিম ভাংগলে এর মূল্য জরিমানা দিতে হবে। ডিম ভাজি করলেও এর জরিমানা দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

পশু যবাহ করা অথবা শস্য প্রদানে সক্ষম হলেও ক্ষতিপূরণ বাবদ রোযা রাখা জায়িয।

শস্য প্রদানের ক্ষেত্রে শিকারের মূল্য বিবেচনা করতে হবে এবং রোযা রাখার ক্ষেত্রে শস্যের মূল্য বিবেচনা করতে হবে।

শিকারের উপর এক ব্যক্তির আঘাতের পর অপর ব্যক্তি আঘাত করলে প্রত্যেকের উপর সেই পরিমাণ ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে যে পারিমাণ ক্ষতি তার আঘাতে হয়েছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুহরিম ব্যক্তি কোন পশু আহত করার পর যদি সেটি মরে যায় তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে এর মূল্য আদায় করতে হবে। যদি আহত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে যায় এবং শরীরে কোন দাগ বা চিহ্ন না থাকে এজন্য মূল্য হ্রাস পায় তাহলে তাকে হ্রাস পরিমাণ মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি সেটা মারা গেল কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় তবে তাকে এর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে। যদি আহত করার পর মৃত পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে অন্য কারণে সেটি মারা গিয়েছে তাহলে আহত করার কারণে যে মূল্য হ্রাস পেয়েছিল এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### উকূন এবং টিড্ডি মারা

যদি মুহরিম ব্যক্তি শরীর, মাথা বা কাপড় থেকে এনে একটি উকূন মেরে ফেলে তাহলে কিছু পরিমাণ খাদ্য সাদাকা করে দিতে হবে। আর যদি মাটি থেকে কুড়িয়ে এনে মেরে ফেলে

www.pathagar.com

তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

দুই বা তিনটি উকূন মারলে এক মুঠো খাদ্য সাদাকা যথেষ্ট হবে। এর চেয়ে অধিক সংখ্যক উকূন মারলে সাদাকা করা পৌনে দু'সের গম ওয়াজিব হবে।

ইহ্‌রাম অবস্থায় যেমন নিজে উকূন মারতে পারবে না তেমনি অন্যকেও মারার জন্য উকূন দিতে পারবে না বা মারার জন্য ইশারও করতে পারবে না। এরূপ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উকূন মারার উদ্দেশ্যে উকূনযুক্ত কাপড় রোদে দেওয়া বা ধৌত করা জায়িয নেই। এরূপ করলে পৌনে দু'সের গম ওয়াজিব হবে।

যদি উকূন মারার ইচ্ছা না থাকে তবে এমনিতে কাপড় ধৌত বা রোদে দিলে তাতে উকূন মরলেও কিছুই ওয়াজিব হবে না।

টিড্ডিও শিকারের অন্তর্ভুক্ত। ইহ্‌রামাবস্থায় অথবা হরমের অভ্যন্তরে টিড্ডি বধ করলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। এর ক্ষতিপূরণ উকূনের ক্ষতিপূরণের ন্যায়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা অসাবধানতা বশতঃহত্যা করলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। যদি টিড্ডির এমন আধিক্য দেখা দেয় যে রাস্তা দিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে তখন অসতর্কতাবশতঃপায়ে পিষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুহ্‌রিমের ব্যক্তির জন্য শিকার ধরা তা বিক্রয় করা জায়িয নয়। ক্রেতা, ইহ্‌রাম বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপ মুহরিম হালাল ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করাও জায়িয নয়।

হরম এলাকার শিকার ধরা এবং তা বেচা-কেনা করা সর্বাবস্থায় নাজায়িয। বেচা-কেনার পর শিকার মরে গেলে উভয়ের উপরই এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত পশু মুহরিম ব্যক্তি যবাহ্ করলে তা মৃত বলে গণ্য হবে এবং তা খাওয়া হারাম। অনুরূপ হালাল অবস্থায় শিকার ধরে ইহ্‌রাম অবস্থায় তা যবাহ্ করলে তাও খাওয়া হারাম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শিকারকৃত পশু হরমের বাইরে রেখে দু'জন হালাল ব্যক্তি হরমে বসে পরস্পর বেচাকেনা করলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তা জায়িয হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তা জায়িয নয়। যদি হালাল ব্যক্তি হরম এলাকার শিকারকৃত পশু যবাহ্ করে তাহলে এর মূল্য সাদাকা করে দিবে। এর বিনিময়ে রোযা রাখলে তা যথেষ্ট হবে না।

হালাল ব্যক্তি যদি হরম এলাকায় কোন পশু শিকার করে তা যবাহ্ করে তা হলে এর গোশত খাওয়া যাবে না। আর মুহরিম যদি হরমের বাইরে বা হরমে যবাহ্ করে তাহলে তা মৃত হিসাবে গণ্য হবে। এবং মুহরিমের উপর এর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুহরিম শিকারের দিকে তীর নিক্ষেপ করে তা হত্যা করলে অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা বাজপাখী ছেড়ে দিয়ে শিকার হত্যা করলে তা খাওয়া জায়িয হবে না। এবং এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

### হরমে শিকার

হালাল ও মুহরিমের জন্য হরমে শিকার করা বৈধ নয়। মুহরিম ব্যক্তি শিকার করলে তার উপর তাই ওয়াজিব হবে যা হরমের বাইরে শিকার করলে ওয়াজিব হত। হরমের শিকার করার কারণে অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। কিরান আদায়কারী ব্যক্তি শিকার করলে তার উপর দু'টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয় তা হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এবং এর জন্য বক্‌রীর মূল্যের চেয়ে বেশী কিছু ওয়াজিব হবে না।

কোন হিংস্র পশু যদি মুহরিমের উপর হামলা করে এবং তা হত্যা করা ব্যতীত আত্মরক্ষার উপায় না থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ পশু হত্যা করলেও হত্যাকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত এবং যবেহ্‌কৃত পশুর গোস্ত মুহরিমের জন্য খাওয়া জায়িয। যদি ঐ শিকারের ব্যপারে মুহরিম ব্যক্তি ইশারা ইংগিত বা হুকুম দিয়ে কোন সহযোগিতা না করে থাকে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### শিকার ধরা এবং তা ছেড়ে দেওয়া

মুহরিম ব্যক্তি শিকার আটক করলে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। প্রাণীটি তার হাতে হোক বা পিঞ্জিরায় হোক বা বাড়ীতে হোক। মুহরিম তা ছেড়ে দিলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি সে তা হত্যা করে তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

যদি মুহরিমের হাত থেকে নিয়ে অন্য কেউ তা ছেড়ে দেয় তাহলে সে ব্যক্তি মুহরিমকে এর মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিবে।

যদি শিকার তার সাথে পিঞ্জিরায় থাকে অথবা তার বাড়ীতে থাকে তাহলে ছেড়ে দেওয়া জরুরী নয়। আর যদি তার সাওয়ারীর উপর থাকে বা পিঞ্জিরায় থাকে তাহলে ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আর যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় বাঁধে যে শিকার পিঞ্জিরার ভিতর আছে এবং এখনো সে শিকার সহ হরমে ঢুকেনি, তাহলে শিকার ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন শিকারী বাজপাখী নিয়ে হরমে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের পর তা ছেড়ে দেয়। এরপর ঐ বাজ পাখী হরমের কবুতর হত্যা করে তাহলে মুহরিমে উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি এক মুহরিম শিকার ধরে অন্য মুহরিম তা বধ করে তবে উভয়ের উপরে এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় যে মুহরিম শিকার ধরেছে সে হত্যাকারী মুহরিমের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### হরমের বৃক্ষ এবং উদ্ভিদ কর্তন

হরমের বৃক্ষ চার প্রকার ঃ

১. ঐ উদ্ভিদ যা সাধারণত রোপন করে থাকে এবং কোন ব্যক্তি তা লাগিয়েছে,

২. যা কোন ব্যক্তি রোপণ করেছে কিন্তু সাধারণত মানুষ এগুলো রোপন করে না,

৩. যা নিজে নিজে জন্মেছে কিন্তু সাধারণত সে গুলো মানুষ রোপণ করে থাকে,

৪. যা নিজে নিজে জন্মেছে এবং সাধারণত মানুষ ঐগুলো রোপণ করে না।

প্রথমোক্ত তিন প্রকারের গাছ কর্তন করলে হরমের কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। তবে তা কারো মালিকানাধীন হলে মালিককে মূল্য প্রদান করতে হবে। চতুর্থ প্রকারের বৃক্ষ কাটা বা উপড়ানো, মুহরিম বা হালাল সকলের জন্যই হারাম। চাই সেগুলো মালিকানাধীন হোক বা মালিকবিহীন হোক (শামী, ২য় খণ্ড)।

অবশ্য শুকনা বৃক্ষ কর্তন করা জায়িয। ইযখির নামক ঘাসও কর্তন করা জায়িয (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

উপড়ানো গাছ বা কর্তনকৃত গাছ কাটলে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। গাছের পাতা ছিড়লে যদি গাছের ক্ষতি না হয় তাহলে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

হরমের যে সব বৃক্ষ কর্তন করা জায়িয নয় এমন বৃক্ষ কোন বালিগ, বুদ্ধিমান, মুসলিম ব্যক্তি কর্তন করলে কর্তনকৃত বৃক্ষের মূল্য নিরুপন করে প্রত্যেক মিসকীনকে পৌনে দু'সের খাদ্য বিতরণ করবে এবং যে কোন স্থানে তা করতে পারবে। অথবা এর দ্বারা কোন পশু ক্রয় করে তা হরমে যবাহ্ করবে। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য রোযা রাখা জায়িয নয়। চাই সে মুহরিম হোক, অমুহরিম। কর্তিত গাছের মূল্য আদায় করার পর ঐ গাছ সে ব্যবহার করতে পারবে। তবে মাকরূহ হবে। গাছটি বিক্রিও করতে পারবে। তবে বিক্রি করলে এ মূল্য সদাকা করে দিতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আর গাছ যদি শুকিয়ে যায় এবং বাড়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ঐ গাছ কাটা এবং তা ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি দু'জন মুহরিম মিলে একটি গাছ কর্তন করে অথবা যদি দু'জন হালাল ব্যক্তি কিংবা একজন হালাল ও অপর জন মুহরিম ব্যক্তি মিলে তা কর্তন করে তাহলে দু'জনের উপর গাছটির মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করবে।

### কাফ্ফারার শর্তসমূহ

জিনায়াতে কাফ্ফারা অবস্থা বিশেষে তিন ভাবে আদায় করতে হয় ঃ

১. দম,

২. সাদাকা ও

৩. রোযা পালন।

### দম আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ

১. পশুতে নিজের মালিকানা থাকা,

২. যে সমস্ত পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়িয সে জাতীয় পশু হওয়া এবং কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য পশুর যেরূপ হওয়া শর্ত এখানেও তা শর্ত।

www.pathagar.com

৩. যদি জীবিত সাদাকা করে দেওয়া হয় তবে ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না। অবশ্য যদি কোন ফকীরকে দান করা হয় এবং তাকে যবাহ্ করার জন্য উকীল বানিয়ে দেওয়া হয় তবে জায়িয হবে।

৪. হরম এলাকায় যবাহ্ করা

৫. গোশত ফকীর মিস্‌কীনদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া

৬. দমের নিয়াত করা

৭. এমন কোন লোককে শরীক না করা যার নিয়্যত আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের ইচ্ছা নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

## সাদাকা সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ

১. পরিমাণ অর্থাৎ একসের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি, ৭৫০ গ্রাম) গম অথবা গমের আটা অথবা গমের ছাতু অথবা তিন সের নয় ছটাক (৩ কেজি, ৫০০ গ্রাম) যব বা যবের আটা বা যবের ছাতু বা খেজুর বা কিস্‌মিস। এই পরিমাণ থেকে কম হলে তার দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

২. যব, গম, খেজুর, কিসমিস এই চার প্রকারের খাদ্য হতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে বর্ণিত পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য শস্য দ্বারা আদায় করলে ঐ চার প্রকারের বস্তুর নির্ধারিত পরিমাণের মূল্য হিসাব করে সে অনুযায়ী আদায় করতে হবে। যেমন- চাউল দ্বারা আদায় করলে এক সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি, ৭৫০ গ্রাম) গম বা তির সের নয় ছটাক (৩ কেজি, ৫০০ গ্রাম) যবের মূল্যের সম পরিমাণ চাউল আদায় করতে হবে।

৩, একজন ফকীরকে এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের চেয়ে কম দেওয়া বৈধ নয়। এর মূল্য দ্বারা আদায় করলেও উল্লিখিত পরিমাণ গমের মূল্য দিতে হবে।

৪. যাকে সাদাকায়ে ফিত্‌র দেওয়া জায়িয তাকে এ সাদাকা দেওয়াও জায়িয।

৫. কাফ্‌ফারা আদায়ের সময় এর নিয়্যত করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## রোযার শর্তসমূহ

জিনায়াতের ক্ষতিপূরণে রোযা রাখলে নিম্নের শর্তগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক ঃ

১. ক্ষতিপূরণের নিয়্যত করা,

২. রাত হতে রোযার নিয়্যত করা এবং কাফ্‌ফারার নিয়্যত করা,

৩. যার পরিবর্তে রোযা রাখবে তা নির্দিষ্ট করা,

৪. রামাযান, ঈদুল ফিত্‌র, আয়্যামে তাশরীক (১০, ১১, ১২, ১৩ যিলহজ্জ) ব্যতিত অন্যান্য দিবসে রোযা রাখা। রোযাসমূহ একাধারে রাখা শর্ত নয়; তবে উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## দশম পরিচ্ছেদ

# ইহ্সার বা হজ্জ আদায়ে প্রতিবন্ধকতা

**বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম**

হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধার পর কেউ যদি কোন শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় কিংবা এমন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যার কারণে চলাফেরা ও যানবাহনে আরোহণে অক্ষম হয়ে পড়ে বা দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে হজ্জ আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে হারাম শরীফে কুরবানী করার জন্য কোন হাদী বা তার মূল্য পাঠিয়ে দিবে এবং যথাসময়ে পশু কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর ইহ্রাম খুলে হালাল হবে।

যদি হাদী না পাঠিয়ে তার মূল্য পাঠিয়ে থাকে, তাহলে বাহক মক্কায় পৌঁছে নিজে পশু খরীদ করে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা কুরবানী করবে। পশু যবেহ্ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহ্রাম খুলতে পারবে না, তাই হাদী প্রেরণের সময় কুরবানী করার জন্য একটি দিন ধার্য্য করে দিতে হবে এবং এদিনে কুরবানী করবে বলে বাহকের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। যেন উক্ত নির্ধারিত দিনে কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর ইহ্রাম খোলা যায়।

ইহ্রাম বাঁধার সময় যদি কেউ এমন শর্ত করে যে, সে বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানী করবে না তার জন্যও উপরোক্ত হুকম প্রযোজ্য। কুরবানীর পশু যবেহ হওয়ার পূর্বে যদি এমন কাজ করে ফেলে, যা ইহ্রাম অবস্থায় জায়িয নেই, তাহলে ঐ ব্যক্তির উপরও ঐ সব বিষয় ওয়াজিব হবে যা একজন সাধারণ মুহারিমের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে বিধি সম্মতভাবে ইহ্রাম খুলে হালার হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডান শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মহাম্মদ (র.) -এর অভিমত।

কারো কারো মতে হারাম শরীফের ভিতর বাধাপ্রাপ্ত হলেই কেবল মাথা মুণ্ডান অন্যথায় নয়। বাঁধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রেরীত হাদী আইয়্যামে নহরেই যবেহ্ করতে হবে। বরং আগে পরে করা জায়িয আছে। ধার্য্যকৃত দিনে পশু যবেহ্ হয়েছে মনে করে ইহ্রাম খুলে ফেলার পর যদি জানা যায় যে যবেহ্ হয়নি, তাহলে সে হালাল হবে না বরং মুহরিমই থেকে যাবে। এ অবস্থায় সময় হওয়ার পূর্বে ইহ্রাম খোলার দায়ে তার উপর আর একটি কুরবানী ওয়াজিব হবে।

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র হজ্জ কিংবা শুধু উমরার নিয়্যতে ইহ্রাম বেঁধে থাকলে, তাকে একটি হাদী বা তার মূল্য পাঠাতে হবে। আর যদি হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের ইহ্রাম বেঁধে থাকে, তাহলে দু'টি হাদী বা তার মূল্য পাঠাতে হবে। শুধু হজ্জের নিয়্যতে ইহ্রামকারী ব্যক্তি যদি দু'টি হাদী প্রেরণ করে তাহলে প্রথমটি যবেহ্ হওয়ার সাথে সাথেই সে হালাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

কুরবানীটি নফল হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কারিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উভয় কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার পর সে হালাল হবে। এ ব্যক্তি (কারিন) যদি হজ্জের ইহ্‌রাম খোলার নিয়্যতে একটি হাদী প্রেরণ করে এবং উমরার ইহ্‌রাম নিজ অবস্থায় রেখে দেয়, তা হলে সে কোন ইহ্‌রাম থেকেই বের হতে পারবে না। অবশ্য দুই হাদী প্রেরণের বেলায় একটি উমরার, অপরটি হজ্জের এধরণের নির্দ্ধারনী নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই।

হজ্জে কিরানের নিয়্যতে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশের পর হজ্জও উমরাহ উভয়ের তাওয়াফ আদায়ান্তে উকূফে আরাফার পূর্বে যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে একটি হাদী প্রেরণ করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে। তবে শুধু হজ্জের প্রতিবিধান হিসাবে পরবর্তী বছর এক হজ্জ ও এক উমরাহ্ কাযা করতে হবে, কিন্তু উমরার বিনিময়ে উমরার কাযা করতে হবে না। ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে হারামের বাহিরে মাথা মুণ্ডানোর কারণে এ ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, ইহ্‌রাম বাঁধার পর হজ্জ পালনে ব্যর্থ হলে তার কাযা করা ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয়

মুহসার (বাধা প্রাপ্ত) ব্যক্তির হজ্জ পালনের পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয় হলো - হজ্জের সময় বাকী থাকলে এ বছরই (যে বছর বাধা প্রাপ্ত হয়েছে) হজ্জ সম্পন্ন করা। অন্যথায় পরবর্তী বছর তার কাযা করা।

যদি এ ব্যক্তি শুধু উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে তাহলে কেবল উমরারই কাযা করবে। আর যদি শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে হজ্জও উমরা উভয়ের কাযা করবে। অপর দিকে কিরান তথা হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে, এক হজ্জ এবং দু' উমরাহ্ কাযা করবে। কেউ যদি হজ্জ অথবা উমরাহ্ কোন কিছুর নিয়্যত ব্যতীত ইহ্‌রাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হাদী প্রেরণ পূর্বক হালাল হওয়ার পর প্রতিবন্ধতা দূর হয়, তাহলে সে একটি উমরাহ্ আদায় করবে।

আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, ইহরামে সময় নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুর নিয়্যত করেছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণে ভূলে গেছে - এটা কি উমরার ইহ্‌রাম ছিল- না হজ্জের তাহলে শুধু একটি হাদী প্রেরণ করে হালাল হবে এবং পরে এক হজ্জ ও এক উমরার কাযা করতে হবে। মুহরিম ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হওয়ার বছরই হজ্জ পালনে সক্ষম হয়, তাহলে তার কাযার নিয়্যত করতে হবে না এবং কাযা স্বরূপ পৃথক উমরাও পালন করতে হবে না। অবশ্য অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি নফল হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে পরবর্তী বছর শুধু তার জন্যই কাযার নিয়্যত করা ওয়াজিব। ফরয হজ্জের জন্য নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## হাদী পাঠানোর পর প্রতিবন্ধকতা দূর হলে

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হজ্জ পালনে অক্ষমতার দরুণ হারাম শরীফে যবেহ্ -এর উদ্দেশ্যে হাদী প্রেরণের পর যদি প্রতিবন্ধকতা দূর হয় তাহলে হাদী (যবাহ্ এর পূর্বে) এবং হজ্জ উভয়টি পাওয়া যাওয়ার মত সময় বাকী থাকলে হজ্জে গমন করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় প্রেরীত পশুটি

www.pathagar.com

পাওয়া গেলে যবাহ্ করতেই হবে-এমন নয়। আর যদি জানা যায় যে হজ্জ ও কুরবানীর পশু (প্রেরীত হাদী) কোনটিই পাওয়া যাবে না, তাহলে হজ্জে গমন করা ওয়াজিব নয়।

যদি জানা যায় যে হজ্জ পাওয়া যাবে কিন্তু হাদী পাওয়া যাবে না, তাহলে কিয়াসান হজ্জে গমন করা ওয়াজিব। ইস্তিহসানান ওয়াজিব নয়। তবে হজ্জে যাওয়া উত্তম। এ অবস্থায় হাদীর নাগাল পেলে তা যবাহ্ করে দিবে আর যদি জানা যায় যে, হজ্জ পাওয়া যাবে না, কিন্তু হাদী পাওয়া যাবে তাহলে হজ্জে যাওয়া ওয়াজিব হবে না। কেউ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হাদী প্রেরণের পর যদি বাধা দূরীভূত হয়, তাহলে এবছরই হজ্জ করলে তার জন্য কাযার নিয়্যত করা ওয়াজিব নয় এবং উমরাহ পালন করা ও ওয়াজিব নয়। কিরান পালনকারীর হাদী প্রেরণের পর প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হলে-যদি অবস্থা এমন হয় যে, হজ্জ অথবা কুরবানীর পশু কোনটিই পাওয়া যাবে না, তাহলে তার হজ্জে গমন করা ওয়াজিব নয়, বরং তার ইখতিয়ারাধীন। ইচ্ছা করলে হালাল হওয়ার জন্য হাদী যবাহ্ হওয়া পর্যন্ত বাঁধাপ্রাপ্ত স্থানে অবস্থান করতে পারে। আবার মক্কা মুকাররামায় গমন করে উমরা পালন করেও হালাল হতে পারে। যদি মক্কায় গিয়ে উমরা পালন করে হালাল হয়, তাহলে পরবর্তীতে কাযা স্বরূপ দ্বিতীয় উমরা পালন তার উপর করা ওয়াজিব হবে না; অন্যথায় হবে।

উমরা পালন ইচ্ছুক মুহরিম ব্যক্তির হাদী প্রেরণের পূর্বে বা পরে যদি বাধা দূরীভূত হয় এবং মক্কায় গিয়ে হাদীর নাগাল পাওয়ার মত সময় থাকে, তাহলে মক্কায় গিয়ে উমরা পালন করা ওয়াজিব। আর যদি হাদী পাওয়ার মত সময় না থাকে, তাহলে উমরা পালনের জন্য গমন করা ওয়াজিব নয়। এ উমরা যখন ইচ্ছা পালন করতে পারবে। কেননা হজ্জের মত উমরার জন্য কোন বিশেষ সময় নির্ধারিত নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### একের পর এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে

হজ্জ অথবা উমরার নিয়্যতে ইহ্‌রাম বাঁধার পর বাধা প্রাপ্তির কারণে হাদী পাঠানোর পরে যদি বাঁধা অপসারিত হয়ে যায় এবং আরেকটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাহলে অবরুদ্ধ ব্যক্তির যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, সে এ বাঁধাটির সম্মূখীন না হলে মক্কা শরীফ দিয়ে প্রেরীত পশুটি জীবিত পেত। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার জন্য প্রথম প্রেরীত পশুটিকে নিয়্যত করে নিলেই তা দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার জন্যও যথেষ্ট হবে। আর যদি দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার নিয়্যত না করে এবং কুরবানীর পশু যবাহ্ হয়ে যায়, তাহলে এটা দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার জন্য যথেষ্ট হবে না। তাই এর উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে হালাল হওয়াও জায়িয হবে না, বরং তাকে আরেকটি হাদী পাঠাতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

### হাদী পাঠাতে অক্ষম হলে

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পশুর অভাবে কিংবা পশু ক্রয় ক'রার মত অর্থের অভাবে অথবা পশু ও টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও পাঠানো মত উপযুক্ত বাহকের অভাবে হাদী পাঠাতে অক্ষম হয়, তাহলে সে যতক্ষণ পর্যন্ত না হারামে পশু পাঠিয়ে যবাহ্ করাবে অথবা নিজে মক্কা শরীফ গিয়ে উমরা পালন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলে হালাল হতে পারবে না বরং ইহ্‌রাম

www.pathagar.com

অবস্থায়ই থেকে যাবে। হাদী প্রেরণে অক্ষম হলে তার পরিবর্তে রোযা রেখে বা সাদাকা প্রদান করে হালাল হতে পারবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## ইহ্রামের পর হজ্জ আদায়ে ব্যর্থ হলে

হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধার পর কোন কারণবশতঃ হজ্জ আদায়ে ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যক্তির কর্তব্য হলো- তাওয়াফ ও সাঈ সমাপন করতঃ মাথা মুণ্ডন করে ইহ্রাম খুলে ফেলা এবং পরবর্তী বছর এ হজ্জের কাযা করা। যদি কোন ইফরাদ হজ্জ পালনকারী ইহরামের পর হজ্জ পালনে ব্যর্থ হয় এবং উমরা পালন করে হালাল হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী বছর তার উপর শুধু হজ্জের কাযা ওয়াজিব হবে। উমরার দম কিংবা তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হবে না। উক্ত ব্যক্তি কিরান হজ্জ পালনকারী হলে এবং হজ্জ ছুটে যাওয়ার আগে ইহ্রাম না করে থাকলে তাকে প্রথমে উমরার জন্য একটি তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করতে হবে। অতঃপর হজ্জের জন্য একটি তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করে মাথা মুণ্ডিয়ে বা কসর করে হালাল হবে। এমতাবস্থায় তার উপর শুধু হজ্জের কাযা ওয়াজিব হবে এবং দমে কিরান মাফ হয়ে যাবে। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়াহ মুলতবী করে দিবে।

যদি তামাত্তু পালনকারী হয়, তাহলে হজ্জ ছুটে গেলেই তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। তার জন্য দমে তামাত্তুও মাফ হয়ে যাবে। সে উমরা পালন করে হালাল হবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করবে। তার সাথে যদি কুরবানীর পশু থাকে, তাহলে হজ্জ পালনে ব্যর্থ হওয়ার পর সে ঐ পশুকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। উল্লেখ্য যে, ইহরামের পর হজ্জ আদায়ে ব্যর্থ ব্যক্তির উপর তাওয়াফে সদর ও কুরবানী ওয়াজিব হয় না। যাই সে হজ্জ ফরয, মানত, নফল ইত্যাদি যে প্রকারেরই হোক না কেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

## যে সকল কারণে হজ্জের কাযা ওয়াজিব হয়

হজ্জ কার্য পালনের সময় নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ পাওয়া গেলে হজ্জের কাযা ওয়াজিব হয়। যথা ঃ

১. উকূফে আরাফা ছুটে যাওয়া,

২. ইহ্সার তথা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে উকূফে আরাফা করতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া,

৩. স্ত্রী-সহবাসের মাধ্যমে হজ্জ ভঙ্গ করা,

৪. হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর ছেড়ে দেওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

## একাদশ পরিচ্ছেদ

# মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

### মদীনা মুনাওয়ারার পরিচিতি

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পবিত্র মক্কা নগরী হতে হিজরত করে আরব উপদ্বীপের যে শহরে বসবাস করেছিলেন তার নাম 'মাদীনা মুনাওয়ারা'। পূর্বে এই শহরের নাম ছিল 'ইয়াস্‌রিব'। নবী করীম (সা.) -এর নাম রাখেন 'মদীনা তাইয়্যেবা'। তিনি একে ইয়াস্‌রিব বলতে নিষেধ করে বলেন, যে ব্যক্তি ইয়াস্‌রিব বলবে সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ইস্তিগফার করে। মদীনা হল তাবা, তাবা (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও আল-ফাতহুর রাব্বানী)।

মদীনা মুনাওয়ারা একটি পবিত্র শহর, পবিত্র মক্কা নগরীর পর এর স্থান। তবে কোন কোন ইমাম বলেছেন, মদীনায় অবস্থিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কবর শরীফ এবং তাঁর দেহ মুবারকের সাথে সংযুক্ত মাটি বাইতুল্লাহ্‌র চেয়ে এমনকি আরশের চেয়েও উত্তম (শামী, ২য় খণ্ড)।

### মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা মুনাওয়ারার অনেক ফযীলত ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে তার কয়েকটি প্রদত্ত হল ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ঈমান (শেষ পর্যন্ত) এমনভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে (বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ আমি এমন একটি জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদের উপর বিজয়ী হবে। লোকেরা তাকে 'ইয়াসরিব' বলে থাকে। অথচ তার উপযুক্ত নাম হল 'মদীনা'। এ মদীনা খারাপ লোকদেরকে এমন করে বের করে দেয় যে ভাবে কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয় (বুখারী)।

হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ মাসীহ্ দজ্জালের ফিনা মদীনাতে প্রবশ করবেনা। এ সময় মদীনায় সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে, এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে দু'জন করে ফিরিশ্‌তা পাহারায় থাকবে (বুখারী)।

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ মদীনার এখান থেকে ওখান পর্যন্ত (দক্ষিণে বীরে আলী নামক স্থানের আয়ের পাহাড় হতে উত্তরে সাউর পাহাড় পর্যন্ত) হারম - মহাসম্মানিত স্থান ; এখানকার বৃক্ষ কাটা যাবেনা, এখানে কুরআন সুন্নাহ্ বিরোধী কোন কাজ করা যাবে না, যে ব্যক্তি এখানে এরূপ কোন বিদ্'আত কাজ করবে তার উপর আল্লাহ্‌র সকল ফিরিশতার এবং সমস্ত মানুষের লা'নত বর্ষিত হবে (বুখারী)।

www.pathagar.com

মদীনার গাছ কাটলে ও শিকারী প্রাণী শিকার করলে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু এর জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। শিকার কৃত প্রাণীর গোস্তও খাওয়া হারাম হবে না (ফাতহুল বারী)।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ মদীনায় প্লেগ, মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবেনা (বুখারী)।

হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্নণা করেন, তিনি বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি মক্কাতে যেমন বরকত দান করেছ মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান কর (বুখারী)।

ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যু বরণ করা সম্ভব সে যেন তা করে, কারণ যারা মদীনায় মারা যাবে আমি তাঁদের জন্য (আল্লাহ্র কাছে) শাফা'আত করব (মুসনাদে আহ্মাদ)।

মোদ্দাকথা মদীনা মুনাওয়ারা একটি পবিত্র শহর। নবী করীম (সা.) নিজ মাতৃভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে এখানে এস বসবাস করেন। এখানে তাঁর প্রতি অসংখ্য বার অহী নাযিল হয়েছে, এখানেই তিনি শায়িত আছেন, এখানেই তাঁর বহু সাহাবীর কবর অবস্থিত। অতএব মদীনা বরকতময় ও পূণ্যভূমি। এখানে ঈমানদারদের সমাগম কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ কারণেই যারা মদীনা বাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি, যে কেউ মদীনা বাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করবে সে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে লবণ যেমন পানিতে গলে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় (বুখারী)।

## মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের আদব ও নিয়মাবলী

মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যারা বাড়ী হতে বের হন তাঁরা মদীনা যাওয়ার পথে বেশী বেশী করে দুরূদ পাঠ করবেন। মনে মনে মদীনা মুনাওয়ারার ইযযত, ইহ্তিরাম ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়েই 'মদীনা মুনাওয়ারা' প্রবেশ করবেন (ইরশাদুস্ সারী)।

মদীনা শরীফের বাড়ী ঘর দেখার পর মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি ভালবাসা নিয়ে, আগ্রহভরে দ্রুত মদীনা প্রবেশের চেষ্টা করবেন। কারণ হযরত আনাস (রা.) -এর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সফর থেকে ফেরার পথে মদীনার প্রাচীরের দিকে তাকাতেন তখন মদীনার প্রতি ভালবাসার কারণে তার সাওয়ারী জন্তুকে দ্রুত চালনা করতেন।

## মসজিদে নববীর পরিচিতি

হিজরতের অব্যবহিত পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণকে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় যে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন তারই নাম 'মসজিদে নববী'। তিনি এ মসজিদটি নির্মাণ করে এর বাম পাশে নিজের বাড়ী নির্মাণ করেন এবং আজীবন তাতে বসবাস করেন। এই মসজিদটিই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর দাওয়াতী কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজের কেন্দ্রবিন্দু (সীরাত ইবন ইসহাক)।

## মসজিদে নববীর ফযীলত

মসজিদে নববী অত্যন্ত মর্যদাপূর্ণ ও সম্মানিত একটি মসজিদ। এই মসজিদ তাক্ওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সে হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতের অন্তুর্ভূক্ত ।

www.pathagar.com

لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه

যে মসজিদটি প্রথম দিন হতে তাক্ওয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে মসজিদটি আপনার সালাতের জন্য অধিকযোগ্য (সূরা তাওবা ঃ ১০৮।

عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلواة فى مسجدى هذاخير من الف صلواة فى ما سواه الاالمسجد الحرام

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ আমার এই মসজিদে এক রাক'আত নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অপর কোন মসজিদের এক হাজার রাক'আত নামায অপেক্ষা উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)।

ইব্ন মাজার এক রেওয়ায়েতে মসজিদে নব্বীতে এক রাক'আত নামায আদায় করা মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ পঞ্চাশ হাজার রাক'আত নামাযের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, এর মধ্যে এক ওয়াক্ত বাদ দেবেনা তার জন্য জাহান্নাম হতে নাজাতের সনদ প্রদান করা হবে এবং আযাব ও নেফাক থেকে ও সে পরিত্রাণ লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

ما بين بيتى و منبرى روضة من رياض الجنة

আমার বাড়ী (যেখানে রওজা শরীফ অবস্থিত) এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশ্তের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে কল্যাণকর কিছু শিক্ষার জন্য বা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করবে সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার মত ফযীলত লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এতে প্রবেশ করবে তার অবস্থা ঐ লোকের মত যে অন্যের সম্পদের দিকে নযর দেয় (মুসনাদে আহ্মাদ ও আল-ফাতহুর রাব্বানী)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নামায কাযা না করে আমার মসজিদে চল্লিশ (ওয়াক্ত) নামায আদায় করবে জাহান্নামের আযাব ও নেফাক হতে মুক্ত বলে তাঁর নাম আল্লাহ্র দরবারে লিপিবদ্ধ করা হবে (তাবারানী, আহমাদ ও আল্ ফাত্হুর রাব্বনী)।

**মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার আদব ও নিয়মাবলী**

যারা মসজিদে নববী যিয়ারতের ইচ্ছা রাখেন তাদের জন্য বাড়ী থেকে বের হবার সময় তার যিয়ারতের নিয়্যাত করা উত্তম। কারণ আমলের সাওয়াব নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

মসজিদ নববীতে প্রথমবার প্রবেশ করার পূর্বে সম্ভব হলে গোসল করবেন, আর তা সম্ভব না হলে অন্তত ঃ অযূ করে পাক পবিত্র হয়ে প্রবেশ করবেন (ফাতহুল কাদীর)।

সুন্দর ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করবেন। তবে নতুন পোষাক পরিধান করা উত্তম (পূর্বোক্ত) সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন (ফিকহুস্ সুন্নাহ)।

মসজিদে নববী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইযযত ও ইহ্তিরাম মনে রেখে ধীরে সুস্থে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন (পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়) সম্ভব হলে পায়ে হেঁটেই মসজিদ পর্যন্ত যাবেন (ফাত্হুল কাদীর)।

বাবে জিব্রীল হয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন। আর তা সম্ভব না হলে অন্য যে কোন দরজা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন (ফাত্হুল কাদীর)।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় প্রথমে অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করার মত ডান পা আগে বাড়বে তারপর নিম্নের দু'আটি পড়তে পড়তে প্রবেশ করবেন ঃ

بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله رب ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق اللهم افتح لى ابواب رحمتك وارزقنى من زيارة رسولك صلى الله عليه و سلم ما رزقت اولياءك و اهل طاعتك وانقذنى من النار و اغفرلى و ارحمنى يا خير مسؤل

(ইরশাদুস সারী)

### মসজিদে নববীতে প্রবেশের পর করণীয়

মসজিদে নব্বীতে প্রবেশ করে প্রথমে দু' রাক'আত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামায পড়বেন সম্ভব হলে এই নামায 'রিয়াযুল জান্নাতে' আদায় করবেন। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায শেষ করে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে নিজের জন্য আত্নীয় স্বজন ও সকল মুসলমানের জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'আ করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর রাওযা মুবারক যিয়ারত করার জন্য যাবেন।

### রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর রওযা মুবারক যিয়ারতের নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর রওযা মোবারকের দক্ষিণ পাশে গিয়ে কবরকে সামনে নিয়ে কিবলাকে পিছনে রেখে সম্ভব হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর চেহরা মুবারক বরাবর দাঁড়াবেন এরপর অত্যন্ত আদব ও ইহ্তিরামের সাথে তাঁকে এ ভাবে সালাম জানাবেন ঃ

السلام عليك يا نبى الله و رحمة الله و بركاته اشهد انك رسول الله قد بلغت الرسالة و اديت الامانة و نصحت الامة و

www.pathagar.com

جاهدت فی امر الله حتی قبض روحك جیدا فجزاك الله عن صغيرنا و كبيرنا خير الجزاء و صلى عليك افضل الصلاة و ازكاها و اتم التحية اللهم اجعل نبينا يوم القيامة اقرب النبيين و اسقنا من كاسه و ارزقنا شفاعته و اجعلنا من رفقائه يوم القيامة اللهم لاتجعل هذا اخر العهد بقبر نبينا عليه السلام و ارزقنا العود اليه ياذالجلال و الاكرام

এরপর অপর কারো সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে জানাতে চাইলে তা জানাবেন এ ভাবে ঃ

فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله

(ফাতহুল কাদীর)।

এরপর ডান দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাবেন তার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে সালাম এভাবে দিবে ঃ

السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله فى الغار السلام عليك يارفيقه فى الاسفار السلام عليك يا امينه على الاسرارجزاك الله عنا افضل ما جزى اماما عن امة نبيه و لقد خلفته باحسن خلف و سلكت طريقه و منهاجه خير مسلك و قاتلت اهل الردة و البدع و مهدت الاسلام و وصلت الارحام و لم تزل قائلا للحق ناصرا لاهله حتى اتاك اليقين والسلام عليك و رحمة الله و بركاته اللهم امتنا على حبه ولاتخيب سعينا فى زيارته برحمتك ياكريم

(আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এরপর ডান দিকে আরো এক হাত পরিমাণ এগিয়ে হযরত উমর ফারূক (রা) -এর কবর বরাবর দাঁড়াবেন এবং তাকে সালাম এভাবে জানাবেন ঃ

السلام عليك عمر الفاروق و رحمة و بركاته جزاك الله عن امة الاسلام خيرا

(আদাবুয্ যিয়ারাহ লিল মাদীনা ঃ ১৬)

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কবর শরীফের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে সালাম দিবেন না কিংবা মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলবেন না এবং উচ্চ স্বরে দু'আ করবে না। পরম শ্রদ্ধাভক্তি ও বিনম্রভাবে দু'আ করবেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর রওযা শরীফের দেয়ালে হাত দিয়ে স্পর্শ করা, চুমু দেওয়া কিংবা দেয়াল জড়িয়ে ধরা অনুচিৎ। হানফী মাযহাব মতে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর রওযা শরীফের যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

## রিয়াযুল জান্নাহ্ ও তার ফযীলত

মসজিদে নববীতে একটি অতি উত্তম ও পবিত্র স্থান রয়েছে যা হুজরা শরীফ তথা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কবর শরীফ ও মিম্বরের মধ্যখানে অবস্থিত। এই স্থানটিকে 'রিয়াযুল জান্নাহ' বলা হয়। এই স্থান সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

ما بين بيتى و منبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى

আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান আর আমার মিম্বর আমার হাউযের ওপর অবস্থিত (বুখারী)।

হাদীসটির ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণের কেউ কেউ বলেছেন ঃ এ স্থানটি জান্নাতেরই একটি অংশ। কেউ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন এ স্থানটিকে জান্নাতের অংশ হিসেবে গন্য করে জান্নাতে রূপান্তরিত করা হবে। কেউ কেউ একথা বলেছেন যে, এখানে যারা ইবাদত করে তারা জান্নাত লাভ করবেন (ফতহুল বারী)।

অতএব এ বরকতময় স্থানে কাউকে কষ্ট না দিয়ে নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার দু'আ ইত্যাদি ইবাদত বান্দেগীর মাধ্যমে সময় কাটানোর চেষ্টা করা কর্তব্য। এখানে কাউকে কষ্ট দেওয়া, কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করা, অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা, কিংবা কোন রকমের বিদ'আতী কাজ করা অন্য স্থানের তুলনায় অধিকতর দোষনীয়।

## কুবা মসজিদ যিয়ারতের ফযীলত

ইসলামে সর্ব প্রথম নির্মিত মসজিদের নাম কুবা মসজিদ। হিজরতের সময় রাসূলল্লাহ্ (সা.) বনূ আম্র ইবন আতীক গোত্রের কাছে অবস্থান করার সময় এই মসজিদটি নির্মাণ করার জন্য আদেশ দেন। মসজিদটি নির্মিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে সেখানে নামায আদায় করেন।

রাসূলল্লাহ্ (সা.) মদীনায় অবস্থানকালে প্রায় সময় শনিবারে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো সাওয়ার হয়ে কুবা মসজিদে যেতেন এবং নামায আদায় করতেন (আল-হাজ্জ ওয়াল উমরাহ ওয়ায্-যিয়ারাহ)।

কুবা মসজিদের যিয়ারতের ফযীলত প্রসংগে রাসূলল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

من تطهر فى بيته ثم اتى مسجد قبا فصلى فيه كان له كاجر عمرة

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে (কেউ গোসল করে) পবিত্র হয়ে মসজিদে কুবায় এসে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করবে সে একটি উমরা আদায় করার সাওয়াব পাবে (আহ্মাদ ও নাসাঈ)।

হযরত আবুদল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) কুবা মসজিদে এসে নামায পড়তেন এবং মনে করতেন, কুবা মসজিদে শনিবার এসে নামায পড়া উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও এরূপ করতেন (আদাবুয যিয়ারাহ)।

## জান্নাতুল বাকী যিয়ারতের গুরুত্ব ও ফযীলত

মদীনা শরীফ যিয়ারতকারীদের জন্য 'জান্নাতুল বাকী'-এর যিয়ারত করা সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জান্নাতুর বাকীতে দাফনকৃত সাহাবীগণের কবর যিয়ারত করতেন, তিনি সাহাবীগণকেও তাদের যিয়ারত করার জন্য আদেশ দিতেন এবং কবর যিয়ারতের নিয়মাবলী শিখিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কারণ কবর যিয়ারত তোমদেরকে পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয় (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ তোমরা কবরের সামনে গিয়ে এভাবে সালাম দিবে ঃ

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين و المسلمين انا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا و لكم العافية

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, একবার রাসূলল্লাহ্ (সা.) মদীনার কোন এক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

السلام عليكم اهل القبور يغفر الله لنا و لكم انتم سلفنا ونحن بالاثر

(তিরমিযী)।

কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীদের মাগ্ফিরাতের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে দু'আ করবে তাদের কাছে কোন কিছু চাওয়া নিষেধ ও গুনাহ। তবে তাদের উসিলা দিয়ে দু'আ করা যায় (আল্ হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ)।

## উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত

মদীনা মুনাওয়ার যিয়ারতকারীদের জন্য উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতি বছরের প্রথম দিকে উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত করার জন্য আসতেন এসে (কবরের সামনে দাঁড়িয়ে)

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

www.pathagar.com

হযরত আবুদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার মুস'আব ইব্ন উমাইর (রা.) (উহুদ যুদ্ধে শাহাদতপ্রাপ্ত) -এর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি সাক্ষী যে তোমরা আল্লাহ্র কাছে জীবিত (তারপর বললেন) তোমরা তাঁদের কবর যিয়ারত কর এবং তাদেরকে সালাম দাও, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর নামে শপথ করে বলছি যা তাঁদেরকে সালাম করবে তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সালামের জওয়াব দিবে (ফাতহুল কাদীর)।

প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা হামযা (রা)-কে সালাম জানাবেন তারপর মুস'আব ইব্ন উমাইর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসহাস (রা) ও অপরাপর শহীদগণকে সালাম জানাবেন (পূর্বোক্ত) শহীদগণের কবর যিয়ারতের সময় এভাবেও সালাম দেওয়া যায় ঃ

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم دار قوم مؤمنين و انا ان شاء الله بكم لاحقون

সালামের পর আয়াতুল কুরসী ও সূরাতুল ইখলাস তিলাওয়াত করে তাঁদের রূহের উপর তার সাওয়াব রেসানী করবেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

শহীদগণের কবর যিয়ারতের সময় তাদের ইয্যত ইহ্তিরাম সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য (ইরশাদুস্ সারী)।

কবর যিয়ারতের সময় সরাসরি তাঁদের কাছে কিছু চাওয়া নাজায়িয। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা কবর যিয়ারত কর সেখানে বাজে কথা বলবে না (আল-হাজ্জ ওয়াল উমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ)।

## মদীনা মুনাওয়ারার অন্যান্য মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থানের যিয়ারত

উপরোল্লেখিত মসজিদ ও স্থান ছাড়া মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত মসজিদে কিব্লাতাইন, মসজিদে গামামা, মসজিদে ইজাবা, উহুদ পাহাড়, বীরে আরীস, মসজিদে ফাত্হ ইত্যাদি মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থান সমূহ যিয়ারত করা উত্তম (আদাবুয্ যিয়ারাহ)।

তবে সে সব মসজিদ ও স্থানের যিয়ারত করতে গিয়ে মসজিদে নব্বীতে জামা'আতের সাথে নামায যাতে কাযা না তার প্রতি খিয়াল রাখা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদ পাহাড়কে ভালবাসতেন, এ প্রসংগে তিনি বলেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসি। এই কারণেই এ পাহাড়কে যে কোন মু'মিনের ভালবাসা কর্তব্য (আদাবুয্ যিয়ারাহ)।

## মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিদায়ের নিয়ম

মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত শেষে ফিরে আসার সময় মসজিদে নববীতে গিয়ে দু' রাক'আত নফল নামায আদায় করে বিদায় নেওয়া মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

বিদায় কালে এ দু' রাক'আত নামায 'রিয়াযুল জান্নাহ' -এ পড়া উত্তম। সেখানে পড়া সম্ভব না হলে মসজিদে নববীর অন্য যে কোন স্থানে তা পড়া যেতে পারে (ইরশাদুস্ সারী)।

www.pathagar.com

নামায শেষে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে কান্নাকাটি করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিজের জন্য আত্মীয় স্বজন ও মু'মিন মুসলমানের জন্য দু'আ করবেন। বিশেষতঃ পুনঃপুনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর যিয়ারত নসীব হবার জন্য এবং তাঁর শাফা'আত লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানাবেন (ইরশাদুস্ সারী)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর রওজা মুবারকে গিয়ে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী সালাম জানাবেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এরপর আবার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কান্নাকাটি করে দু'আ করবেন তিনি যেন সহীহ্ সালামতে গন্তব্যে পৌঁছার তাওফীক দেন (রাদ্দুল মুহ্তার, ২য় খণ্ড)।

মসজিদে নব্বী হতে বের হয়ে সম্ভব হলে ফকীর মিসকীনদেরকে কিছু দান করবেন (রাদ্দুল মুহ্তার)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সান্নিধ্য হারানের ব্যাথায় অশ্রুসিক্ত নয়নে মদীনা মুনাওয়ারা হতে বিধায় নিবেন (রাদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড)।

মদীনা শরীফ থেকে ফিরে আসার পথে যে কোন উঁচুস্থানে উঠার সময় তাক্বীর বলে নিম্নে দু'আটি পড়বেন (রাদ্দুল মুহতার)।

ائبون تائبون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده

ইফাবাঃ ৯৮-৯৯—গ/৫৩৩০ (উ)—৩২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ